দেওয়াল

বিমল কর

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬৪
প্রচ্ছদ। অহিভূষণ মল্লিক.
প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
মুদ্রাকর
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

দাম সাড়ে চার টাকা

‘দেওয়াল’ তিন খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস। প্রথম খণ্ড ‘ছোট ঘর’; দ্বিতীয় খণ্ড ‘ছোট মন’; তৃতীয় খণ্ড ‘খোলা জানলা’। বর্তমান গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড।

এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। তথাপি কোন চরিত্রের সঙ্গে যদি নামে অথবা কোন বিষয়ে কোথাও মিল ঘটে যায় সেটা সম্পূর্ণ-ই আকস্মিক। বলা বাহুল্য, যে-অঞ্চল মুখ্যত এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল—সে-অঞ্চলের একটি গলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

শ্রীসাগরময় ঘোষ

অগ্রজপ্রতিমেষু

ছোট ঘর

প্রথম খণ্ডের ঘটনাকাল ১৯৪১-এর মাঝামাঝি
থেকে ১৯৪২-এর জুলাই পর্যন্ত

বহুবাজার স্ট্রীটের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গলিটা। ঢোকার মুখে রাস্তাটা তবু বা চওড়া, গাড়ি ঘোড়া মুখ গলাতে পারে। ক'পা এগিয়ে নাক বরাবর পথ হঠাৎ যেন ভয়ে লজ্জায় গা গুটিয়ে নিয়েছে। কুঁকড়ে জড়সড়। অনেকটা তেমনি, হুট্ করে দরজা খুলে গলা বাড়িয়েছিল গেরস্থ গরীব ঘরের আইবুড়ো মেয়ে তারপর থমকে গিয়ে কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে। এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ধুকধুক বুক নিয়ে দেখছে এখন। লজ্জায় মরছে, মাথা খুঁড়ছে মনে মনে।

কপাটের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে মানুষ না গললেও মাছি গলে যায়; ফটিক দে লেনের নিশ্বাস টানতে যে-টুকুন বাতাস চলা পথ সে-পথে গাড়ি ঘোড়া না চললেও মানুষ চলতে পারে। কোনও রকমে একটা রিক্শাও।

ফটিক দে লেনের শুরু আসলে এখান থেকেই। স্ট্রীট-ছোঁয়া চওড়া রাস্তাটার অন্য নাম। ফটিক দে লেনের মুখে এসে পুবে পশ্চিমে আলাদা দু'রাস্তা হয়ে পা বাড়িয়েছে। পুবের রাস্তাটা কয়েকটা বাঁক নিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে। নিরিবিলি নিঃঝুম পথ। পশ্চিমের দিকে এগোতে গিয়ে, রাস্তাটাকে পায়ে পায়ে গলি, আধ-গলি ডিঙোতে হয়েছে। কপালগুণে বাঁ-হাতি মাঠ পেয়েছে একটা—দেওয়াল ঘেরা মাঠ আর চারতলা ইঁটরঙ সেণ্ট সিবাস্টিনের স্কুল। মাঠটাও স্কুলের। এইটুকু যা আভিজাত্য গোপী বসু লেনের; বাকি যা, তার মধ্যে থাকে পান বিড়ি সিগারেটের পায়রা-খোপ দোকান, কাঠ কয়লার আড়ত, বেঞ্চি বিছানো চায়ের দোকান 'মধুসূদন কেবিন', লণ্ড্রী, টিন আর খাপরা ছাওয়া কয়েক ফালি বস্তি। বদনাম আছে বস্তিগুলোর। কালো কালো, থলথল গা, বয়স-বোঝা-ভার, পান টুকটুকে ঠোঁট আর খড়িমাটি মুখ নিয়ে ও-বস্তির মেয়েরা গ্যাসের আলো জ্বললে গোপী বসু লেনের এখানে ওখানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এ-সব আবর্জনা গা-থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ফটিক দে লেন স্বস্তি

পেত। মন খুঁতখুঁত নিয়ে পড়ে রয়েছে। পুরনো বনেদী পাড়া কিনা। তার রাস্তাঘাট সরু হোক, পথময় এঁটো কাঁটা আবর্জনা ছড়ানো থাক, কাক কুকুরে করুক না কেন সারাদিন ঝট্‌পট্‌ খেয়োখেয়ি আর হাইড্রেন্টের মুখের প্যাঁচ খোলা নল থেকে গঙ্গাজলের মিহি স্রোত বয়ে বয়ে কাদা জমে যাক গলির দু'পাশে—তবু, তবু ফটিক দে লেন ভদ্রপাড়া। বনেদী পাড়া।

ফটিক দে লেনের মুখের বাড়িটা তেতলা। চুন সুরকির বালাই নেই। জবুথবু মুমূর্ষু চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চৌকাঠের কাঠ রোদে জলে শুকিয়ে শুখনো পাতার রঙ নিয়েছে, পাল্লাগুলো তুবড়ে বেঁকে ফেটেফুটে অষ্টবক্র। বাড়ির নম্বরটা পযন্ত নিশ্চিহ্ন।

মুখের বাড়িটাই শুধু নয়, পাশাপাশি সব ক'টা বাড়ির অবস্থা প্রায় একই রকম। বিবর্ণ হতশ্রী। একটার গা ঘেঁষে অন্যটা যেন মুখ গুঁজে পড়েছে। ঠাসাঠাসি। চাপা। বাতাস বইতে পথ পায় না। দমবন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। নোঙরা ভ্যাপসা গন্ধ হাওয়ায়। মাছি ভনভন সর্বত্র।

প্রস্থ না থাক, ফটিক দে লেনের জিরজিরে গা লম্বায় কম নয়। আর আচমকা, কোথাও কোথাও একটি দু'টি হলুদ কী মেটে রঙের প্রবীণ চেহারার বাড়ি এখনো কোন গতিকে মাথা খাড়া করে আছে। জাত বাঁচিয়ে যেন।

এই পথ দিয়েই সুধা আসছিল। ছাই-রঙ বাড়িটা রাম মল্লিকদের। রোয়াক ঘেঁষে গ্যাস পোস্ট। মল্লিকদের বাড়ি ছাড়িয়ে আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই বাঁ-হাতি সুরকি খসা দোতলা বাড়িটা তাদের। না, বাড়ির মালিক নয় সুধারা। ভাড়াটে।

একটু দ্রুত পায়েই আসছিল সুধা। মুখ নিচু করেই। বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল, দেখতে পায়নি ওদের।

রাম মল্লিকের রোয়াকে বসে একটা সিগারেট ভাগাভাগি করে ফুঁকছিল ওরা তিনজন। তিন ছোকরা। মদন, গৌরাঙ্গ আর বাসু।

সুধাকে দেখতে পেয়ে গৌরাঙ্গ গা টিপল বাসুর।

'তোর দিদি আছে, বাসু।' মদন সতর্ক করে দিয়ে তাকিয়ে থাকল।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। নখের ডগা দিয়ে টুক করে ছুঁড়ে দিল বাসু। বুক থেকে সমস্ত ধোঁয়াটুকু টেনে হাওয়ায় মিলিয়ে দিল নিমেষে। তারপর রোয়াকে পা ঝুলিয়ে দোলাতে লাগল, হাত দু'টো একটু দুমড়ে সিমেণ্ট ছুঁইয়ে রাখলে। এখনকার ভঙ্গিটা শান্তশিষ্ট; সুবোধ বালক-গোছের।

সুধা আসতে আসতে হঠাৎ চোখ তুলল। আর তাকাতেই চোখাচুখি হয়ে গেল মল্লিকদের রোয়াকে বসা তিনটি ছেলের সঙ্গে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুধা।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চোখের ইশারায় ডাকল বাসুকে।

পা পা করে কাছে এল বাসু। আসতে আসতেই অনুমান করছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দিদি খানিকটা গার্জেনগিরি ফলিয়ে নেবে। এখুনি বলবে, এখানে বসে আবার আড্ডা দিচ্ছিস! সেই মদন, গৌরাঙ্গ! বকাটে দু'টোর সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে না বসলে দিন কাটে না, না? দাঁড়া মাকে গিয়ে বলছি।

বলুক দিদি, বাসু ও-সব কথা গ্রাহ্যই করে না। এ-কান দিয়ে শোনে, ও-কান দিয়ে বের করে দেয়।

সুধা কিন্তু ও-সব কথা তুলল না। মুখ চোখের তিরিক্ষি ভাবটাও নেই। বরং চোখ দু'টো চিকচিক করছে, গালে ঠোঁটে খুশীখুশী ভাব।

মুঠো খুলে আধ ময়লা ছোট রুমালটুকু বের করলে সুধা। গিঁট খুলতে খুচরো কিছু উঁকি দিল। আধুলি, সিকি, টাকাও একটা।

গুণে গুণে আড়াইটে টাকা দিল সুধা। বললে নিচু গলায়, 'মিষ্টি নিবি এক টাকার আলাদা করে, বাতাসা পাঁচ পয়সার। একটা, না, দুটো মালা। বাকিটার বাজার নিয়ে আসবি।' বলেই একটু থামল, বাসুর জামাটার দিকে তাকাল, 'কিন্তু বাজার আনবি কিসে করে? রুমাল টুমাল আছে তোর কাছে?'

আড়াইটে টাকা হাতের তালুতে পুরে হকচকিয়ে গিয়েছিল বাসু। একটু সময়ে নিয়ে বলল, 'সে ব্যবস্থা করবোখন। বাজার কি আনব বলো?

'যা তোর ইচ্ছে। ভালো মাছ পাস তো মাছ, না হয় মাংস। দেখিস সন্দেশ বাতাসার সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি করে ফেলিস না!' সুধার গলায় আশ্চর্য হালকা সুর।

বাসু পা বাড়াচ্ছিল। সুধা হঠাৎ বললে, 'শোন, দেড়গজ কালো ফিতে আনিস, যদি কুলোয় পয়সায়। ওমা, ভুলেই গেছি, চক্‌লেট আনিস চার আনার। হবে না ওতে?' সুধা আবার মুঠো খুলে আর একটা আধুলি তুলে দিল বাসুর হাতে। 'দেরি করিস না বেশি।'

হালকা পায়ে চলে গেল সুধা। বাসু থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

এগিয়ে এল মদন আর গৌরাঙ্গ।

'কিরে, তোর দিদির কথাই যে ফুরোয় না।'

মুঠো খুলে টাকা, আধুলি, সিকি দেখাল বাসু।

'আই বাপ্!' গলার মধ্যে থপ্ করে এক দমকা বাতাস চেপে নিয়ে ঠোঁট বন্ধ করলে মদন। অদ্ভুত এক শব্দ বেরুল। 'তোর দিদির যে আজ খুব মেজাজ দেখছি রে, বাসু।'

গৌরাঙ্গ একটু ঘেঁষে বাসুর গলা জড়িয়ে ধরলে ডান হাতে। 'কিসের জন্যে দিলো রে?'

'বাজার আনতে।' পকেটে খুচরোগুলো ভরতে ভরতে জবাব দিল বাসু।

'ঝেঁপে দে একটা টাকা' চোখ একটু কুঁচকে বললে মদন, 'নাইট শো লাগিয়ে আসি রূপমে।'

'হ্যাঁ, তারপর শালা ফেঁসে যাই', বাসু বন্ধুর নির্বুদ্ধিতা আমলে আনল না। 'চ, একটু ঘুরে আসি।'

'ভাগ্ শালা ফালতু কে যাবে?' মদন বিমুখ হয়।

'কেটে পড় তবে।' বাসু গৌরাঙ্গর হাত ধরে টানল বিশেষরকম চাপ দিয়ে।

ইঙ্গিতটা বুঝল গৌরাঙ্গ। অথচ ভান করল যেন কিছুই বোঝে নি। গলার স্বরে খানিকটা অনাগ্রহ ফুটিয়ে বললে, 'চ' এক চক্কর দিয়ে আসি।'

ওরা এগুতে লাগল। মদন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল একটু। তারপর হঠাৎ তার চোখ দু'টো কয়েক গজ দূরের একটি বাড়ির জানলায় গিয়ে আটকে গেল। এ-দিক ও-দিক চেয়ে মুখে আঙুল পুরে ছোট্ট করে শিস দিল। মল্লিকদের রোয়াকে ফিরে এল আবার। বার বার তাকাতে লাগল জানলার দিকে হাসি হাসি মুখে।

যেতে যেতে শিসটা শুনতে পেয়েছিল বাসুরা। মুখ ফিরিয়ে দেখলও একবার।

'মদনটা এবার একদিন জোর ধোলাই খাবে।' বললে গৌরাঙ্গ।

'মাইরি যা বলেছিস।' সায় জানাল বাসু, 'পল্টুদা যা খচে রয়েছে ওর ওপর কি-না!'

'পরীটাই বা কি!' গৌরাঙ্গ বাসুর মুখের দিকে তাকাল, 'যখন তখন জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গা ঢলাচ্ছে, হাত তুলছে, ফিক ফিক হাসছে। ছুঁড়িটা ওর বাপ দাদার হাতে জুতো পেটা খাবে কোনদিন।'

কথা বলতে বলতে গলি ঘুঁজি দিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে এসে পড়েছিল দু'জনে। একটা ট্রাম যাচ্ছে শ্যামবাজারের দিকে। বেশ ভিড়, দু-নম্বর বাস গায়ে এসে পড়েছে। হর্ন মারছে। কণ্ডাক্টার গাড়ির বাইরে গা-বাড়িয়ে গালাগাল দিচ্ছে ভাঙা গলায়।

ট্রাম বাসগুলো পেরিয়ে গেলে রাস্তা পার হল ওরা।

'জিনিসগুলো আগে কিনে নি, কি বল্!' বললে বাসু।

'কিনে নে।'

মিষ্টি কেনা হয়নি তখনো। বাকি সব কেনা কাটা শেষ। হিসেব করে দেখা গেল আনা ছয়েক পয়সা বাজার থেকে সরানো গেছে। মোড়ের মাথায় রেস্টুরেণ্টে ঢুকল দুই বন্ধু। পিছনের দিকে কোণায় গিয়ে বসল।

চা চেয়ে পয়সাবালা সিগারেট দু'টো বের করলে বাসু। চা আসতে ছোকরার কাছে দেশলাই চাইল।

'আচ্ছা, আজ ক' তারিখ রে গৌরাঙ্গ?' চায়ে চুমুক দিয়ে খস্ করে সিগরেট ধরাল বাসু।

'দু' তারিখ।' সিগারেটের আগুনে নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে গৌরাঙ্গ ধোঁয়া ছাড়ল।

তখন্ থেকেই কথাটা ভাবছিল বাসু। মাঝে অন্য কথায় ভুলে গিয়েছিল। মনে পড়ল আবার। তাই ত, দিদি হঠাৎ তিনটে টাকা বের করে দিল কোথা থেকে, কেমন করে। সকালেও বাড়িতে বাজার আনার পয়সা ছিল না। ডাল ভাত আর শাক পাতার এক ঘেঁট দিয়ে ভাত খেয়েছে সবাই। হঠাৎ বিকেলে মাংস, মিষ্টি, চকোলেট, ফিতে। ব্যাপার কি?

রহস্যটা আচমকা আবিষ্কার করে ফেলল বাসু। মুখের ভাবটা বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যেন সূত্রটা আবিষ্কার করতে পারায় তার কৃতিত্ব কম নয়।

'বুঝেছি।' বাসু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

গৌরাঙ্গ অবাক চোখে তাকিয়ে। কিছুই সে বোঝে নি, ধরতেও পারছে না বাসুর কথাবার্তা।

'মাইনে পেয়েছে দিদি আজ। নিশ্চয়ই তাই।' মাথা নেড়ে নেড়ে যেন নিজেকেই কথাটা শোনাচ্ছিল বাসু।

'কিসের মাইনে?' গৌরাঙ্গ শুধোল।

'নতুন চাকরিটার।'

গৌরাঙ্গ একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোর দিদি নতুন একটা চাকরি পেয়েছে বুঝি?'

'বলিনি তোকে? প্রায় এক-শো মাইনে। তা দিন পনেরো হয়ে গেল। অফিসটা ভালোই, না কি রে—পুরো মাস না যেতেই একেবারে পয়লায় পয়লায় টাকা গুণে দিয়ে দিলে।' বেশ একটু গর্বভরেই বলছিল বাসু কথাগুলো। মাইনের পরিমাণটাও কথার কায়দায় বাড়িয়ে বলেছে।

'গৌরাঙ্গ চুপ মুখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোর দিদিটা

বেড়ে চাকরি জুটিয়ে নেয় ভাই। আমাদেরই কপালেই শালা নাথিং।' হতাশ শোনাল ওর গলা।

'কেন, সিভিক্ গার্ডে ঢোক না।' লম্বা টান মারতে গিয়ে ধোঁয়ায় গলা আটকে খক্ খক্ করে কাশল বাসু।

'ধ্যুৎ, সিভিক্ গার্ড! বাজে ব্যাপার। চার ছ'আনার জন্যে শালা দিন-রাত মাঞ্জা দেও।' গৌরাঙ্গ ঠোঁট ওল্টায়।

'জানিস না তুই।' বাসু জোর গলায় প্রমাণ করতে চাইছিল, 'করকরে সাড়ে পনেরো টাকা। তারপর আছে না এদিক ওদিক। কেষ্টা, বলাই, পঞ্চু— দেখিস না কিরকম মেজাজ নিয়ে আছে সব।'

'বাবা বলে, সিভিক্ গার্ডদেরও নাকি যুদ্ধে ঠেলে দেবে।'

'ভাগ শালা, ছাগলে টানবে রথ—!' অবহেলায উড়িয়ে দিল কথাটা বাসু। উপহাসের হাসি হাসল।

একটুক্ষণ চুপ দু'জনেই। তারপর বাসু বললে, 'পল্টুদা বলেছে আমায়। আমি ঢুকবো। পরশুদিন ব্রাবোর্ন কোর্টে নিয়ে যাবে আমায়।'

'কি আছে সেখানে?'

'অফিস। যাবি তুই?'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করে নি।'

'বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করবি কি! কচি খোকা নাকি তুই? সব কথায় বাবা বাবা।'

'কি করবো।' গৌরাঙ্গ কেমন যেন অপ্রতিভ। ম্লান গলায় বললে, 'বাপ-মার এক ছেলে, বুঝিস তো! বাবাটা আবার বড্ড ভীতু।'

আর কিছু বললে না বাসু। হঠাৎ কে জানে কেন, নিজের বাবার কথাও মনে পড়ল। অস্পষ্ট ক'টা ছবি। আবছা ভাবে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'চল্ উঠি।' বাসু উঠে দাঁড়াল। গৌরাঙ্গও।

রাস্তার কল থেকে হাতটা ধুয়ে নিল বাসু। মিষ্টি আর বাতাসা কিনতে হবে। ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়।

কেনাকাটি শেষ হলে দু'বন্ধুতে আবার গলির পথে হাঁটতে লাগল।

'কি করবি সন্ধ্যেবেলা?' গৌরাঙ্গ শুধোল।

'কি আর, যা করি রোজ। এখানে সেখানে গেঁজাব।'

'ছোট্‌কা আমায় গেটে ছেড়ে দেবে বলেছে। হাফটাইমে। ভালো বই হচ্ছে রে রূপমে। যাবি?'

'থাকিস তবে পাড়াতে, আসব। 'বাসু উৎসাহ জানায়।

ফটিক দে লেনের ভেতরে ঢুকে পড়ে দু'জনেই। ডাইনে বাঁয়ে টাল খেতে খেতে একটা রিক্‌শা আসছে। রিক্‌শায় বসে স্থূলকায়া বিধবা এক মহিলা, পাশে ঘোমটা-টানা একটি বউ। কোলে একটি ডাগর বয়সের মেয়ে। একটা বাচ্চা ছেলে পায়ের কাছে হয়ে বসে।

বাসুদের সঙ্গে চোখাচুখি হতে ডাগর বয়সের মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি লুকোতে চাইল। দু'জনের কোলে বসে গা তার টলছিল। লজ্জা ঢাকতে আরও হেলে পড়ল বউ-টির পাশে। গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি পরা বউটি আড় চোখে তাকাল। লজ্জা পাওয়া হাসি একটু মুখে।

রিক্‌শাটাকে জায়গা ছেড়ে দিতে ওদের অন্য বাড়ির রক ঘেঁষে দাঁড়াতে হল। তবু গায়ের সঙ্গে চাকা ঘষে যাচ্ছে প্রায়। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ফিকে একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাসুদের নাকের কাছে।

পাশ কাটিয়ে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে রিক্‌শার কাটা পর্দার দিকে চেয়ে বাসু পাখি তাড়ান শব্দ করলে —হুস!

দুই

বাড়ি এসেই বুকের মধ্যে থেকে টাকাগুলো বের করে মার হাতে দিয়েছে সুধা। প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি রত্নময়ী। ভেবেছিলেন চিঠি। চিঠির মুখ-ছেঁড়া খামে ভরা ছিল। খড়খড় করছিল।

খামটা হাতে নিয়ে রত্নময়ী শুধোলেন, 'কার চিঠি রে, কোথ্ থেকে পেলি ?'

গলা, ঘাড়, বুক থেকে শাড়ির আঁটসাট ভাঁজগুলো খুলতে খুলতে হাঁফ ছাড়ছিল সুধা। মুখ তুলে হেসে বললে, 'দেখই না।' একটু ইতস্তত ক'রে, আঁচল দিয়ে মুখ গলা আলতো করে মুছেই ফেলল সুধা। শাড়িটা কাল না বদলালেই নয়।

'টাকা!' ক'টা নোট হাতে নিয়ে রীতিমত বিস্মিত হচ্ছিলেন রত্নময়ী। মেয়ের দিকে বোকার মতন তাকিয়ে ছিলেন।

জামা কাপড় আলগা করে, গা ছড়িয়ে তক্তপোশটার ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছিল সুধা। আলস্যটা বেশ লাগছে। মনটাও ঝরঝরে। কড়িকাঠের দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে খুশীগলায় বললে সুধা, 'মাইনে পেলাম।'

রত্নময়ীর বুকে খুশীর হাভুড়ি যেন ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে গেল।

'ওমা, আজই মাইনে দিয়ে দিল ? আজ নিয়ে এ-চাকরিতে তোর ত মাত্র উনিশ দিন হয়েছে।' রত্নময়ী তক্তপোশ ঘেঁষে মেয়ের পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন।

'এ-অফিসে মাসের পয়লা তারিখেই মাইনে দিয়ে দেয়। আমার ত একটা দিন দেরি হয়ে গেল। আলাদা হিসেব করে মিটিয়ে দিল খুচরো ক'দিনের মাইনে। এর পর থেকে মাসের হিসেব।' সুধা উঠে বসল। আরতি কোথায়, মা ?'

'আছে এ-দিকে ও-দিকে কোথাও ?'

উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিলে সুধা। ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল এক নিশ্বাসেই।

'পঁয়তাল্লিশ টাকা?'

'হ্যাঁ। পথে আসতে মল্লিকদের রোয়াকে বাসুকে দেখলাম। তাকে বাজার-টাজার আনতে টাকা দিয়ে এলাম। মিষ্টি আনতে বলেছি এক টাকার, তোমার জন্যে।' সুধা হাসল মার দিকে তাকিয়ে।

'আমার জন্যে!' রত্নময়ীর মুখের নরম হাসি আস্তে আস্তে ঢেকে এল। অদ্ভুত এক বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়ল। গালের পাশে কপালে কয়েকটা রেখা কুঁচকে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি উন্মনা।

সুধা সরে এল মার কাছটিতে। এ-ধরনের মুহূর্তে মা যে কী ভাবে সুধার জানা আছে। গলা জড়িয়ে ধরল ছেলেমানুষেব মতন, আব্দারের সুরে বলল, 'কেন, তোমার কি মিষ্টি খেতে নেই? মাইনেটা পেলাম আজ। আনন্দ করে একটা দিনও ত মানুষ টুকটাক্ আনায় মা।'

'জানি রে, ভাইবোনে তোরা আনন্দ করে খা।' মেয়ের গায়ে হাত রাখলেন রত্নময়ী। থমথমে মুখে বিবর্ণ হাসির রঙ লেগেছে।

'তুমি খাবে না?' অভিমান ফুটল সুধার গলায়।

'আনন্দ করার দিন কি আমার আছে, সুধা!' রত্নময়ী মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন; চাপা কান্নার মতন একটু কাঁপা, মৃদু, আবেগ-চাপা স্বর ফুটছিল তাঁর গলায়, 'তোর রোজগারের পয়সায় দুবেলা দু'টো খাচ্ছি পরছি। কোনোদিন ভাবিনি এমন হবে, হতে পারে।'

'তোর রোজগার, তোর রোজগার করো কেন তুমি বলো ত, মা। শুনলে মনে হয় আমি কে-না-কে পরটর বুঝি!' মার গলা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুধা। চোখেমুখে রাগ রাগ ভাব।

'মেয়েকে পর করতে প্যারাও সুখের, সুধা। তোকে ত সত্যি পর করতে

পারলাম না।' রত্নময়ীর বিষণ্ণ হাসি সুধার মুখ থেকে যেন সমস্ত ক্লান্তি, অভিমান মুছে নিচ্ছিল। 'কত আশাই ছিল।'

'কী তোমার কথা মা, মেয়েকে পর করতে পারায় সুখ। আর ছেলেকে—'

'ছেলেকে নিজের করায়'—রত্নময়ী কথা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার বেলা ঠিক উলটো হল। ছেলেটাই পর হয়েছে। সব কপাল।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রত্নময়ী।

সুধা আর কথা বললে না। কিছু খুঁজে পেলনা বলার মতন। ঘরের কোণে সরে গিয়ে আলনা থেকে শাড়ি, সায়া তুলে নিতে লাগল। গা-টা না ধুয়ে আসা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। ঘামে ধুলোয় বালিতে সারা গা-হাত-পা চটচট করছে ; করকর করছে।

টাকাগুলো রাখছিলেন রত্নময়ী পালিশ ওঠা বিবর্ণ হাত বাক্সে। রাখতে রাখতে মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ঠাকুরের পায়ে দু'টো ফুল বাতাসা দিতে হবে সুধা।'

'বলেছি বাসুকে আনতে।' সুধা শাড়ি সায়া তুলে নিয়ে সাবান খুঁজছিল। 'সাবান বুঝি নেই মা ?'

'না। কাপড় কাচা সাবান একটু আছে।'

'তাই দাও। সুধা কোথায় যেন একটু বিরক্তি বোধ করলে।

'দরকার কি, আরতিকে দিয়ে একটা গায়ে মাখা সাবান আনিয়ে নে না। বিষ্টুদের দোকানেই পাওয়া যাবে।'

'না, না। আরতিকে তুমি হৈ হুট করে দোকান-ঘাটে পাঠিয়ো না ত। এ পাড়ার ছোঁড়াগুলো অত্যন্ত অসভ্য।' সুধার ভুরু কুঁচকে উঠল।

'ওরা অসভ্য ত আমার কি, আমি অসভ্য না হলেই হল। তুই দাঁড়া একটু, আমি আরতিকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। এই তো নিচেই দোকান বলতে গেলে। যাবে আর আসবে।' রত্নময়ী বেরিয়ে যেতে যেতে

বলছিলেন, 'সারাদিন যত রাজ্যের ধুলোময়লা ঘেঁটে এলি, সাবান না হলে চলে।'

ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছিল সুধা। আরতিকে ডাকছে মা।

কলঘরটা নীচে। ফাঁকা উঠোনের এককোণে একটুখানি জায়গা ঘেরা। মাথার ওপর টিন। দরজাটাও তাই। আলো নেই। শ্যাওলা জমে জমে মেঝেটা পিছল হয়ে রয়েছে। অন্ধকারে ঢুকতে একটু ভয়ই করে। তবে অভ্যেস হয়ে গেছে সকলেরই। পা টিপে টিপে ঠিক চৌবাচ্চার কাছটিতে চলে আসতে পারে সকলেই। তবু দু'একটা আছাড় কে-না খেয়েছে। সুধাও।

আজ কলঘরের কাছে এসে দাঁড়াতেই সুধার মনে হল, কলঘরের একটা বাতির ব্যবস্থা করতেই হবে। কী-ই বা এমন কঠিন কাজ, নতুন করে সামান্য একটু তার টেনে একটা বাতি ঝুলিয়ে দিলেই হয়ে যায়—তবু কারুর গা নেই। না বাড়িওয়ালার, না নীচের ভাড়াটেদের। সুধারা তবু বলেছে ক'বার, বাড়িওয়ালা গা করে না। মাস তিনেকের ভাড়া জমে গেছে বলে যেন ওরা আর মানুষই নয়। এতো বচ্ছরের ভাড়াটে তারা—অবস্থার ফেরে পড়ে যদি ক'টা মাস বাকিই ফেলে থাকে ভাড়া, তা বলে এতোগুলো লোকের সামান্য একটু সুখ সুবিধেও দেখবে না।

আর নীচের ভাড়াটে পারুল বৌদিরাও যেন কেমনতর মানুষ। কিছুতেই অসুবিধের কথা বলবে না।

অসুবিধেই যেন হয়না ওদের। দু'টো কাচ্চা বাচ্চা, আইবুড়ো ননদ আর গান-পাগলা স্বামী নিয়ে বেশ আছে পারুল বৌদিরা। আনন্দবাবু তাঁর তানপুরা, হারমোনিয়ম, ডুগি তবলা, পান বিড়ি আর সাকরেদদের নিয়ে সকাল দুপুর রাত—সব ভুলে বসে আছেন। খালি গান, তবলার বোল, সুর নিয়ে সাধ্যসাধনা। মাঝে মাঝে তর্কাতর্কি। সংসার সম্বন্ধে ভদ্রলোকের যেন কোনো চিন্তাই নেই। যত ঝক্কি-ঝামেলা সব পারুল বৌদির।

পারুলবৌদির কথা ভাবতে শুরু করলে সুধা অবাক হয়ে যায়। বয়স বেশি নয় পারুল বৌদির। বছর চব্বিশ হবে। দেখতেও মোটামুটি ভালই। এখন না হয় শরীর ভেঙেছে, কিন্তু দেখে বোঝা যায় কেমন ছিল বিয়ের আগে। আর আনন্দবাবুর বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ হবে। রোগা, কালো। এর মধ্যেই কুঁজো হয়ে পড়েছেন। গাল ভেঙেছে, চোয়াল ফুটেছে। দাঁতও পড়েছে ক'টা। পারুল বৌদি বলে, ওদের বিয়ে হয়েছে বছর ছয়েক হল। অর্থাৎ কনের বয়স যখন আঠারো কি উনিশ, বরের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ।

কলতলার অন্ধকারে শ্যাওলায় পা দিয়ে কেমন একটু আনমনা হয়ে যায় সুধা। শক্ত করে পা-টিপে দাঁড়িয়ে থাকে। চোরের মতন। যেন কেউ ওকে দেখে ফেলবে।

তারপর অন্ধকারেই আস্তে আস্তে পা-টিপে টিপে চৌবাচ্চার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে না পেলেও ঠিক মতন অনুমান করে দড়ির ওপর শুকনো কাপড় জামাগুলো রাখে সুধা। মগটা ফুটো। জল তুলতে গেলে ঝর ঝর করে পড়ে।

কয়েক মগ জল গায়ে পর পর ঢেলে নিল সুধা। ঠাণ্ডা হাত যেন সারা গায় বুলিয়ে দিল কেউ। খানিকটা জল তুলে সাবান ভিজিয়ে নিল। নতুন সাবানের গন্ধ উঠল, ফিকে গন্ধ।

পারুল বৌদিদের ঘর থেকে এতক্ষণে আনন্দবাবুর গলা শোনা গেল। কথা বলছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে। মনে হল কোথাও বেরিয়েছিলেন; ফিরছেন এইমাত্র।

অল্পক্ষণ পরেই আনন্দবাবু কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিলেন কলঘরের দিকে। দরজাটা অবশ্য বন্ধই আছে। তবু তাড়াতাড়ি ক' মগ জল জোরে জোরে ঢালল সুধা। শব্দ দিয়ে তার উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল।

'কে রে, বেলা নাকি?' আনন্দবাবু উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন।

কোনও জবাব দিল না সুধা। জলও ঢালল না আর। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'ওগো'—আনন্দবাবু পারুল বৌদিকে ডাকছিলেন। পারুল বৌদিও এসে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দবাবু বলছিলেন, 'সন্ধ্যে উতরে বুঝি বেলাটা কলঘরে গিয়ে ঢুকেছে।'

'না। বেলা ত কখন গা ধুয়ে পাশের বাড়ি চলে গেছে আড্ডা দিতে।' পারুল বৌদি কলঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, 'মাসিমা হবেন কিংবা সুধা।' তারপর কলঘরের অন্ধকারের উদ্দেশে নীচু গলায় প্রশ্ন, 'কে, সুধা?'

'হুঁ।' চাপা গলায় সাড়া দিল সুধা।

আনন্দবাবু ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁর খড়মের শব্দ উঠছিল।

'আমি আসছি, বৌদি।' সুধা মৃদু গলায় বললে।

'থাক্ থাক্ তাড়াহুড়ো করতে হবে না তোমায়।' পারুল বৌদি জবাব দিলে। মনে হল এগিয়ে গেছে পারুল বৌদি ক'পা—গলার স্বরটা একটু দূর দূর লাগছিল। স্বামীকে উদ্দেশ করে বলছিল পারুল বৌদি, 'তুমি ত শুধু মুখ হাত ধোবে। দিচ্ছি তোমায় জল। রান্নাঘরের বালতিতে জল আছে আমার।'

সুধা নিশ্চিন্ত বোধ করলে। কেন, কে জানে? অন্ধকার শ্যাওলা পড়া কলতলা, নতুন সাবানের গন্ধ তার আশ্চর্য রকম ভালো লাগছিল আজ। আর একলা হতে, একলা থাকতে। নিজেকে সমস্ত চোখের আড়ালে রাখতে এমনি ভালো কেন যে লাগে মাঝে মাঝে।

আবার নতুন করে মুখে গলায় হাতে সাবানের ফেনা জমিয়ে তুলল সুধা। আর মাঝে মাঝে তার হাত মসৃণ ফেনাটুকু তরল রাখার জন্যে নড়ছিল আস্তে আস্তে, নয়ত নড়ছিল না, থেমে থাকছিল। যদিও অন্ধকারে কোনো কিছুই দেখার নয়, তবু সুধা চোখ চেয়ে তাকিয়েছিল সামনেই। ভাবছিল। উকিল বাড়ির টিউশনির কথাটা মনে পড়ল একবার।

দেওয়াল

সন্ধ্যে হয়ে গেছে—যেতে হবে,
কিন্তু ইচ্ছে করছিল না আর।
করে বসে আছে—আজ আর পড়াতে
চিন্তাটাকে ও সরিয়ে দিল মন থেকে। এক৮
যায় না।

চিন্তাটাকে সরিয়ে দিয়ে অফিসের কথাই ভাবতে
অফিসের কথা। উনিশ দিন আগেও যে-অফিস তার
সে-অফিসের লোকজন রাস্তাঘাট কিছুই নয়। ওদের পাড়ার২
স্কুলটায় অনেক হাতে-পায়ে ধরে চাকরি একটা জুটিয়ে নিয়ে।
পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে। আর উকিলদের বাড়ির বাচ্চা দু'টি মে৲
পড়াত। দশ টাকা। হঠাৎ মিশন রো'র প্রাসাদতুল্য বাড়িটার একতলা৯
অফিসে চাকরিটা জুটে গেল। নেহাত ভাগ্য। সুধা ভাবে নি এ-চাকরি
তার হাতে পারে। তবু হল।

খবরটা সুধা জেনেছিল স্কুলে ; অমলাদির কাছে। অমলাদিও ও-স্কুলে নতুন এসেছিল। তারও সংসারের অবস্থা খারাপ, সুধার মতন। পঞ্চাশ টাকায় চলার নয়। অমলাই কোথা থেকে খবর এনে চুপি চুপি জানাল। মিশন রো-র এক অফিসে লোক নেবে কয়েক জন। মেয়েও। সওদাগরী অফিস। যুদ্ধের জন্যে অফিসটার কী কী কাজ বেড়েছে যেন। অফিসের সুপারিনটেনডেণ্ট লোকটি নাকি বড় ভালো।

সুধা মা-কেও জানায় নি। জানালে রাজী হতেন না রত্নময়ী। একে পাড়ায়, তায় মেয়ে-স্কুলে চাকরি বলে নিমরাজী হয়ে মত দিয়েছিলেন। অফিস-টফিসে নানা রকম মানুষ-জনের সঙ্গে কাজ করার কথায় আপত্তি তুলতেন নিশ্চয়। তাঁর সংস্কারে বাঁধত এবং সম্মানেও। তাছাড়া কাজটা হবে কি হবে না তারই যখন ঠিক নেই তখন আগে থেকে একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে লাভ কি!

হাতে দরখাস্ত। সাদা লম্বা

নটেনডেণ্টের ঘরে তাঁর টেবিলের

ল স্থধার। নিচু মুখে বসেছিল আর

কথা বললেন স্থপারিনটেনডেণ্ট। স্থধাকে তখন

করতে হয়েছে। হ্যাঁ, বাইরে পার্টিশান-করা এক-

বসেছিল ও। আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় গলা বুক শুকিয়ে

হল।

ছেলে এসে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল, হাতে তার একটা

। স্থধার অস্বস্তি বাড়ল তাতে। একেই ত এত লোকজন

রুষভরা ঘরে ঢুকে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। লজ্জা করছিল। এবং ভয়ও এক ধরনের। তার ওপর চাকরি খুঁজতে এসেছে আর অফিস-স্থদ্ধ লোকজন কৌতূহলভরে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে—ভাবলেই বিশ্রী এক সঙ্কোচে আর চোখ তোলার সাহস থাকে না। পার্টিশান ঘরে একা বসতে পেয়ে একটু তবু হাঁফ ছাড়তে পেরেছিল স্থধা। ছেলেটি মুখ বাড়ানোয় আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

প্রথমবার মুখ গলিয়েই চলে গিয়েছিল ছেলেটি। আবার এল মিনিট দশেক পরে। এবার সরাসরি স্থধার কাছে এসে দাঁড়াল। 'আপনার নাম স্থধা ভট্টাচার্য?' পরিষ্কার, নরম, সহজ স্বর।

স্থধা চমকে উঠল। কোনও রকমে একটি পলকের জন্যে মুখ তুলে হেঁট-মাথায় বসে থাকল। গলায় কথা ফুটছিল না। অদ্ভুত এক লজ্জা। অস্ফুট স্বরে মাথা নেড়ে কাজ সারলে।

'আপনার অ্যাপ্লিকেশনটায় কয়েকটা কথা বাদ পড়েছে। এই নিন—আমাদের অফিসের ছাপা ফর্ম; এতে যা যা জানতে চাইছে লিখে দিন।' ছেলেটি ফর্ম এগিয়ে দিল, সঙ্গে পিন দিয়ে গাঁথা স্থধার অ্যাপলিকেশনটাও।

হাত বাড়িয়ে নিল সুধা। উঠে দাঁড়িয়েছিল চেয়ার ছেড়ে আগেই। সামনেই একটা গোল মতন টেবিল। ছাপানো ফর্মটা দুর্বোধ্য চেহারা নিয়ে চোখের ওপর ভাসছে।

টেবিলের ওপর কাগজ রেখে এ-দিক ও-দিক তাকাল সুধা। কোথাও কালি-কলম নেই।

ছেলেটি বুঝতে পারল।

'কলম? এই নিন্—!' পকেট থেকে ফাউণ্টেনপেনটা তুলে একেবারে লেখার মতনটি করে এগিয়ে দিল।

সুধা কলম নিল।

ফর্মের ফাঁক ভরতে গিয়ে সুধার হাত কাঁপছিল, লেখাটা আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আর ভীষণ হাত ঘামছে। কাগজটাই ভিজে ওঠার যোগাড়। বার বার হাত মুছছিল সুধা।

'বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন দেখছি।' ছেলেটি হাসিমুখে বললে, 'ধীরে সুস্থে লিখুন।'

সুধা লজ্জা পেলেও একটু বুঝি সাহসী হল।

'এটা কি লিখব?' অস্পষ্ট গলায় শুধোল সুধা। আঙ্গুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল।

'লিখুন, বেঙ্গলী হিন্দু, ব্রাহ্মিণ।'

সুধা লিখল।

'এটা?'

'ঠিকানা লিখুন। বাড়িব ঠিকানা।'

'কলকাতার ঠিকানা ত?'

'যদি কলকাতাতেই বরাবর থেকে থাকেন তবে তাই।'

'তা ত থাকি নি। বছর পাঁচেক এখানে আছি।' সুধা চোখ তুলে চাইল।

'তবে দেশের ঠিকানা লিখুন। আর ওই প্রেজেণ্ট অ্যাড্রেসের পাশে কলকাতার ঠিকানা লিখবেন।'

এমনি টুকটাক প্রশ্ন আর জবাব। জিজ্ঞেস করে করে লিখল সুধা। ভদ্রলোকের সাহায্যে ও কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। আর একটু একটু করে আড়ষ্ট ভাবটা কাটছিল।

ওর নাম সুচারু। নিজে থেকেই কী প্রসঙ্গে যেন পরিচয় দিয়েছিল ভদ্রলোক। আর বলেছিল শেষে, 'একটা কথা বলে দি। সুপারিনটেনডেণ্ট আমাদের বড় সদাশয় ব্যক্তি। দুস্থ জনের ওপর প্রচুর সহানুভূতি। কথাবার্তা যা বলবেন বুঝেসুঝে। সত্যি কথা বলবেন। মন ভিজে গেলে কোন কিছুতেই আটকাবে না।'

উপদেশটা কাজে লেগেছিল খুব। সুধা খোলাখুলি সব বলেছিল। বাড়ির অবস্থা, তাদের কথা। আর আশ্চর্য এই যে, চাকরিটা হয়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গেই। অমলাদিরও। হয়ে ভাল হল। দু'জনে একসঙ্গে চাকরি পাওয়াতে তবু সুধা একটু সাহস পেল, আর সহজ হতে পারল।

সুচারুর সঙ্গে অফিসে রোজই দেখা হয়। সুপারিনটেনডেণ্টের পার্সনাল ক্লার্ক। ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। সুধাদের চেয়ে বছর পাঁচের বড় হবে—এই চব্বিশ পঁচিশ। সুধা উনিশে চলছে।

অফিসে ওই একটি মাত্র লোকের সঙ্গে কথাবার্তা দু-চারটে বলে সুধা। সুচারুও খোঁজখবর নেয়। কাজকর্ম বুঝতে পারছেন ত? অসুবিধে হলে ইন্‌চার্জকে বলবেন। অফিসের কথা ছাড়া অন্য কথাও মাঝে মাঝে এক আধটা বলে। কি, ভাল আছেন ত? কাল আপনাদের পাড়ার কাছাকাছি গিয়েছিলাম।

সেদিন হঠাৎ একটা কাগজ দেখিয়ে বললে, যুদ্ধের অবস্থাটা বেশ ঘোরাল হয়ে এল। দেখছেন ত জাপানটা কিরকম শকুনির মতন তাকাচ্ছে। সহজে এ-যুদ্ধ থামবে বলে মনে হয় না।

'কেন?' সুধা বোকার মতন প্রশ্ন করেছিল।

'কি করে থামবে বলুন! একে একে সব ক'টা দেশই যদি জড়িয়ে পড়ে!'

আর একদিন বললে, 'ডি এল রায়ের সেই আলেকজাণ্ডারের মতন বলতে ইচ্ছে করে, কী বিচিত্র এই জগৎ, কোথায় হচ্ছে যুদ্ধ আর কলকাতার, মিশন রোয়ের এক সওদাগরী অফিসে শুধু সেই যুদ্ধের জন্যেই আপনার আমার চাকরি জুটে গেল। ভাবতে পারেন ব্যাপারটা!'

না। সুধা ভাবতে পারে না। বরং এ-যুদ্ধ কী তা না-বুঝেও যুদ্ধের ওপর ও কৃতজ্ঞ থাকতে পারে। যুদ্ধ না বাধলে এ-চাকরি সুধা হয়ত পেত না। আর এ-চাকরি না পেলে উপবাস অনটনের মাত্রাটা আরও বাড়ত। কাজেই যে-যুদ্ধ ওদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে, সুধা মনে মনে তার ওপর কৃতজ্ঞ থাকা ছাড়া আর কি থাকতে পারে।

এ-সব কথাবার্তা যখন বলে সুচারু তখন কেমন যেন ভাব। সুধা বুঝতে পারে না। অবাক হয়। কিন্তু এমনিতে সুচারুকে ভালই লাগে সুধার। ভদ্র মিষ্টি-স্বভাব, হাসিখুশী পুরুষ। আতিশয্য নেই কোথাও। আবার ও ঠিক নিজের মধ্যেই আগল দিয়ে বসে নেই। চেহারাটাও ভাল। সাধারণ স্বাস্থ্য, রং ফর্সা, মুখে চোখে জলজলে ভাব, বুদ্ধির ছাপ আছে, আবার বেশ খানিকটা ভাবুক ভাবুক দৃষ্টি।

'সুধা।'

চমকে উঠল সুধা। তন্ময়তা ভেঙে গেল ডাকে। কোথায় যেন তলিয়ে গিয়েছিল, ভেসে উঠল। অদ্ভুত একটা লজ্জা এই অন্ধকারেও ওকে মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট করে দিল।

শুকনো কাপড় জামা পরা হয়ে গিয়েছিল। ভিজে কাপড়গুলো পড়েছিল পায়ের তলায়। তাড়াতাড়ি কেচে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সুধা।

'কিসের ধ্যান করছিলে ভাই এতক্ষণ?' পারুল হেসে শুধোল।

'কিসের আবার ধ্যান—' সুধাও হাসল, 'একটু আরাম করে গা ধুচ্ছিলাম।'

'আর কিছু না ত ?' পারুলের ফাজিলসুর হাসি।

'আবার কি !' সুধা চলতে চলতে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

পারুল কলঘরে ঢুকল।

সিঁড়ির মুখে আসতেই বাসুর সঙ্গে দেখা। বাসু সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এসেছিল।

'কোথায় যাচ্ছিস রে ?'

'এই একটু ওখানে।' বাধা পড়ায় বাসু প্রমাদ গুণছিল।

'তাড়াতাড়ি ফিরবি।' সুধা সিঁড়ি উঠতে লাগল।

অবাক হয়ে দিদিকে দেখছিল বাসু। কি হল দিদির হঠাৎ! ভুরভুর গন্ধ নিয়ে এত খুশী মেজাজে ওপরে উঠছে। বাসু ত ভেবেছিল, এখুনি বাইরে বেরুনো নিয়ে গজগজ শুরু করবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, কিছুই বলল না দিদি। রাতারাতি স্বভাবটা বদলে গেল নাকি !

বেশ অবাক হয়েই বাসু রাস্তায় পা বাড়াল।

তিন

সন্ধ্যে ঘনিয়েছে অনেকক্ষণ। বারান্দার ফাঁকা জায়গাটুকুতে ভিজে জামা কাপড় মেলে দিতে দিতে সুধা দেখছিল। ওরই এক কোণে এক চিলতে রান্নাঘর। উনুন জ্বলছে। হাতা খুন্তির শব্দ। রত্নময়ী নিজেই বোধ হয় কোটাকুটি শেষ করে রান্না চড়িয়েছেন। দোরের গোড়ায় আরতি। উবু হয়ে বসে। পিঠের ওপর বেণীটা ঝুলছে। মাথা হেঁট। পিছন থেকে ওর হাত মুখ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সুধা। কেটলি চামচের শব্দ শুনে শুধু অনুমান করতে পারছিল, চা তৈরি করছে আরতি। রত্নময়ীর মুখটা তবু পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। উনুনে কড়া চাপানো। টিমটিম বাতি। ফরসা মতন একটি মুখের আভাস। মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে, ঘাড় ঘুরছে এদিক ওদিক। গায়ে জামা নেই। হাত গা দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য রোগা আর বুড়োটে দেখাচ্ছে মাকে। সুধা দেখছিল আর ভাবছিল। ছত্রিশ সাঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই মা যেন পঞ্চাশের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। অথচ এই মা, তাদের মা, বললে হয়ত আজ কেউই বিশ্বাস করতে চাইবে না, কী সুন্দরীই না ছিল। গায়ের রঙ ফেটে পড়ত, চোক নাক মুখ কোথাও যদি খুঁত থাকে! শুধু ক'টি বসন্তের দাগ মুখের অমন সৌন্দর্যতেও যা খুঁত ধরিয়ে দিল। আর স্বাস্থ্য, মার স্বাস্থ্য এতকাল ভালই ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর—বড় তাড়াতাড়ি সেই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে।

কাপড় জামা মেলে দিয়ে সুধা ঢুকল ঘরে। দেওয়ালে আয়না টাঙানো। কাঠের ছোট্ট একটি র‍্যাক্। চিরুনি, কাঁটা, ফিতে, পাউডারের কৌটা টুকিটাকি কত কি। হাত বাড়িয়ে চিরুনি নিতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল্ হল। মুখ ফিরিয়ে দেখে—বাবার ফটোর ওপর টাটকা মালা। সাদা সরু সুতোর মতন। জানলার কোণে—মার বিছানার মাথার দিকে—

কাঠের ছোট জলচৌকির ওপর ঠাকুরের পট, লাল সালুর কাপড়ের ওপর ঠাকুরের ছবি। ছবির গায়ে এমনি আর একটি মালা জড়ান, একটি ধূপ জ্বলছে এখনো, সামান্য একটু গন্ধ ঘরে। এগিয়ে গেল সুধা।

প্রণাম সেরে সরে এল বাবার ছবির কাছে। অনুজ্জ্বল আলোয় বাবার মুখ স্পষ্ট করে দেখা যায় না। না যাক্—চোখ না-বুজে খোলা চোখেও যদি একটিবার বাবাকে ভাবে, যত স্পষ্ট হয়ে ফুঠে উঠবে বাবা, এমন আর কে। সত্যি, মাঝে মাঝে শুধু যখন বাবার কথাই ভাবে সুধা, মনে হয় বাবাকে ও হাত বাড়ালে বুঝি ছুঁতে পারবে, এত স্পষ্ট হয়ে তার কাছে ধরা দেন বাবা।

বুক টনটন করে ওঠে সুধার। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। প্রণাম করতে গিয়ে গলার কাছে জমাট একটা কান্না ঠেলে উঠল। জল এসে পড়ল চোখে। আরও একটি ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে সরে এল বাবার ছবির কাছ থেকে।

মনটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। কেমন এক শূন্য অনুভূতি। বুকের ওপর ভার চাপান যেন। নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ছন্দে তাল কেটে গেছে। থেমে থেমে বুক শুষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

অন্যমনস্ক ভাবেই সুধা কোনোরকমে জড়ান শাড়িটা এবার গুছিয়ে পরে নেয়। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে। মুখও। সামান্য একটু পাউডার বুলোয়। চুলটাও ঠিক করে নেয় চিরুনি দিয়ে।

রান্নাঘরের চৌকাটে এসে দাঁড়াতে রত্নময়ী বললেন, 'চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল ; তাড়াতাড়ি খেয়ে নে ত !'

আরতি উঠে জায়গা ছেড়ে দিল সুধাকে।

বসল সুধা।

'বাতাসা নিয়েছিস ঠাকুরের রেকাবি থেকে ?' শুধোলেন রত্নময়ী।

'না।'

'নিয়ে আয় ত, আরতি।' রত্নময়ী জলখাবারের থালা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন। থালার একপাশে একমুঠো চিঁড়ে ভাজা, দু'টি সন্দেশ।

'ওরা খেয়েছে মিষ্টি?' সুধা সুধোল।

মাথা নেড়ে হাঁ জানালেন রত্নময়ী।

'তোমার জন্যে রেখেছ ত? না হলে কিন্তু সত্যি আমি ছোঁব না ও মিষ্টি।'

'না রেখে উপায় আছে তোর জ্বালায়।' রত্নময়ী মেয়ের মুখে চোখ রেখে ভ্রূকুটি করলেন। একটু থেমে বললেন আবার, 'সন্ধ্যে উতরে কলঘর থেকে বেরুলি, পড়াতে যাবি না আজ?'

'না। ইচ্ছে করছে না।'

আরতি ঠাকুরের রেকাবি থেকে বাতাসা এনে দিল। কপালে ছুঁইয়ে মুখে পুরল সুধা।

চিঁড়ে ভাজা চিবোতে চিবোতে বললে সুধা একটু পরে, 'হাঁরে আরতি, বাসু তোকে চকলেট এনে দিয়েছে?'

দিদির পিঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল আরতি।

'হ্যাঁ, দিয়েছে।'

'দিয়েছে ত কই আমাকে একটা দিলি না? সব বুঝি তুই একলাই মুখে পুরে বসে আছিস?' সুধা ছোট বোনের সঙ্গে খুনসুটি শুরু করে।

'তা বই কি!' আরতি পিঠের বেণী দুলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে, 'আমি একটাও খাই নি এখনো, রেখে দিয়েছি। সব। কাগজ সুদ্ধু। দাদাই যা দুটো নিয়ে পালিয়েছে।'

'দিলি কেন তুই?' সুধা চায়ে চুমুক দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ছোট বোনকে দেখবার চেষ্টা করল।

'বয়ে গেছে আমার দিতে। দাদাই বলে আগেভাগে তুলে নিয়ে তারপর ঠোঙাটা হাতে দিল।'

'ও! কোথায় গেলরে বাসু?' সুধা প্রশ্ন করে।

'সিনেমা দেখতে।'

'সিনেমা—!' সুধা ঘাড় ঘোরাল। রত্নময়ীও তাকালেন আরতির দিকে।

'পয়সা পেল কোথায়? বাজার থেকে চুরি করেছে নিশ্চয়।'

'কি জানি। বললে ত গৌরাঙ্গদার সঙ্গে যাবে। টিকিট লাগবে না।' আরতি দাঁতে নোখ কাটছিল। বেফাঁস কথাটা বলে ফেলে ভয় ভয় করছিল তার। এই গোপন কথাটা প্রকাশ করে দেওয়ার পরিণাম খুব সুবিধের হবে না।

চা-টুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল সুধা। হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে ও। চৌকাট ছেড়ে বাইরে দাঁড়াল। আরতির পাশেই।

'বাসুকে তুমি এবার একটু কড়া হয়ে শাসন কর, মা।' সুধা বিরক্ত হয়ে বললে।

'শাসন কি কম করেছি, না করছি সুধা।' রত্নময়ী খুন্তির শব্দ তুলে বললেন।

'শুধু কথায় হবে না।' সুধার স্বর রুক্ষ।

'কি করব তবে, অত বড় ছেলেকে মারধোর করব. না তাড়িয়ে দেব বাড়ি থেকে।' তরকারিতে জল ঢেলে রত্নময়ী পিঁড়ি ঠেলে উঠলেন।

বাইরে এসে আঁচলে মুখ-কপালের ঘাম মুছলেন রত্নময়ী।

'কখনো কারুর গায়েই হাত তুলিনি আমি। বুড়ো মদ্দ ছেলেকে আমি কি করব, সুধা?'

'কিন্তু পাড়ার ওই সব বকাটে বদমাশ গুণ্ডা ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে মিশে ওর পরকাল যে ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে, মা।' সুধা তিক্ত গলায় বলছিল।

'জানি। দেখছিও ত নিজের চোখে।'

'সেদিন—' কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সুধা আরতির দিকে

চেয়ে। খেঁকিয়ে উঠল ওকেই আচমকা 'তুই এখনো এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস! বড় মানুষের কথায় থাকার এমন বিশ্রী স্বভাব হয়েছে তোর। কেন, সন্ধ্যে বেলা একটু বই মুখে করে বসতে পারিস না। খালি হৈ হৈ, আড্ডা।'

ধমক খেয়ে আরতি আস্তে আস্তে চলে গেল।

'কি সেদিন ?' রত্নময়ী পুরোন প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ—সেদিন যাচ্ছি, দেখি বাসুদের বন্ধু ওই মদনটা মল্লিকদের আস্তাবলের আড়াল থেকে ডাক্তারদের বাড়ির মেয়ে—পরীকে হাত নেড়ে ইশারা করছে। আমায় দেখতে পেয়ে লুকোল।' কথা বলতে বলতে সুধার চোখমুখ গরম হয়ে উঠেছিল, কুঁচকে আসছিল কপাল।

চোখের আর পাতা পড়ছিল না রত্নময়ীর। অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। যেন দৃশ্যটা অনুমান করবার চেষ্টা করছিলেন।

'এই ত সব ছেলে এ পাড়ার।' সুধা ঘৃণার সঙ্গে বলছিল, 'মূর্খ, বদমাশ, হতচ্ছাড়া, অসভ্য। আমি ভেবেই পাই না মা, এদের বাড়ি ঘরই বা কেমন, এরাই বা কেমন। শিক্ষা, ভদ্রতা, বিনয়—কোনো কিছুর লেশমাত্র নেই।'

'বাড়িঘরের দোষ কি, সুধা। বাপ-মায়ে কি ছেলেমেয়েকে নষ্ট হতে দিতে চায়।'

'চায় বই কি। না হলে ওরা এমন হয় কেন ?'

'হয় নিজেদের দোষে। বাসুকে আমরা কি না করলাম। শাসন, বারণ —কত বুঝোলাম, ভাল কথা বললাম—কি হল ? যেমন কে তেমনটি। দিনে দিনে আরও গোল্লায় যাচ্ছে।' রত্নময়ীর গলায় খেদ।

'সঙ্গদোষ যতদিন না যাচ্ছে ওর কিছু হবে না।' সুধা সরে গিয়ে আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

রত্নময়ী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ অন্ধকারে। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

সুধা অন্যমনস্ক। সামনে পাশে পিছনে তাকাবার উপায় নেই। এ-বাড়ি ও-বাড়ি দেওয়াল কী ছাদ আড়াল পড়ে অন্ধকারকে আরও ঘন করেছে। উঁচু চোখে তাকালো, কালো আকাশ তারায় তারায় ভরা। চাঁদ নেই। হাওয়াও সামান্য। তবু সুধার একটু যেন গা শিরশির করছে। অতক্ষণ কলঘরে থাকার দরুণই হয়ত। জলও কিছু কম গায়ে ঢালে নি সুধা। এখন ত আর ঠিক গরম কাল নেই। বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ পড়ে গেছে। শেষ হতেই চলল প্রায়।

গলার মধ্যে খুস্ খুস্ করছিল। টেনে টেনে ছোট্ট করে ক'বার কাশল সুধা।

আনন্দবাবুর গলা শোনা গেল। গান ধরেছেন। হারমোনিয়মের সুর ভেসে আসছিল, ডুগি-তবলার সঙ্গত। একটি কলি-ই ফিরে ফিরে কানে আসছে : কুঞ্জন বন ছাড়ি মাধব কাঁহা যাও গুণধাম।

আলসের গায়ে বুক ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল সুধা। গালে হাত রাখল। বেশ লাগছে গানের সুরটা। প্রথম প্রথম কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারেনি। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ; বুঝতে পারছে সুধা। মানেটাও অনুমান করে নিতে আর কষ্ট হচ্ছে না।

হয়ত সুর, হয়ত বা সুর নয়, শুধু সুরের আড়ালে গানের কথাগুলো, এই অন্ধকারে, কথা ডিঙিয়ে, ইট কাঠ কলতলা ছাড়িয়ে এখানের হাওয়ায় ভেসে ভেসে আর কিছু মেলে ধরছিল। অন্য এক বেদনা। আশ্চর্য শান্ত এক দুঃখ।

অন্য এক ভাবনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল সুধা। আকাশে যেমন করে ছেঁড়া মেঘগুলো ভেসে যায়, অনেকটা তেমনি। অস্পষ্ট খাপছাড়া ভাবে কিছু ভাবছে সুধা, সে-ভাবনা মাঝপথে ফিকে হয়ে অন্য কথা এসে পড়ে। কেমন করে যেন।

খানিক আগে বাবার জন্যে মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেই মন খারাপ কাটাতে গিয়েও পারেনি সুধা। বাসুর কথা নিয়ে আরও খানিকটা

বিরক্তি, তিক্ততা সৃষ্টি করে ফেলেছে। আজকের দিনে এ-সব চাইনি সুধা। খুশী থাকতেই চাইছিল। অথচ পারল না।

অবশ্য, এখন আর, বাবা বাসু কারুর কথাই বাস্তবিক সে ভাবছে না। মা বা আরতির সম্বন্ধেও চিন্তা নেই উপস্থিত। বরং মনটা খানিক হাওয়া-ভর করে উড়ে উড়ে ঘোরাফেরা করছে। কল্পনার এ-ঘাট সে-ঘাট ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে। তবু, কি আশ্চর্য, সেই কল্পনার মধ্যেও কোথাও সুখ নেই।

মাধবের কুঞ্জ বন ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা তার পাবার কথা নয়। এমনও নয়, রাধার মতন সে-ও জলের মাছ। জল শুকিয়ে প্রাণসংকট উপস্থিত তার। তবু তেমনি এক অদ্ভুত শূন্যতা এই অন্ধকারে সুধাকে ঘিরে ফেলল একটু একটু করে। আশ্চর্য! কেমন করে যে, সুধা বুঝতেই পারল না।

হুঁশ হল যখন তখন রাত বেড়েছে। আকাশের পশ্চিম কোণের তারাগুলো মেঘে ঢেকে গেছে। হাওয়া দিয়েছে। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া। কোথাও বুঝি বৃষ্টি নেমেছে।

সুধা আলসে ছেড়ে সরে এল। চোখে পড়ল বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে হাতে মাথা দিয়ে রত্নময়ী পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

একবার মনে হল, মাকে ডাকে। আবার মনে হল, ঘড়িটা দেখে নেয় আগে।

ঘরে ঢুকে সুধা দাঁড়াল। আরতি গালে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ে একমনে কী পড়ছে যেন। কোনও খেয়াল নেই। সুধার পায়ের শব্দটুকু পর্যন্ত কানে যায়নি।

মনে মনে হাসল সুধা। একটু বুঝিবা দুঃখও হল। মেয়েটাকে তখন অকারণে ধমক দিয়েছে। না দিলেও হত।

আরতির পাশে এসে বসল সুধা। বোনকে একটু আদর করারই ইচ্ছে। গায়ে ছোঁয়া লাগতে ধড়মড়িয়ে টান হয়ে বসল আরতি। হাতের বইটা মুড়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। মুখচোখ আশংকাভরা।

বোনের মুখের দিকে তাকিয়েই সন্দেহ হল সুধার। ঘাড় ঘুরিয়ে বইটা দেখল। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। প্রথম দু-একটি পাতা ওল্টালো।

'এ-বই কোথ্ থেকে পেলি?' ভুরু কুঁচকে উঠেছে সুধার। মুখের রেখাগুলি কঠিন।

আরতি চুপ। মুখ নীচু করে বসে।

'কথা বলছিস না যে, কে দিল এই বই?' সুধা আরতির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

'বেলাদি।' আরতি ভয়ে ভয়ে চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল।

সুধা একটু চুপ। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তীব্র চোখে তাকিয়ে দেখছিল আরতিকে। আরতির দেহটাকে বোধ হয়। কিশোরী মেয়ে। বছর তের বয়স। সবেমাত্র বাড়ন্তটা দেহে ধরা দিয়েছে। মোটাসোটা গড়ন নয় বরং একটু রোগা বলে এখনো বাড়িতে আরতিকে ফ্রক পরিয়ে রাখা হয়। তা ছাড়া শাড়ি জোটাবার সামর্থ্যও নেই। যে-ক'দিন পরে ফ্রকই পরুক মেয়েটা—সুধাই একদিন বলেছিল। কিন্তু আজ সামনা সামনি বসে মুখোমুখি তাকিয়ে হঠাৎ সুধার অন্য রকম লাগছিল। আরতিকে অন্য চোখে দেখছিল সুধা। হ্যাঁ, আর, আর ফ্রক পরিয়ে রাখা চলে না, সুধা ভাবছিল এবং ওর চোখে আরতির আঁটো জামাটা দৃষ্টিকটু লাগছিল।

অন্য একটা কথাও ভাবছিল সুধা। আরতি সে বয়সে পৌঁছে গেছে যে-বয়সে এই সব নভেল-টভেলে ওর মন এখন খুবই বসবে।

'নাটক নভেল পড়ার বয়স এখনো তোমার হয়নি।' বললে সুধা তবুও। গম্ভীর মুখে, ভারি গলায়। 'কি তুমি বোঝ এ-সবের?'

আরতি চুপ। ভয় ভয় মুখে মাথা নীচু করে বসে নোক খুঁটছে।

'বই আমি বেলাকে ফেরত দিয়ে দেবো। আর কখনো এ-সব বই তুমি পড়বে না।' একটু থামল সুধা। বললে আবার, 'আর বেলা তোমার চেয়ে বয়সে বড়। তার সঙ্গে কিসের এত ভাব তোমার?'

বই হাতে উঠে পড়ল সুধা।

দেওয়ালের তাকে টাইমপিস ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে। কাছে এসে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায়। ঘড়ি দেখল সুধা। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। বাসু ফেরেনি এখনো।

চার

বাসু ফিরল আরও রাত করে। সুধা আরতির খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেছে। রত্নময়ী বসে আছেন হেঁসেল আগলে।

দোতলায় ওঠার মুখেই হাতে মুখে জল ঢেলে এসেছে খানিকটা, ওপরে উঠেই অন্ধকারে রত্নময়ীকে দেখতে পেয়ে বললে, খেতে দাও মা।

রত্নময়ী উঠলেন। রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলেন আবার। গামছা খুঁজছিল বাসু। ঠাওর করতে পারছিল না প্রথমটায়। বারান্দার ঝোলান তারেই গামছা ঝুলছিল, সুধার শাড়ির পাশেই। কোনরকমে মুখ হাত পা মুছে তাল পাকিয়ে গামছাটা রেখে দিল তারের ওপরেই। উঁকি মেরে দেখল ঘরের ভেতরটা। সুধা তখনও শোয় নি।

বাসুর থালা এগিয়ে দিয়ে রত্নময়ী একটু পাশ ঘেঁষে নিজের খাবারটুকুও নিয়ে বসেছেন। ছোট থালায় খান তিনেক শুকনো রুটি, একটু তরকারি।

রত্নময়ীই শুধোলেন প্রথমে, 'কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

স্বরটা গম্ভীর ; চাপা ঝাঁঝ ফুটে উঠছিল। খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল বাসু। মা'র মুখটা থমথম করছে। বুঝতেই পারল বাসু—আজ আবার এক দফা হয়ে গেছে তাকে নিয়ে মা আর দিদিতে। কবেই বা না হয়। কিন্তু আজ দিদির ভাবগতিক দেখে বাসুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল রাতটা ভাল ভাবেই কেটে যাবে। তা যে গেলনা, বোঝাই যাচ্ছে এবার।

'কোথায় আবার যাবো। যতীনের বাড়িতে বসে ক্যারাম খেলছিলাম।'

'ক্যারাম খেলছিলে' রত্নময়ী পুনরাবৃত্তির সুরে বললেন কথাটা, এবং এক মুহূর্ত থেমে ধমকের গলায় যোগ করলেন, 'মিথ্যে কথা বলতে মুখে একটুকুও বাধে না তোমার, না?'

বাসু ঘাড় পিঠ উঁচু করে সোজা হল। তাকাল রত্নময়ীর দিকে।

'মিথ্যে কথা ত মিথ্যে কথা, বেশ তাই। কাল যতীনকে ডেকে আনব জি জ্ঞস করে নিয়ো।'

'কাউকে আমার জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। সবাই সমান তোমরা। আর তুমি ভাব বাড়ির বাইরে গিয়ে মা দিদির চোখে ধুলো দিয়ে বেশ কাটানো যায়—কেউ জানতে পারে না কি করছে!

বাসু যে পরিমাণ ঘাড় পিঠ সোজা করে মুখোমুখি তাকিয়েছিল রত্নময়ীর দিকে সেই পরিমাণ গুটিয়ে নিল নিজেকে।

'বেশ জান তো জান। রাস্তার লোকে কে কি এসে বলবে, আর তোমরা তাই বিশ্বাস কবে চোটপাট শুরু করবে আমার ওপর।' গজগজ করছিল বাসু রাগে।

'সিনেমায় যাও নি তুমি আজ?' রত্নময়ী বললেন।

'সিনেমা—?' বাসু আকাশ থেকে পড়ার মতন বিস্ময়ে মুখভঙ্গি করলে। মনে মনে নিমেষে ঘটনাটা বুঝে ফেলল। আরতিই যে বলে দিয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। রাগে গা জ্বলছিল বাসুর। কাছে পেলে ঠাস করে দুই চাটি কষিয়ে দিত আরতির গালে। কথাটাকে তবু ঘোরাবার চেষ্টা করল বাসু। ঠোঁট বেঁকিয়ে কেমন হতাশার এক ভঙ্গি করলে, 'পকেটে আমার পয়সা ঝনঝন করে বাজছে কিনা—সিনেমা দেখতে যাব। চারটে পয়সা চাইলে কখনো দাও তোমরা যে খুব বলছ?'

'না দিই না, দেব না। কোথা থেকে দেব তা ভেবে দেখেছ কখনো? বুড়ো মদ্দ ছেলে, ঘরে বসে খাচ্ছ আর আড্ডা মারছ, দিদি চাকরি করে টাকা আনলে তবে পেটে ভাত জুটছে চারটে লোকের। আর ফুর্তি করবার জন্যে পয়সা চাইছ তুমি? লজ্জা করে না।' রত্নময়ীর গলা ঘর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছিল। অসম্ভব চটে গেছেন তিনি। সহজে যা হয় না। বিশেষ কারণ না ঘটলে এমনিতেই রত্নময়ীর গলার স্বর পাঁচ হাত

দূরের মানুষও শুনতে পায় না। রাগের মুখেও কদাচিৎ ধৈর্য হারিয়ে এত জোরে কথা বলেন তিনি। এবং একসঙ্গে এত কথা।

মার গলা শুনে সুধা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের কাছটিতে দাঁড়িয়েছে। কেউ তাকে দেখেনি, দেখতে পায় নি।

বাসুও রেগে উঠেছে। ক্রমশই রাগ চড়ছিল। এবং রাগের সঙ্গে ক্ষোভ, বিরাগ। মার শেষ কথাগুলোয় হঠাৎ কেমন যেন আহত হল বাসু। এই কথাগুলো আগেও না শুনেছে বাসু তা নয়, শুনেছে। তবে ঠিক এ-ভাবে নয়। থালা থেকে হাত উঠিয়ে একবার মার মুখের দিকে তাকাল, একবার ভাতের থালার দিকে। পাতের ওপর সুন্দর করে রান্না করা মাছের তরকারিটা তখনও পড়ে আছে। থালাটা হঠাৎ সামনে ঠেলে দিলে বাসু। আবেগ-কাঁপা গলায় বললে, 'দুবেলা দুটো ডাল ভাত দাও বলে এত কথা শোনাবে তোমরা! কুকুর নাকি আমি!'

রত্নময়ী স্তম্ভিত। যেন প্রত্যাশাই করতে পারেন নি কখনো, তাঁর নিজের হাতে এগিয়ে দেওয়া ভাতের থালা অমনি ভাবে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে বাসু বা আর কেউ, তাঁর অন্য সন্তানরা। নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকলেন তিনি বাসুর মুখের দিকে।

বাসু উঠে পড়েছিল। সুধা চৌকাটে দাঁড়িয়ে। ভাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বসিয়ে দিতে চাইল।

'খুব বাড় বেড়েছিস না? পাত ফেলে উঠছিস?' সুধা বললে।

আচমকা সুধার আবির্ভাবে এবং তার বাধায় বাসুকে বসে পড়তে হল।

'তোর হয়েছে কি এ্যাঁ, মার সঙ্গে চোটপাট করে কথা বলচিস?' আবার বললে সুধা।

'চোটপাট আবার কি, যা বলেছি ঠিক বলেছি।' কথাগুলো দ্রুত বলে গেল বাসু।

'মা তোমায় মন্দ কথাটা কি বলেছে? সুধা বলছিল ভায়ের দিকে

তাকিয়ে, 'সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা তুমি বুঝবে না। কেউ তোমায় সে-কথা বলতে পারবে না।'

'বলবার আছে কি? আমরা ত আর বড় লোক নই, গরীব। এমনি ভাবেই চলবে।' বাসু বললে হঠাৎ। কি ভেবে, কোন কথায় সে-ই জানে।

ভাইয়ের মুখ থেকে ব্যাপারটার এমন অক্লেশ সমাধান শুনে সুধা হতবাক। রত্নময়ীরও কানে গেছে কথাগুলো।

একটু সামলে নিয়ে সুধা ঠোঁটের গোড়ায় হাসল। বললে, 'গরীব, বড়লোক অনেক শিখেছিস আজকাল। কিন্তু সে কথা যাক্—আমরা গরীবেরও অধম। তা বলে বড়লোক হবই বা না কেন? সে-চেষ্টা করেছিস কখনো?

'বড়লোক আবার হয় কি করে মানুষে!' বাসু অবাক। ওর ধারণা বড়লোক হওয়াটা জন্মের সঙ্গে সম্পর্ক পাতান। বড়লোকের ছেলেপুলে হয়ে জন্মাতে না পারলে বড়লোক হওয়া যায় না।

'চাকরি বাকরি করে পয়সা রোজগার করে নিয়ে আয়। বড়লোক না-ই বা হতে পারলাম একটু সচ্ছল ভাবে থাকতে পারব ত!' সুধা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাইকে বোঝাচ্ছিল।

'চাকরি কি ছড়ানো আছে যে চাইলেই হয়ে যাবে আমার?'

'আমার কি করে হল?'

'তুমি! তোমার কথা আলাদা। মেয়েদের চাকরি একটা কেন একশোটা পাওয়া যায়।'

সুধা চুপ। তার মনে হল বাসু যেন তার সমস্ত চেষ্টা, পরিশ্রম, ক্লেশের গৌরব এক মুহূর্তে টেনে মাটিতে ছুঁড়ে দিল। খানিকক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে বোকার মতন তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল সুধা। বললে, 'মেয়েদের চাকরি একশোটা পাওয়া গেলে ছেলেদের হাজারটা চাকরি পাওয়া যায়। চেষ্টা করেছিস তুই? সারাদিন ত বকাটে বদমাশ কতকগুলো ছেলের সঙ্গে মিশে পাড়াময় ইতরামি করে বেড়াচ্ছিস!'

'চেষ্টা করছি কি না করছি কাল পরশুই দেখতে পাবে।' বাসুর কথায় সামান্য রুক্ষতা এবং আত্মগর্ব ছিল।

'তাই নাকি ?' সুধা বিদ্রূপ করল।

'সিভিক গার্ডে ঢুকবো।'

সুধা অবাক। রত্নময়ী ছেলের দিকে তখনো তাকিয়ে। দৃষ্টিটার অর্থ বদলে গেল এই যা।

'আর কিছু জুটলো না তোর, বলিহারি পছন্দ। রাস্তাঘাটে খাকি জামা গায়ে দিয়ে, লাঠি হাতে দারোয়ান চৌকিদারের মত ট্যাং ট্যাং করে বেড়াবি। তারপর একে তাকে ধরে মোড়লি করবি, ফেরিওয়ালা ধরে দু'চার আনা পয়সা কেড়ে নিবি, মাগনায় চায়ের দোকান থেকে চা খাবি, পানের দোকান থেকে বিড়ি সিগারেট। ছি, ছি, ছি! বাবার নাম এমনিতেই ডুবিয়েছিস, আবো ডুবো। সুধা অধৈর্য অস্থির হয়ে ছটফট করছিল। সারা মুখে ঘৃণা আর বিরক্তি।

বাসু ভাবতেই পারেনি এ-রকম কোন বাধা আসতে পারে। সুধার কথা-বার্তা শুনে বিমূঢ় হয়ে পড়ল খানিকটা। পাড়ার যারা সিভিক গার্ড তারা যে কি কি করে—এসব গল্প বাসুই তো বাড়িতে করেছে আরতির কাছে, মার কাছেও। ওর ধারণা ছিল, এ-গুলো হীন ছ্যাচড়া কাজ নয়, দেমাক দাপটের কাজ। সিভিক গার্ডদের কী রকমটা খাতির করে চলে আজকাল লোকজন, বাসু সে-সব গল্প করত, গার্ডদের দাপটটা বোঝাবার চেষ্টা করত।

'তোমার ছেলে যদি ওই হতচ্ছাড়া টহলদারদের খাতায় নাম লেখায় মা, আমি—আমি—কিন্তু ঠিক বলছি - ' কথাটা কী ভাবে শেষ করবে, কী বলবে কিছুই মনে না আসায় সুধা থেমে গেল। আর দ্বিতীয় কোনও প্রসঙ্গ ওঠবার আগেই ঘর ছেড়ে চলে গেল সোজা।

মা ছেলে দুজনেই বোবা। বাসু একটুক্ষণ উসখুস করে ভাতের থালাটা টেনে নিল আবার। বড় বড় গ্রাসে খেতে লাগল। খিদে পেয়েছিল খুব।

রত্নময়ী দু'খানি রুটিও পুরো খেলেন না। ছোট বাটিতে আলাদা করে একপাশে ঢাকা দিয়ে রাখলেন। সকালে আরতি খাবে।

ঢক ঢক করে জল খেয়ে বাসু উঠে পড়ল। উঠতে উঠতে মৃদুগলায় গজগজ করছিল এই বলে যে দু'বেলা উঠতে বসতে গালাগাল দেবে সকলেই অথচ একটা কাজ যোগাড় করে আনলেও তাতে বাগড়া দেওয়া চাই।

দমকা একটা হাওয়া দিয়ে গেল তারপর টুপটাপ বৃষ্টি নামল। ঘর অন্ধকার; জানলা খোলা। রত্নময়ী বিছানায় শুয়ে; শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন বৃষ্টি নেমেছে। উঠলেন তাড়াতাড়ি। দরজা খুলে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। তারের ওপর সুধার শাড়ি সায়া মেলা রয়েছে, আরও যেন কী দু'একটা। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়ছিল, মুখেও। যতটা সম্ভব শাড়ি জামা তুলে নিচ্ছিলেন। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া তাঁর খোলা গা গলায় শীতল স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

ঘরের গা লাগিয়ে লম্বালম্বি হাত দু'য়েক চওড়া ঢাকা এক ফালি বারান্দা। সামনের উঠোনেরই অংশ। একটি একটি করে আবার সব বারান্দায় শুকোতে দিচ্ছিলেন রত্নময়ী। বৃষ্টি পড়ছিল। উঠোনের সিমেণ্টে সুন্দর এক শব্দ উঠছিল।

বাসুর ঘরের দরজা বন্ধ। বাতি নিভনো। ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা। এ-ঘরে সুধা আরতি ঘুমোচ্ছে। রাত অনেক। সবার চোখেই ঘুম জড়িয়ে গেছে, রত্নময়ী বাদে। রত্নময়ীর চোখে ঘুম নেই, ঘুম আসে নি। বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে মেয়েদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছিলেন, বিচিত্র ছন্দের সেই শব্দ আর ঘুমের ঘোরে তাদের অসংলগ্ন একটি দু'টি জড়ানো কথা, কী ছন্নছাড়া শব্দাংশ। আর ঘড়ির টিকটিক। মাঝে মাঝে নিজের দীর্ঘশ্বাস।

আজ ব'লে নয়, এমনি করে প্রায় রোজই রত্নময়ীকে অন্ধকারে একলা জেগে থেকে সন্তানদের বিচিত্র নিশ্বাস-ছন্দ শুনতে হয়, তাদের চোখে না-দেখেও দেখতে হয় মনে মনে, প্রত্যেককে, একে একে। প্রত্যেকের

হয়ে, প্রত্যেকের জন্যে একে একে ভাবতে হয়। ভেবেই চলেছেন রত্নময়ী, আর এ-ভাবনার শেষ হবে এমন আশাও করেন না এখন।

আজও ভাবছিলেন। আজকের ভাবনা আরও ভার হয়ে চেপে বসেছিল, আরও জট পাকিয়ে জটিল হয়ে।

স্বামী মারা গেছেন প্রায় দু'বছর হতে চলল। কলকাতায় এসেছেন তা বছর পাঁচেক হল বৈকি। সব ছবির মতন আলাদা করে রত্নময়ীর মনে গাঁথা আছে।

আজ বিছানায় শুয়ে সেই ছবিগুলিই পর পর দেখছিলেন রত্নময়ী। যদিও এতে শুধু কষ্ট আর কষ্ট, যে-কষ্ট বুক গলা আস্তে আস্তে টিপে ধরে দমবন্ধ করে দেয়—তবু কখনো কখনো রত্নময়ীকে একা একা এই ছবিগুলো এমনি করে অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়। তিনি ছাড়া আর কে দেখবে, আর কার দেখার কথা।

সেটা কত সাল অত যদি বা মনে নাও থাক, তবু রত্নময়ীর মনে আছে পাঁচ বছর আগে এমনি এক বর্ষায় কলকাতায় এসে পা দিয়েছিলেন তাঁরা।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবারের সকাল। মাসটা ছিল শ্রাবণ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, গোমড়া মুখ কলকাতার আকাশ। হাওড়া স্টেশনে এসে পা দিলেন রত্নময়ীরা। মাঝে মাঝে কে জানে কেন রত্নময়ীর সেই সকালটির কথা মনে হয়, আর ভাবেন, কলকাতায় পা দিয়ে সেই যে গোমড়া মুখ আকাশ দেখেছিলেন কলকাতার সেই গোমড়া মুখ আর কাটলনা কোনদিন। প্রথম দিন থেকেই কলকাতা শহর যেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাঁদের দিক থেকে। শত্রুতা শুরু করেছে।

স্বামী, চন্দ্রকান্ত স্টেশনের গোলমাল আর ভিড় গিজগিজ দেখে নামতেও সাহস করেন নি। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসেছিলেন আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে খুঁজছিলেন একটি চেনা মুখ। ছেলেমেয়েরা

উসখুস করছিল। সুধা চোখ বড় বড় করে গাড়ি আর লোক দেখছিল। বাসু দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে হাফ্ প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আরতি ভয়ে এঁটে ছিল রত্নময়ীর আঁচলের সঙ্গে। আর রত্নময়ী টুকিটাকি জিনিসগুলো এক জায়গায় করে পুঁটলি বাঁধছিলেন।

এমন সময় মোহিত ঠাকুরপো এসে হাজির। চন্দ্রকান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সাদরে অভ্যর্থনা করলেন মোহিত ঠাকুরপো।

চন্দ্রকান্তদের কলকাতায় টেনে আনার পিছনে মোহিত ঠাকুরপোর উদ্যোগটা ছিল সবচেয়ে বেশি। একই জায়গার লোক তাঁরা, চন্দ্রকান্ত এবং মোহিত ঠাকুরপো; একই গ্রামের প্রতিবেশী। মোহিত ঠাকুরপো গ্রাম ছেড়েছিলেন অনেক আগেই এক রকম। কলকাতায় বউ মেয়ে নিয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে গ্রামে যেতেন মার কাছে। বইয়ের দোকানে কিসের যেন কাজ করতেন। তারপর শুরু করলেন ব্যবসা। বইয়ের ব্যবসা।

চন্দ্রকান্তকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন মোহিত ঠাকুরপো। তিনিই একদিন কথাটা পাড়লেন স্বামী-স্ত্রীর সামনে।

প্রস্তাব শুনেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়া দিয়ে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। কলকাতায় যাব রোজগার বাড়াতে? না, না—দরকার নেই রোজগার বাড়ানোর। সে-এক বিদঘুটে শহর, গোলমাল চেঁচামেচি, হৈচৈ, আকাশ নেই, বাতাস চলতে পথ পায়না, রোগ, ময়লা! এই আমার ভাল, বর্ধমানের এই ছোট্ট গ্রাম। এখানে বাপ-পিতামহের ভাঙা ভিটেতেও বেশ আছি শান্তিতে। স্কুলে পণ্ডিতি করি। নিজে পুঁথিপত্তর পড়ি। কি দরকার আমার কলকাতায় গিয়ে।

সরাসরি না করলেও অত সহজে হাল ছাড়লেন না মোহিত ঠাকুরপো। লেগে থাকলেন। যখনই গ্রামে আসতেন, বাড়িতে আসতেন চন্দ্রকান্তের। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার সেই একই প্রস্তাব তার। শেষ পর্যন্ত রত্নময়ীকে সালিস ধরলেন।

কথাগুলো এখনো স্পষ্ট মনে আছে রত্নময়ীর। মোহিত ঠাকুরপো বলতেন, আচ্ছা বৌদি, দাদার এ কী গোঁ আমায় বোঝান ত। আমার কথাটা মন্দ কিসের তাই বোঝান আমায়। দাদাকে কি আমি মন্দ পরামর্শ দিচ্ছি।

বাস্তবিকপক্ষে রত্নময়ীরও মনে হয়নি তখন মোহিত ঠাকুরপো মন্দ কিছু বলছেন। বরং সৎ পরামর্শই দিচ্ছেন তিনি—যাতে তাঁর স্বামীর ভাল হয়। এবং সংসারের।

মোহিত ঠাকুরপো বুঝিয়েছিলেন, গ্রাম আঁকড়ে পড়ে থাকলে আজকের দিনে আর কিছু হবে না। কী আছে গ্রামে, কোন্ আকর্ষণ? গ্রামের খড়-টিন ছাওয়া হাইস্কুলে পণ্ডিতি করেন চন্দ্রকান্ত, মাইনে পান সত্তর পঁচাত্তর টাকা। তাও সব সময় সব মাসে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। ছাত্রের দল যা আছে তারা গর্দভ বিশেষ। অথচ চন্দ্রকান্তর পাণ্ডিত্য যা তাতে সামান্য একটা গ্রামের স্কুলের হেডপণ্ডিত হয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া মানে নিজের প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি, উন্নতি—এ-সমস্তকে অবহেলায় নষ্ট করা। একে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি বলা যায়! এখানে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে চন্দ্রকান্তর না আছে যথোচিত মর্যাদা, সম্মান, সুযোগ। অর্থও না। কলকাতায় গেলে, সেখানকার জ্ঞানী গুণী সমাজে চন্দ্রকান্ত যথার্থ মর্যাদা পাবেন এবং সুযোগও। হ্যাঁ, তারা লুফে নেবে। এমনিতে চন্দ্রকান্ত বি এ পাশ—তার ওপর ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণের দুরূহতম কঠিনতম শাস্ত্রও সহজে আয়ত্ত করে উপাধি পেয়েছেন। চন্দ্রকান্ত বিদ্যারত্ন, সত্যিই বিদ্যারত্ন। এমন পাণ্ডিত লোক কলকাতার স্কুল কলেজের মাস্টারদের মধ্যেও বা ক'টা আছে? কলকাতায় গেলে চন্দ্রকান্তর অন্ন এক জায়গায় নয় একশো জায়গায় বাঁধা আছে।

হ্যাঁ, অর্থের কথাটাও চিন্তা না করার নয়। বলতে কি, চন্দ্রকান্তর সংসার এমন কি ছোট—স্ত্রী, দুটি কন্যা এবং পুত্র। কন্যাদের পাত্রস্থ করতে হবে, যোগ্য পাত্র চাই। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে তার সুযোগ

সুবিধে দরকার। এখানে সে-সবের সুযোগ কই। গ্রামের সংসারে কায়ক্লেশে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বই নয়। অভাব অনটন আছে এবং ভবিষ্যতেও যে এটা ঘুচবে এমন আশা করা যায় না যতদিন এখানে আছেন।

কলকাতায় গেলে দাদার অন্ন খায় কে বৌদি? মোহিত ঠাকুরপো বলতেন, সেখানে এমন লোকের কাজ পেতে সাতটা দিনও লাগবে না। স্কুল কলেজে লুফে নেবে। বিশ্বাস না হয়, দাদা শুধু একবার সম্মতি দিন, কিছু তাঁকে করতে হবে না, আমিই ব্যবস্থা করছি।

কথাগুলো ভাববার মতন। অন্তত চন্দ্রকান্তর মতন এক কথায় না করে দিতে পারেন না রত্নময়ী। আসলে সংসার রত্নময়ীর, চন্দ্রকান্তর নয়। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতি করেন স্কুলে এবং বাকি সময়টা শুধু পুঁথিপত্তর মুখে বসে থাকেন। সংসারের নিত্য প্রয়োজন, অভাব অসুবিধা, পুত্র-কন্যা-স্ত্রীর সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না, করতে পারেন না। সে-স্বভাব তাঁর গড়ে ওঠেনি। বিদ্যাই তাঁর সব যেন, সব, এমন কি, রত্নময়ী বিয়ের পর হেসে বলতেন, ওই পুঁথিপত্তরই তাঁর সতীন।

কাজেই সংসার রত্নময়ীর। তাঁকেই সব আগলাতে হয়, দেখতে হয়। শুধু দু'মুঠো শাকভাত স্বামী এবং সন্তানদের মুখে তুলে দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ নয়। আরও আছে এবং অনেক, অনেক রকম সে কর্তব্য। সকলের সুখ, দুঃখ, কষ্ট, আধিব্যাধি, পোশাক পরিচ্ছদ—সবই তাঁকে দেখতে হয়, ব্যবস্থা করতে হয়। এবং সবচেয়ে দুরূহতম যা—সেই ভবিষ্যতের চিন্তা করতে হয় এতগুলি লোকের। সন্তানদের মানুষ করে জীবনের রাজপথে এনে না দাঁড়-করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তাঁর ছুটি নেই, মুক্তি নেই।

দিনে দিনে সুধার বয়স বেড়ে চলেছে—নেহাত গৌরিদানে, না চন্দ্রকান্ত, না রত্নময়ীর সামান্যমাত্র সমর্থন আছে, তাই প্রতিবেশীদের উচ্চবাচ্য সত্ত্বেও কেউই এযাবৎ মাথা ঘামাতে বসেননি, নয়ত সুধার পাত্র যোগাড় করার জন্যে ঘুম বন্ধ হয়ে আসত উভয়ের। এবং কপর্দকমাত্র সম্বল যাদের নেই সেই

নিঃসহায় জনক-জননী কন্যার বিবাহের অর্থ সমস্যা কি করে সমাধান করতেন, করতে পারতেন সে এক শুধু ঈশ্বরই জানেন।

সুধাকে পাত্রস্থ করার পর আছে বাসুর শিক্ষা। চন্দ্রকান্ত বিদ্যারত্নের একমাত্র পুত্রসন্তান মূর্খ হয়ে থাকবে এ-চিন্তা করতেই পারতেন না রত্নময়ী। স্বামীর বিদ্যানুরাগ এবং পাণ্ডিত্যকে যতটা শ্রদ্ধা করতেন তিনি, ততটা ভালবাসতেন। গৌরববোধ করতেন। রত্নময়ীর সবচেয়ে বড় সাধ, পিতার মতন পুত্রও শিক্ষার, বিদ্যার সাধনা করবে এবং শীর্ষে গিয়ে পৌছবে। তারপর অর্থোপার্জন, সংসার।

শেষে থাকে আরতি। আরতি সম্পর্কে রত্নময়ীর অন্য এক রকম দুর্বলতা। এ-দুর্বলতার কারণও খুঁজে পান না তিনি। আশ্চর্য, এ-মেয়ের গর্ভধারিণী তিনি নন। রক্তের কোন সম্পর্কই নেই। রত্নময়ীর কাকিমার বোন—সে সম্পর্কে এক মাসী, সেই মাসীর মেয়ে পার্বতী, বয়সে রত্নময়ীর সমান সমান ছিল, আর ভাব ছিল গলায় গলায়, সখী সম্পর্ক—সেই পার্বতী-ই আরতির গর্ভধারিণী। পার্বতীর স্বামী লোক ভাল ছিল না। নেশাভাঙ করত, চরিত্র-দোষ ছিল, তিন তিনটে বিয়ে করেছিল কন্যাপক্ষকে ঠকিয়ে। সে এক ইতিহাস। অমন শয়তানটাই শেষপর্যন্ত পার্বতীর নামে কলঙ্ক রটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। পার্বতী তখন অন্তঃসত্ত্বা। তার কোনো আশ্রয় নেই, সম্বল নেই। আত্মহত্যা করতে গিয়েও পারেনি পেটের শত্রুর কথা ভেবে। এল রত্নময়ীর কাছে। রত্নময়ী বুক আড়াল করে আশ্রয় দিলেন। চন্দ্রকান্ত সেদিন সব শুনে স্ত্রীর হাত ধরে আবেগে অশ্রু ফেলে বলেছিলেন, রত্ন—সত্যিই তুমি রত্ন।

পার্বতীর মাথায় গণ্ডগোল ঘটেছিল কি যেন। ক্রমশই উন্মাদ হয়ে আসছিল মেয়েটা। আরতি ভূমিষ্ঠ হল। পার্বতীর ব্যারাম আরও বাড়ল। বদ্ধ পাগল। এক মাসের শিশুকেই একদিন মেরে ফেলতে গিয়েছিল। রত্নময়ী ভয়ে শিশুকে পার্বতীর বিছানা থেকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায়

বুকের পাশে এনে শুইয়ে রাখলেন। সেই যে তুলে এনেছিলেন বুকের কাছটিতে আর সরাবার সময় পেলেন না, ফেরত দিতে পারলেন না যার কন্যা তাকে, কন্যা-ভূমিষ্ঠের ঠিক দু'মাস পরে পার্বতী মারা গেল। রত্নময়ীর সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে হল তিন। আরতিকে কেউ হাত বাড়িয়ে নিতে আসেনি, রত্নময়ীও দেন নি। চন্দ্রকান্তও কখনো বলেন নি, ও পরের মেয়ে। পরের হয়েও নিজের হয়ে গেল আরতি। আর সুধা বাসুর সঙ্গে আরতির কোথাও এতটুকু ভেদাভেদ রইল না। পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতন ওরা বেড়ে উঠেছে একসঙ্গে, একই বিছানায় শুয়ে, একই পিতামাতার সমস্ত স্নেহ শোষণ করে।

এই আরতি—এর সম্পর্কেও রত্নময়ীর দায়িত্ব কিছু কম নয়। সুধার মতন আরতির ভবিষ্যতের কথাও রত্নময়ীকে ভাবতে হয়। তবে সবার ছোট বলে ওর সম্পর্কে ভাবনাটা এখনো তেমন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, কোলের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে মানুষের যে দুর্বলতা—আরতির সম্পর্কে তেমনি দুর্বলতা রত্নময়ীর। কাছছাড়া করতে হবে কখনো এ-কথা ভাবলেই বুক টনটন করে ওঠে।

হ্যাঁ, রত্নময়ীকে এতো দায় দায়িত্বের কথা ভাবতে হত। মোহিত ঠাকুরপোর প্রস্তাব তাই তিনি হুট করে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। অনেক রাত একা একা ভেবেছেন। শত হলেও রত্নময়ী মেয়েমানুষ। সব তলিয়ে ভেবে কলকাতা যেতে রাজী হয়েছিলেন তিনি।

চন্দ্রকান্ত বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদর পাবেন, তার আর্থিক জীবনে উন্নতি হবে, ছেলেমেয়েগুলো শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পাবে, মেয়েদের বিয়ে থা'র ব্যবস্থাও কোন্ না হবে—রত্নময়ী ভেবেছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আর এও বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন ওখানে সংসারে সচ্ছলতা আসবে মোটামুটি, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে, এই নিত্য অনটনের ক্লান্তিকর জীবনের রূপটা

পালটে যাবে—। হ্যাঁ, ভবিষ্যতের কথা, সংসারের কথা, স্বামী সন্তানদের কথা ভেবে রত্নময়ীর ঝোঁক চাপল কলকাতায় আসার।

চন্দ্রকান্ত তবু নারাজ। উনি বলতেন, এত আশা নিয়ে যাচ্ছ যদি আশাভঙ্গ হয়।

রত্নময়ী বলতেন, না, হবে না। মোহিত ঠাকুরপো নিজে জীবনে কি কম উন্নতিটা করলেন। এখনও করছেন। ওর কি-ই বা ছিল সম্বল। আর তোমার অত বিদ্যে রয়েছে তোমার না-হবে কেন?

পাগলামি কবো না রত্ন। বলতেন চন্দ্রকান্ত আমাব মতন বিদ্বান লোক কলকাতা শহরে কিছু কম নেই। ও কথা থাক্, ভাবছি বাপ পিতামহর এই ভাঙ্গা ভিটে থেকে পাট উঠিয়ে চলে যাব, অন্য দেশে, সে-দেশ কি সইবে আমাদের!

জবাবে রত্নময়ী বলেছিলেন, আমি ও-সব কথা আব ভাবি না। আমি মেয়েমানুষ, এক ভিটে ছেড়ে আর-এক ভিটেয় এসে মানিযে গুনিয়ে ঘর ত বাঁধলাম। আমাদের সব সয়ে যায়। তা' ছাড়া ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ করে বিয়ে থা দিয়ে সংসাবে বসিয়ে দিতে পারলে আমরা দু-জনে না হয় আবার এখানেই ফিরে আসব বুড়ো বয়সে। বলতে বলতে রত্নময়ী হাসলেন।

চন্দ্রকান্তও হাসলেন। হ্যাঁ, ততদিন এ ভিটে থাকছে তোমার!

চন্দ্রকান্ত তখনও সম্পূর্ণ সম্মতি দিচ্ছেন না দেখে মোহিত বললেন আর এক সময়, বেশ তো সব কথা না হয় বাদ দিলাম—কিন্তু দাদা, কলকাতায় গেলে যে আপনার পাঁচজন বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে, আরও দশটা বইপত্তর পুঁথি যোগাড় করে পড়তে পারবেন, নিজের চর্চাটাও বাড়বে সেটাও কি আপনি ভেবে দেখছেন না?

চন্দ্রকান্ত এবার চুপ। তাই ত এ-সুযোগের কথাটা তিনি ভাবেন নি কখনো।

রত্নময়ীর তাগিদ চলল সমানে। নিমরাজী চন্দ্রকান্ত অবশেষে স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকটা দিন পরামর্শ করলেন এবং ভেবেচিন্তে রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু কী হল কলকাতায় এসে। রত্নময়ী ভাবেন। চন্দ্রকান্ত অবশ্য এক ভাল স্কুলে হেড-পণ্ডিতের চাকরি পেলেন। তার ওপর আর উঠতে হল না। সত্যি বলতে কি মোহিত ঠাকুরপো যতটা বলছিলেন ততটা হল না কিছুই, চন্দ্রকান্তকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ল না শহবের স্কুল কলেজ কি অন্য কোথাও। এক মোহিত ঠাকুরপোই যা শ্রদ্ধা সম্মান খাতিরের ঘটাটা বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর ছিল বইয়ের ব্যবসা। চন্দ্রকান্তকে এসে ধরলেন পাঠ্য পুস্তক, অর্থপুস্তক, ব্যাকরণ লিখে দিতে। চন্দ্রকান্তর দৃঢ় আপত্তি, না না ও-সব নয়; সময় নেই, সময় পাব কেমন করে

সত্যিই চন্দ্রকান্তের সময় ছিল না। স্কুল থেকে এসে নিজে বই মুখে করে বসতেন। টিউশনির জন্য ছাত্ররা আসত, ছাত্রদের অভিভাবকরা, চন্দ্রকান্ত সম্মত হতেন না।

মোহিত ঠাকুরপো কিন্তু সহজে ছাড়বার লোক নন। চন্দ্রকান্তর সঙ্গে রীতিমত তর্ক করতেন। বলতেন, এতে আপনার ক্ষতিটা কি দাদা! কতকগুলো অশুদ্ধ ভুল বই পড়ে ছাত্রগুলো যা-তা শিখছে আর আপনি সামান্য সময় দিলে ছেলেদের জন্যে কয়েকটা ভাল বই হয় তা আপনি করবেন না। নিজের দিকটা দেখছেন কেন, ছাত্রদের কথাটাও ভাবুন একটু।

রত্নময়ীকেও ধরতেন মোহিত ঠাকুরপো। বই লিখলে বাড়তি কটা টাকা আসবে বৌদি, সংসারের টাকার দরকার কার নয়—আপনারও আমারও।

কলকাতায় আসা অবধি আর কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না রত্নময়ী। মাইনে যেমন কিছু বেশি পাচ্ছিলেন চন্দ্রকান্ত, তেমনি শহরে থাকায় খরচও বেড়েছিল। গ্রামে যে-ভাবে চালিয়ে দেওয়া যেত, কলকাতায় ঠিক সে ভাবে চালানো যায় না।

অভাব বাড়ছিল বলে রত্নময়ীও স্বামীকে তাগাদা দিচ্ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকান্তও পাঠ্যপুস্তক লিখলেন এবং একে একে কয়েকটা অর্থ-পুস্তক। মোহিত ঠাকুরপো টাকা এনে তুলে দিলেন রত্নময়ীর হাতে। চন্দ্রকান্তর হাতে টাকা দিতে সাহস হয়নি মোহিতের।

রত্নময়ীর কাছে সে-টাকা স্বপ্ন। একবার নয়—ক'বারই দফায় দফায় টাকা এল। আর টাকা যখন এল, প্রথমটায় বিমূঢ় হয়ে গেলেও রত্নময়ী পরে দেখলেন সংসারে প্রয়োজন কত। শীতকাল তখন। ছেলেমেয়েদের গরম জামা কাপড় হল, লেপ তৈরি হল। চন্দ্রকান্তকে একটা গরম শাল প্রণামী দিয়ে গেল জোর করে মোহিত।

টাকা আসছিল বলেই যেন প্রয়োজন এবং অভাবগুলো একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কিছু আসবাবপত্র, বাসনকোসন যেমন হঠাৎ ভীষণ দরকারী মনে হল, তেমনি সুধার খালি হাত, খালি গলা যেন বিঁধতে লাগল রত্নময়ীর চোখে।

একে একে মেয়েদের সরু সরু দু'গাছি করে বালা হল হাতের, গলায় অল্প সোনার হার।

সে-সময়টা বেশ সুখে গেছে সন্দেহ নেই। এবং রত্নময়ীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, তাদের ভাগ্যে এতকাল পরে শনি-রাহুর জোড়া দশা কেটে গিয়ে কোনো শুভ গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। এবার সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে।

কিন্তু ভাগ্য কী নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক। রত্নময়ীকে একটু লোভ দেখিয়ে, হঠাৎ খানিকটা উজ্জ্বল রোদ দেখিয়ে সহসা সব কালো হয়ে গেল। চন্দ্রকান্ত সেবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন পুজোর মুখে মুখে। তারপর টাইফয়েডে বাইশদিনের মাথায় স্ত্রী পুত্রকন্যা সকলের ভার এই জনকোলাহলময় কলকাতা শহরের অদৃশ্য অধিষ্ঠাতার হাতে সমর্পণ করে বিদায় নিয়ে গেলেন।

দুঃসহ, নিষ্ঠুর, অপ্রত্যাশিত সেই আঘাত। রত্নময়ীর মনে হয়েছিল তাঁর জীবনটাও অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কেউ যেন চোখ বাঁধা অবস্থায় এক অন্ধকার নিশ্বাসরোধ ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।

কিছু ভাববার নেই, করবার নেই, কাঁদবার নেই, কাউকে ডাকার নেই। সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়, নিরবলম্ব।

সন্তানদের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রমে বুক বাঁধলেন রত্নময়ী। তাঁর স্বামী পণ্ডিতগিরি করলেও উদার, সরলমন পুরুষ ছিলেন। রত্নময়ীকে কতবার উপদেশ দিয়েছেন, দুঃখে ভয় পেয়ো না রত্ন। আমাদের রবি ঠাকুরের সেই গান আছে না, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা···তাই। খাঁটি কথা।

রত্নময়ীও সহ্য করলেন। নিজে শূন্য হয়ে গিয়েও যেন কোথায় আবার আশা রাখলেন। মনে হয় নিজের রিক্ততাকে ঢেকে রেখে সন্তানদের বাঁচাতে চাইলেন—তাদের জীবন যেন শূন্য হয়ে না যায় সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। সান্ত্বনা থাকল, এই সন্তানদের মধ্যে স্বামীকে, স্বামীর টুকরো টুকরো প্রতিবিম্বকে তিনি স্পর্শ করতে পারবেন এ সৌভাগ্য অন্তত তাঁর আজও আছে।

মোহিত ঠাকুরপো সেই বিপদের দিনে প্রথমটায় কিছু সাহায্য করেছেন বলতেই হবে। তারপর দূরে সরে গেছেন। একবার চিঠি লিখে বাড়িতে ডাকিয়ে আনিয়েছিলেন রত্নময়ী। একথা সেকথার পর সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা তুলে লজ্জার মাথা খেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু টাকা চাইলেন রত্নময়ী।

পকেট থেকে মাত্র পঁচিশটা টাকা বের করে রত্নময়ীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মোহিত। বিরসমুখে বলেছিলেন, দাদার বইয়ের বাবদ যা প্রাপ্য আপনাদের আমি সবই আগাম দিয়ে দিয়েছি বৌদি, বরং কিছু বেশিই দিয়েছি। ব্যবসারও অবস্থা খারাপ। আপনি আমার অবস্থাটাও একটু বিবেচনা করবেন।

রত্নময়ীর ইচ্ছে হচ্ছিল দশ আর পাঁচ টাকার নোটগুলো ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দেন মোহিত ঠাকুরপোর সামনে। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছেন রত্নময়ী। সামান্য পঁচিশটা টাকাও তখন সংসারের চারটে লোকের পেট ভরাতে অনেক।

ক্রমশই অচল হয়ে আসছিল সংসার। দিন আর চলছিল না। টাকা টাকা টাকা। বাড়িভাড়া দিতে টাকা; চাল নুন কয়লা কিনতেও টাকা চাই। একটা রাক্ষুসে টাকার ক্ষুধা তখন এ-বাড়ির দেওয়ালে বাতাসে অন্ধকারে সর্বক্ষণ ককিয়ে ককিয়ে কেঁদেছে।

রত্নময়ী আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হল এ-সময় অন্তত দেশের গ্রামে ফিরে যাওয়াই ভাল। কিছু না থাক এখনও মাথা গোঁজার ভাঙা চালাটা ত আছে।

পরে ভেবে দেখলেন—সে আরও অসহ্য হবে। স্বামী ছেলেমেয়ের হাত ধরে একদিন সচ্ছল সংসারের আশায় গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছিলেন বড় মুখ করে। আজ এমনভাবে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে ফিরে যাবেন! পাড়া প্রতিবেশীরা তখনই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত তাঁদের স্বাতন্ত্র্যতার জন্যে; আসার সময় বলেছিল পণ্ডিতের বউ আমাদের বড়লোক হতে যাচ্ছে গো কলকাতায়। ছেলেকে জজ ব্যারিস্টার করবে, মেয়েদের উকিল ডাক্তারদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ভাল ঘর বর করবে।

সেদিন এ-সব বিদ্রূপ তুচ্ছ করে রত্নময়ী মনে মনে হেসেছিলেন। আজ আর হাসতে পারেন না। কথাগুলো তীক্ষ্ণ শরের মতন বুক ভেদ করে যায়, জ্বালা ধরে, টনটন করে, কান্না পায়।

কোন্ মুখ নিয়ে আজ দেশে ফিরে যাবেন। কাদের হাত ধরে। বড় মেয়ে সুধা। আঠারো বছর বয়স হতে চলল—এখনো আইবুড়ো। গ্রামের লোক শহুরে ম্লেচ্ছ বলে নাক সিঁটকোবে, কলঙ্ক রটাবে। চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের বংশের মেয়ে কুল মজিয়ে বিবি হয়েছে—এ-সব কথাই না বলবে তারা।

তারপর বাসু। সুধার চেয়ে তিন বছরের ছোট। পনেরোয় পা দিয়েছে। চেহারা দেখলে আঠারো উনিশ বলে ভুল হতে পারে। সুন্দর চেহারা, আশ্চর্য ভাল স্বাস্থ্য। ফর্সা রঙ—চোখ মুখে মায়ের ধাঁচ পেয়েছে। পুষ্ট গড়ন প্রতিটি অঙ্গের। কিন্তু ওই পর্যন্ত। মাকাল ফল। ওপরেই যা চেকন চাকন—

ভেতরে অসার, অপদার্থ। কিছু হল না ছেলেটার। লেখাপড়ায় মন ধরল না। হাজার চেষ্টাতেও কেউ পারল না। নেহাত চন্দ্রকান্তর ছেলে বলে স্কুলের চৌকাটগুলো ওর জন্মে মূর্তিমান বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। চন্দ্রকান্তর অজ্ঞাতেই দরজা খুলে খুলে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত ওকে আসতে দেওয়া হয়েছিল। এমন সময় চন্দ্রকান্ত মারা গেলেন। দয়াপরবশ হয়ে, ভেবেচিন্তে ওকে ফার্স্ট-ক্লাসেও তুলে দিলেন হেড মাস্টারমশাই। যদি একটা বছর পড়াশোনা করে ম্যাট্রিকটা ডিঙোতে পারে। ফ্রি-শিপ পর্যন্ত দিলেন স্বর্গত চন্দ্রকান্তর কথা, এবং তাঁর সংসারের কথা ভেবে। কিন্তু ছেলে কী তেমন। একে বুদ্ধিহীন তায় সঙ্গদোষে বোম্বেটে হয়ে উঠেছে। স্কুলের কোন্ মাস্টার কি বলেছিল, ছুটির পর পিছন থেকে ইঁট মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আর তারপর স্কুলের পাট চুকিয়েছে বরাবরের মতন।

রত্নময়ীর সবচেয়ে বড় দুঃখ এখানে। একটি মাত্র ছেলে, কত আশা ছিল, কত সাধ-বাসনা গড়ে উঠেছিল বাসুকে কেন্দ্র করে—সব ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল। চন্দ্রকান্তর ছেলে শেষে মূর্খ, বদমাশ, গুণ্ডা হবে একটা, কে ভাবতে পেরেছিল! রত্নময়ীও ভাবেননি। স্বামী মারা যাওয়ায় যত বিহ্বল হয়েছিলেন রত্নময়ী, যত আঘাত পেয়েছিলেন, বাসু তার সমানই হতাশ করল, তত বড় আঘাতই দিল। অথচ এদের মুখ চেয়েই না সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলেন রত্নময়ী।

হ্যাঁ, এই ছেলেকে কোন মুখে সঙ্গে করে গ্রামে ফিরবেন তিনি।

সুধার কাছে কথাটা একবার পেড়েছিলেন—শুনে সুধা শিউরে উঠল। না-বললেই বা কি, সুধা তবু বুঝতে পারে অনুমান করতে পারে সবকথা। গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলে তার কপালে কি কম ধিক্কার আর টিটকিরি আছে! সুধা তা সহ্য করতে পারবে না, মার বুকে আরও শেল হয়ে বাজবে নিজের ব্যর্থতা অক্ষমতার কথা।

সুধা বললে, না মা। এ তবু গা লুকিয়ে মিশে আছি এতো বড় শহরে,

সেখানে গেলে লোকে কাদা ছিটোবে নোংরা ছিটোবে। সহ্য করতে পারবনা আমরা।

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি করে এখানে আর চলবে সুধা?' রত্নময়ী হতাশ গলায় বলেন।

'ওখানে গেলেও সেই একই সমস্যা দাঁড়াবে, মা। আমাদের তো আর গোলাভরা ধান নেই দেশে।'

রত্নময়ী চুপ।

মাকে চুপ দেখে এবার সুধা আস্তে আস্তে মার কাছটিতে ঘেঁষে এসে গা-ছুঁইয়ে বসল। হাত দিয়ে মার কণ্ঠায় মমতা ভরে হাত বুলোতে লাগল। তারপর বললে ধীরে ধীরে, 'আমি অনেক ভেবেছি, মা। তোমায় বলিনি, তুমি হয়তো রাজী হতে চাইবে না। কিন্তু উপায় যখন নেই, তখন আমায় একটা চাকরি করতে হবে।'

'চাকরি? তুই?' রত্নময়ী চমকে উঠে মেয়ের মুখের দিকে তাকান। এবং দেখেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মেয়ের মুখে একটা গোপনতার আভাস।

'বলতে না বলতেই তুমি যেন সাপের ছোবল দেখার মতন চমকে উঠলে।' সুধা ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু রাগ, খানিকটা বা অভিমান ফুটিয়ে তুললে মুখে। দরকার পড়লে সব কিছু করতে হয় মা, মানুষকে। আমি পাড়ার শ্রীকণ্ঠ দাসের বাড়ির নিচের তলায় মেয়েদের স্কুলে একটা মাস্টারীর চেষ্টা করছি। সেদিন গিয়েছিলাম কুমুদবাবুর কাছে। তিনি বলেছেন ছুটির পর স্কুল খুললেই করে দেবেন চাকরিটা।

রত্নময়ী স্তম্ভিত। তাঁকে ঘুণাক্ষরেও কিছু না জানিয়ে আড়ালে আড়ালে তলায় তলায় এত করেছে সুধা। করছে এখনও। এ যে তাঁর কল্পনাতীত।

মুখ কালো হয়ে গেল রত্নময়ীর, কঠিন একটা ভঙ্গি ফুটল। গম্ভীর। থমথম করতে লাগল আবহাওয়াটা।

সুধা ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু ভয়ের চেয়েও তার অভিমান বুঝি বেশি হচ্ছিল।

খানিকটা চুপচাপ থেকে বললে শুকনো গলায়, 'এ চাকরি তুমি করতে দিতে চাও না?'

'না।' রত্নময়ীর সংক্ষিপ্ত কঠিন জবাব।

'কেন?' সুধা প্রশ্ন করলে সোজাসুজি চোখ তুলে।

'কেন।' রত্নময়ী সুধার কথায় অবাক হচ্ছিলেন। কেন, এ কথা সুধা জিজ্ঞেস করতে পারছে। ও বোঝে না। কচি খুকি! আর এর জবাব রত্নময়ীকে মুখ ফুটে বলতে হবে।

'কেন বল?' সুধাও যেন তর্ক তুলতে চায আজ। তার গলায়ও অসীম বিরক্তি।

'এ-বংশেব মেয়ে হয়ে তুমি চাকরি করতে যাবে আর সেই রোজগারের পয়সায় অন্ন মুখে তুলব আমরা!'

'মা।' সুধা হঠাৎ তীক্ষ্ণ তীব্র ভাবে চিৎকার করে উঠল।

রত্নময়ী তাকিয়ে দেখেন সুধার দুই চোখ চকচক করছে। দেখতে দেখতে ছলছলে হয়ে উঠল।

রত্নময়ী চুপ। সুধা বললে ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে, 'খেতে না পেয়ে মরবে, হাত পাতবে এব তার কাছে, বাড়ি-ভাড়া দিতে না পারার জন্যে অপমান সইবে—তাও ভাল তবু মিথ্যে মর্যাদার জন্যে মেয়েকে চাকরি করতে দিতে পারবে না।' একটু চুপ। কান্না উপচানো গলায় সুধা বললে আবার, 'ও-সব ঘর-বংশের কথা আমাদের মুখে আর সাজে না মা।'

মা মেয়েতে তারপর পুরো দুদিন কথা এক রকম বন্ধই ছিল। রত্নময়ী শুধু ভেবেছেন। কত রকম ভাবনা। সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল নিজেদের অক্ষমতার কথা। আঠারো বছর বয়স ছাড়িয়ে যেতে চলল সুধার। বড় মেয়ে এবং তেমন ভাবে ধরতে গেলে একমাত্র মেয়েই বলা যায়, সেই মেয়ের কপালে এই বয়সে কোথায় ঘর-বর সুখ আহ্লাদ জুটবে তা না মেয়েটা কিছুই পেল না, জুটল না ভাগ্যে। যে-গাছে যে-সময়টিতে ফুল ফোটার

ওঠার আবেগ চাপতে ঠোঁট কামড়ে ধরেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে পা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। অন্ধকার—অন্ধকার। দুটি জোড়া-নিশ্বাসের ছন্দ, দুটি বুকের হৃদপিণ্ডের নিস্তেজ ধুকধুক আর ঘড়ির খুব মৃদু টিক্‌টিক। যেন সমুদ্রের তলা দিয়ে অতল অন্ধকারে জল বয়ে যাচ্ছে। অনুভূতিহীন সময়-স্রোত। সময়।

পাঁচ

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। মাইনে পেয়ে বাড়ি ভাড়া আর চাল ডাল তেল কয়লার দেনা মিটোতে সুধার মাইনের টাকা ফুরিয়ে গেল। পুজোর মাস বলে পাওনাদাররা সকলেই চাপ দিলে। দোষ দেওয়া যায়না তাদের। টাকা ত জমছিলই মাসে মাসে। ছিঁটে ফোঁটা দিয়ে কুলানো যাচ্ছিল না। একটু যেন রাগ করেই সুধা হাত খালি করে মাইনের টাকাটা সবই প্রায় তাদের হাতে তুলে দিলে। অবশ্য টাকাটা দেওয়া থোওয়া করলেন রত্নময়ীই, সুধা শুধু মুখে বলেছিল।

'সবই ত দিয়ে দিলাম, এবার চলবে কি করে সারা মাস?' মেয়ের দিকে চোখ তুলে শুধোলেন রত্নময়ী।

'টিউশনির টাকা ত আছে।' নিজে ছেঁড়া ব্লাউজ সেলাই করতে করতে বললে সুধা।

'সে আর ক'টা টাকা, পনেরোটা। তোরও যে শাড়ি চাই একটা এ-মাসে।'

'না। যা আছে চালিয়ে নেব।'

'চালিয়ে নিবিটা কোথ থেকে। সেই যা কিনেছিলাম ওঁর অসুখের আগে। তাই দিয়ে এতকাল চালালি, আমার যা ছিল দিলাম। এখন আবার আরতিও ভাগাভাগি করে পরছে। কুলোবে কেন? সবই ত ছিঁড়ল।'

সুধা দাঁত দিয়ে সুতো কেটে সেলাইটা পরখ করতে লাগল। মার কথার জবাব দিলে না।

একটু থেমে রত্নময়ী বললেন আবার, 'তবে দুএকটা ভাল তোলা শাড়ি আর যা আছে আমার তাই পর।'

'কোন্‌টা, তোমার বিয়ের সেই ফুল তোলা টকটকে লাল বেনারসীটা, না দাদুর আশীর্বাদের লাল পাড় গরদটা।' সুধা হেসে উঠল।

রত্নময়ীও হেসে ফেললেন। মুখে অন্য রকম একটু রঙ লাগল। 'পরলেই বা!' ছোট্ট করে বললেন রত্নময়ী মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে।

'রামো, ওই শাড়ি পরে রাস্তায় বেরুলে আর রক্ষে থাকবে না। আর অফিসে ঢুকলে ত সেকশানের ছেলেগুলো মুখ টিপে হাসবে সব। আচ্ছা মা, বিয়ের ছ'চারখানা শাড়ি তুমি অমন ভাবে আগলে রেখে দিয়েছ কেন?'

'ওমা, রাখব না, তো করব কী?'

'পরে পরে ছিঁড়ে ফেললেই পারতে।'

'ও-সব শাড়ি পরার সময়টা পেলুম কোথায় রে? তা ছাড়া ও কি মানায় আমার! ছেলে পুলের মা হলুম। পরতাম না বাপু কখনো, লজ্জা করত। তবে গরদটা পুজো অর্চায় পরতুম। তোর দাদু খুব খুশী হতেন।

সুধা একটু চুপ থেকে হাসি হাসি চোখে মাকে দেখে নিয়ে বললে, 'তোমার ক'টা ভাল শাড়িই ত আমি পরে পরে শেষ করেছি। আরতিকেও দিয়েছ একটা। ওই বেনারসী আর গরদটা অফিসে পরে যাবার নয়, মা। বাড়িতেও পরার না। ও গুলো আরতির বিয়েতে দিয়ো।' বলে সুধা আড়চোখে একবার দেখল আরতিকে। আরতি ক'হাত দূরে রত্নময়ীর জন্যে পান সাজছিল।

কথাটা কানে যেতে মুখ তুলল আরতি। চোখাচুখি হলো দিদির সঙ্গে। ফিক্ করে হেসে ফেললে।

'হাসলি যে'! সুধা ভুরু কুঁচকে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে প্রশ্ন করলে। 'মেয়ের বুঝি পুরনো জিনিস পছন্দ নয়।'

'তোমার ত আগে।' জবাব দিল আরতি। বিয়ে শব্দটা কথা থেকে বাদ দিলে। খুব সম্ভব ভয়ে। হাসি ঠাট্টার কথায় দিদির সঙ্গে আসন পেতে হলে এমনি কথাগুলো বুদ্ধিমানের মতন বাদ দিয়ে নেয় আরতি।

ছোটবোনের জবাবে সুধা এবার যেন জব্দ হয়ে হাসল। বললে, 'ওরে পোড়ারমুখি, পুরনোগুলো আমার ঘাড়ে চাপাবার ফন্দি! তা হবে না। তোর

আগেই বিয়ে দিয়ে দেব, ভোম্বলদাস একটা লোকের সঙ্গে। আমার বিয়েতে তার ট্যাঁক খসিয়ে ভাল জামা কাপড় কিনে দিবি।'

পানের ডাবরটা সরিয়ে ছোট্ট মতন একখিলি পান আর দোক্তার কৌটোটা এনে রত্নময়ীর হাতে দিল আরতি। দিয়ে পাশে বসে পড়ল।

পান মুখে দিয়ে রত্নময়ী বললেন, 'আবার বসলি কেন, নিচে গিয়ে দেখ পারুলদের উনুন ধরল কিনা—না হলে আমাদের উনুনে আঁচ দিয়ে দে। পাঁচটা বাজল প্রায়।'

উঠি উঠি করেও আরতি রত্নময়ীর বুক খুঁটলো, মাথার চুল চিরে চিরে ইলি বিলি কাটল। এই এক আশ্চর্য স্বভাব আরতির। নেহাত সামনে সুধা বসে আছে। নয়ত আরও যা যা করত তাতে রত্নময়ীর বুক জ্বালা করত। মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইস্ বড্ড জ্বালাতন করিস বাপু তুই। এত বড় মেয়ে কী নোংরা স্বভাব তোর।'

আরতি উঠে গেলে রত্নময়ী বললেন, সামনে পুজো। আর সাতটা কি আটটা দিন। শাড়ি জামা যে না কিনলেই নয় সুধা। অন্তত ছোটটার একটা, বাসুরও ধুতি অন্তত একখানা। গেল বার পুজোতেও কিছু কিনতে পারি নি।'

সেলাই করা ব্লাউজটা গায়ে দিতে দিতে সুধা একটা শব্দ করলে।

'আমি একটা কথা ভাবছিলাম।' বললেন রত্নময়ী।

'কি?'

'সোনাদানা আমার যে-টুকুন ছিল সবই গেছে। তোর বাবার দেওয়া আংটিটাই যা আছে এখনো। সেটা মথুর স্যাকরাকে ধরে দি। যা বিশ পঁচিশ টাকা—'

'না।' কথা শেষ করতে না দিয়েই সুধা দৃঢ় কণ্ঠে আপত্তি জানাল। মার মুখের দিকে না তাকিয়েই।

'না কেন, সব গেছে ওইটুকু রেখে লাভ কি বল।'

'তা হোক্। তেমন যদি হয়, আমার এই গলার হার হাতের বালা বিক্রী করে দাও।'

রত্নময়ী নির্বাক। অনেক কষ্টে মেয়েদের ওই একটি করে গলার সরু হার আর দু'হাতের দু'গাছি করে অল্প সোনার বালা, রুলিই বলা যায়—বাঁচিয়ে রেখেছেন এখনও সংসারের মুখের হাঁ থেকে। কলকাতায় এসে চন্দ্রকান্তর বই লেখার দরুণ পাওনা টাকায় গড়িয়ে দিয়েছিলেন দুই মেয়েকে। আরতিব-গুলো বাক্সতেই তোলা থাকে। যা দস্যি মেয়ে, কখন কোথায় হারিয়ে ফেলবে কি ভাঙবে ; সোনা ক্ষইবে—এই ভয়ে। বাইরে বেরুতে হয় বলে সুধার হাতে গলায় ওগুলো আছে। সুধা অবশ্য হাতের দুটো পরতে চাইত না। রত্নময়ী জেদ ধরেন বলেই পরে।

মেয়ের গায়ের ওইটুকু সোনা বিক্রী করার কথা ভাবতেই পারেন না রত্নময়ী। অগত্যা চুপ করে থাকতে হয়।

মাকে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে সুধা বলে, 'চাইলে অবশ্য এই পুজোর মাসে আমাদের অফিস থেকে আধ মাসেব মাইনে আগাম পাওয়া যায়। কিন্তু সামনের মাসে তা কেটে নেবে। যদি বলো তুমি তাই নি। তবে কিনা সামনের মাসে আর কুল পাবে না।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন রত্নময়ী। 'বুঝি তো সবই মা, কিন্তু ওরা ছেলে মানুষ, অতশত কী খুঁটিয়ে বোঝে, মুখ ফুটে বলবে না কেউই, তবু চোখ ছলছল করবে বৈকি !'

'বেশ। কাল রোববার—পরশু অফিস থেকে আধ মাসের মাইনে আগাম এনে দেব।' সুধা শান্ত সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বললে।

'বলছিলাম কি, আংটিটা রেখে এমন আর কি লাভ সুধা। তাঁর দেওয়া জিনিস তাঁর ছেলেপুলের জন্যেই যাবে।'

'ক'টা টাকা ওই আংটিতে পাবে মা—অযথা। যা শুনছি সব। বাজারে নাকি কাপড়ই নেই। সাধারণ কাপড় চোপড় যা, ব্যবসাদারেরা সময় বুঝে

সে-সব লুকিয়ে ফেলেছে। এখন চুরি চামারি করে গলাকাটা দামে বিক্রী করছে। কাগজে এই নিয়ে কত লেখালেখি।

'কেন ?'

'কেন আবার কি! যুদ্ধের বাজার। সময় বুঝে কোপ মারছে। ব্যবসাদারদের ত এখন পোষ মাস। সর্বনাশ তোমার আমার।'

রত্নময়ীর কাছে সমস্ত জিনিসটাই রহস্যপূর্ণ। অবাক চোখে তাকিয়ে বলেন, 'শুনি বটে যুদ্ধ যুদ্ধ। জিনিস পত্রের দামও দিন দিন মাগগি হচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধটা কোথায় হচ্ছে বুঝি না বাপু। এখানে দেখি বাতি নিভনো অমাবস্যা। কবে থামবে রে যুদ্ধ।'

'কে জানে! সহজে নয়।'

'তবে যে বাস্থ বলেছিল পুজোর সময় বেলাকআউট থাকবে না।'

'থাকবে। তবে ওই পুজোর দালানে, রাস্তা ঘাটের মোড়ে বাতির ঠুলি-গুলো কিছু খুলে নেবে বোধ হয়।'

'কী দিনকালই পড়ল!' খানিকটা চুপ করে থেকে নিশ্বাস ফেলে রত্নময়ী উঠলেন। উঠোন থেকে আরতি ডাকছে।

রত্নময়ী চলে যাচ্ছিলেন, সুধা হঠাৎ বললে, 'তোমার ছেলে শেষপর্যন্ত সেই বাপমা তাড়ানো অসভ্য ছোটলোক কতকগুলো ছোঁড়ার সঙ্গে মিলে রাস্তায় রাস্তায় চৌকিদারি করে বেড়াচ্ছে। কথা শুনল না।'

পিছু ফিরে দাঁড়ালেন রত্নময়ী। 'শুনল আর কই! তুই অত করে বারণ করলি, আমিও মানা করলুম। কিন্তু ও ছেলে যা গোঁ ধরেছে তাই কি না করে ছাড়বে।'

সুধা ঘরের টুকিটাকি ঝেড়ে মুছে রাখতে রাখতে বললে, 'কাজটা কিন্তু ভালো করল না, মা। লোকের মুখে শুনি তেমন তেমন অবস্থা হলে ওদের দিয়ে যা-খুশি তাই করিয়ে নেবে।'

রত্নময়ীর মুখে শংকার ছাপ পড়ল। 'বলিস কি, যুদ্ধেটুদ্ধে নিয়ে যাবে না তো!'

'কি করে বলব ওদের মনে কি আছে। তবে এখন রাস্তায় কনেস্টবলের কাজ করাচ্ছে, দরকার পড়লে মেথর মুদ্দোফরাশের কাজ করাবে ঠিক।'

রত্নময়ী বিচলিত বোধ করছিলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ স্বরে বললেন, 'ও ছেলে নিয়ে আমি জ্বলে পুড়ে মরলুম সুধা, কি যে করব ভেবে পাই না।'

সুধা মার বিছানাটা ঝাড়ছিল। ময়লা চাদর। বালিশের ওয়াড় ছিঁড়ে গেছে। কি-একটা কথা মনে পড়ল তার। বললে, তুমি যে বলছিলে ওকে নিয়ে একদিন মোহিতকাকাদের বাড়িতে যাবে।'

একটু দেরি করে কথার জবাব দিলেন রত্নময়ী। বলেছিলুম ত কিন্তু ভাবছি— যেতে পা উঠছে না।'

মাকে একটু লক্ষ্য করে সুধা বললে, 'তুমি হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে যাচ্ছ না।'

'তা যাচ্ছি না। তবে মোহিত ঠাকুরপো এখন বড়লোক মানুষ। প্রথম প্রথম যত ভাল ব্যবহারই করে থাকুন না তিনি, তোর বাবা স্বর্গে যাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি কাটিয়েছেন।'

'স্বার্থ ফুরিয়েছে তাই।' সুধা মন্তব্য করলে।

'হ্যাঁ। তাই সেধে অপমান বয়ে আনতে ইচ্ছে করে না।' রত্নময়ী ধরা গলায় বললেন।

'তবু একবার তোমার যাওয়া উচিত।' সুধা গলায় জোর দিয়ে জবাব দিলে, 'আমি দেখেছি, আমি জানি—বাবার লেখা বইপত্র এখনও পড়ানো হচ্ছে স্কুলে। মোহিতকাকা যাই বলুন—একটা হিসেব নিকেশ দরকার বই কি। আমরা শুধু শুধু ঠকতে যাব কেন!' একটু থামল সুধা। বললে আবার, 'তা ছাড়া মোহিতকাকা হয়ত সত্যিই জানেন না এমন দুরাবস্থায় আমরা রয়েছি।

'না জানার কি আছে।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন রত্নময়ী।

'তা আমি অবশ্য ঠিক জানি না। যাক্‌গে ও-সব কথা। ঝগড়া-ঝাঁটি করতে তো তুমি যাচ্ছ না। জানাশোনা লোক, আত্মীয়ের মতনই ছিলেন এককালে। আমাদের এই অবস্থা। বাবাও এক সময় মোহিতকাকার জন্যে কম করেন নি। সে-সব কথা মনে করে যদি বাসুর জন্যে কিছু একটা করে দিতে পারেন। এটা ভিক্ষে নয়, সামান্য একটু সাহায্য। এমন সাহায্য কত মানুষই ত করে।'

যদিও সুধার কথা শুনছিলেন তবু কখন যেন রত্নময়ীর দৃষ্টি দেওয়ালে টাঙানো স্বামীর ছবির দিকে আটকে গিয়েছিল।

মার দিকে তাকিয়ে সুধা আবার বললে, 'মান অভিমান করার দিন আর আমাদের নেই মা; আমি বলি কি, তুমি একবার বাসুকে নিয়ে যাও।'

'দেখি—!' স্বামীর ছবি থেকে চোখ সরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রত্নময়ী। আস্তে পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ছয়

সুধার চোখে যতই বিশ্রী লাগুক না কেন, বাসু তার সিভিক গার্ডের সাজপোশাক আর টহলদারী ডিউটি নিয়ে বেশ মেতে উঠেছিল। সাজ পোশাক বলতে খাকি হাফ শার্ট, হাফ প্যাণ্ট, শার্টের একদিকার হাতায় লাল পট্টি, কোমরে বেল্ট, হাতে বেঁটে মতন এক খানা লাঠি, জুতো মোজা। এক জুতো বাদ দিয়ে সবই পাওয়া। এ-সব সরকারী বদান্যতা যে সামান্য কথা নয়—এ-কথাটা আর কাউকে বোঝাতে না পেয়ে আরতিকেই বুঝিয়েছিল বাসু। ব্র্যাবোর্নকোর্ট, লালবাজার আর প্যারেডের গল্প ব'লে বলে চোখে বিস্ময় আর ভীত-শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলেছিল আরতির। খুব শীঘ্রি যে একটা চামড়ার খাপ-আঁটা-বেল্টে রিভলবার ঝুলিয়ে বেড়াবে বাসু, আরতিকে এই নিগূঢ় কথাটাও শুনিয়ে রেখেছিল এবং শাসিয়েও দিয়েছিল। শুনে দাদার সম্পর্কে আরতির ধারণাটা সম্ভবত কিছুটা বদলে থাকলেও থাকতে পারে।

যে যাই বলুক, কথাটা এক রকম সত্যিই যে বাসুর চেহারায় পোশাকগুলো মন্দ মান্যাত না। আর এই সব খাকি কোর্তা-টোর্তা গায়ে চড়ালে বাসুর সুপুষ্ট পেশী চিকন চেহারার মধ্যে একটা আলাদা ছাপ ফুটত। বাসু তা জানত। জানত বলেই যত্ন নিত। নিজের হাতে রোজ জুতো চকচকে করে তুলত কালি আর ব্রাশ ঘষে ঘষে, বেল্টটা ঝকমকিয়ে তুলত, প্যাণ্ট শার্টের ইস্তিরি যাতে না ভাঙে তার জন্যে সতর্ক থাকত। তিন দিন অন্তর প্যাণ্ট, শার্ট লণ্ড্রীতে দিত। মাড়-কড়কড়ে ইস্তিরি করিয়ে নিত। আর বলা বাহুল্য এর জন্যে নগদ পয়সা দিত না, খাতায় লিখিয়ে রাখত পরে দেবে বলে।

বিকেল হতেই বাসু বেরিয়ে পড়ত ধবাচুড়ো পরে। তখন তার মেজাজ আলাদা। অন্য একরকম কৌলিন্যগর্ব। যেন ওর এক রাজকীয় স্বাতন্ত্র্য এবং ক্ষমতা আছে যার দাপট পাঁচ জনকে দেখাবার মতন। গলি দিয়ে যেতে

যেতে তখন যে-ভাবে পা ফেলত আর ঘাড় চোখ মুখ ঘোরাত তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যেত এক ধরনের গর্ববোধে ওর বুক ফুলছে, পা ফেলার ভঙ্গি বদলেছে।

নিজেকে দেখাবার প্রয়োজন না হলে বা বিশেষ কোনো দরকার না থাকলে গলিতে দাঁড়িয়ে তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গলা ধরাধরি করে হাসি তামাশা করত না বাসু কখনই। করলেও দুচার মিনিট তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা হয়, যেটুকু হয়।

সেই যে পাড়া ছেড়ে বেরুত বাসু, তারপর আর তার টিকি খুঁজে পাওয়া যেত না। কখনো সখনো অবশ্য বহুবাজার স্ট্রীটে কিংবা ওয়েলিংটনেব মোড়ের কাছাকাছি দেখা পাওয়া গেলেও তখন তার চাল চলন অন্য রকমের। হয়ত পাশাপাশি দুই বাইকে চলেছে ওরা—বাসু আর পল্টুদা। পল্টুদার পোশাকের বাহার আরও একটু উঁচুকুলের। তার ফুল ট্রাউজাব, ক্রস্ বেল্ট, মাথায় সার্জেণ্টদের মতন কপাল ঢাকা টুপি কখনো কখনো।

জিজ্ঞেস করলে বাসু বলত, রাউণ্ড দিতে বেরিয়েছিল। ওর আবার যত সাজ্যাতিক জায়গায় ডিউটি পড়ে কিনা। কোথায় চীনে পাড়ায়, টেরিটি বাজারের কাছে কোন চীনের দল ছোরাছুরি চালিয়েছে সেখানে টহল দিচ্ছিল বাসু, কোন্ বেটা কোকেন পাচার করছিল তাকে ধরেছে—এমনি সব কথা।

বাসুর দুঃসাহসিকতার রোমহর্ষক কাহিনীগুলো সকালে পাড়ার মল্লিকদের রকে বসে বন্ধুবান্ধবরা শুনত, কিংবা নীলকণ্ঠ কেবিনের বেঞ্চিতে বসে চা খেতে খেতে। এবং তারিফ করত। সিভিক গার্ডে ঢোকার পর থেকে নীলকণ্ঠের চায়ের দোকানেও বাসুর নামে খাতা খোলা হয়ে গেছে। সরযূব পানবিড়ির দোকানেও।

বন্ধুদের মধ্যে এক গৌরাঙ্গই বাসুর দুঃসাহসিকতার তারিফ যত না করত তার পাঁচগুণ সতর্ক করত তাকে। গৌরাঙ্গ স্বভাবতই একটু ভীতু গোছের ছেলে, চেহারাটাও রোগাটে। আর বিদ্যে বুদ্ধিতে বাসুদের চেয়ে এক ধাপ

ওপরে। কারণ গৌরাঙ্গ ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়েছিল গত বছরে। যদিও পাশ করতে পারেনি।

গৌরাঙ্গ বললে একদিন, 'অতো বাহাদুরি করতে যাসনে বাসু, কোনদিন ছুরি চালিয়ে দেবে, খতম হয়ে যাবি।'

আড্ডা হচ্ছিল নন্তুদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে বসে তাস খেলতে খেলতে। নীলকণ্ঠের দোকান থেকে চা এসেছিল আর ছোট ছোট তেল চিটচিটে কাপ। অন্দরের দরজা ছিল বন্ধ।

'আরে লে, আমায় খতম করনেবালা এখনও মার পেটে।' বাসু অনায়াস তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে।

চীনেগুলো কিন্তু বিচ্ছু শয়তান।' নন্তু তাস গোছাতে গোছাতে বলল। 'মনে আছে, আমাদের সেই কান্তাপ্রসাদকে কেমন চালিয়েছিল ছুরি—একেবারে এ ফোঁড় ও ফোঁড়। লাশ পর্যন্ত গায়েব করে দিয়েছিল।'

'আরে তার পেছনে ব্যাপার ছিল অন্য।' বললে বাসু—চার-হাত-ঘোরা সিগারেটে টান দিয়ে।

'নট্ ট্রু!' পানকালো দাঁত বের ক'রে পঞ্চানন জলজল চোখে হাসল, 'চীনে ছুঁড়ি নিয়ে ভাগবার কথা বলবি ত?'

'নট্ ট্রু কেন, একদম ট্রু।, বাসু জোর গলায় বললে, 'পল্টুদা আমায় সেদিনও বলেছে।'

'আরে রাখ রাখ তোর পল্টুদা।' পঞ্চানন বললে, 'ও হারামিই ত বেচারাকে ফাঁসিয়ে দিল। নিজে শালা বাগাবার তাল করেছিল, টাকা ঢেলেছিল, কান্তাকে পাঠিয়েছিল চীনে পাড়ার গলি থেকে নিয়ে আসতে ছুঁড়িটাকে লুকিয়ে—বেচারী আনতে গিয়ে সাবাড় হয়ে গেল।'

'পঞ্চা!' বাসু হাতের তাস ছিটিয়ে রুখে উঠল।

খেলা বন্ধ করে তাকাল সকলেই বাসুর মুখে। চোখ দুটো জলছে বাসুর। আর একটা কথা বললেই হয়ত পঞ্চাননের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বাসু।

'রোয়াবি নিচ্ছিস কিসের বে?' পঞ্চাননের গলায় যতটা তেজ ততটা কিন্তু বীরত্ব চোখে মুখে ফুটল না।

'আলবাত নিচ্ছি। বাপের বেটা হোস ত বল্ শালা আর একবার—তোর দাঁত গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে যাব।'

গৌরাঙ্গ প্রমাদ গুনছিল। তাড়াতাড়ি ঝগড়ার মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চাইল, 'এই কি হচ্ছে পরের বাড়িতে বসে। নন্তুর বাড়ির লোকজন নিচের দালানে ঘোরাফেরা করে। আজেবাজে কথা শুনতে পাবে। তখন শালা সবকটাকে দেবে তাড়িয়ে। কি যে ছেলেমানুষী করিস তোরা!'

'দুদিন পন্টুদার পেছনে ঘুরে ঘুরে খুব পেয়ারের হয়েছিস, না?' পঞ্চানন বাসুর দিকে চেয়ে ঘৃণা মেশানো ঠাট্টার সুরে বলে।

'দ্যাট্স নট্ ইওর লুক আউট্।' বাসু ইংরেজীতে জবাব দেয়।

তাস খেলার আড্ডা ভেঙে যায়। বাসু আর গৌরাঙ্গ উঠে পড়ে। পঞ্চানন নন্তুরা বসে থাকে।

বাসুরা চলে যেতে পঞ্চানন বলে, 'শালার রোয়াব একবার দেখলি। পন্টুদা যেন ওর ভগ্নিপোত।'

নন্তু মুচকি হেসে মৃদুগলায় জবাব দেয়, 'পন্টু মালকে ত আমাদের চেনা আছে—। আরে বেফায়দা ও বাসুকে অতো পাত্তা দিচ্ছে নাকি, ও ঠিক গুলতি নিয়ে টিপ কষছে।'

'বাসুর দিদির ওপর।' পঞ্চানন আরও গলা খাটো করে বলল। বলে তাকাল এদিক ওদিক, 'সে দিন দেখি পাড়ায় এসেছে সকালে—বাসুদের বাড়ি গিয়ে সাইকেলের ঘন্টি মেরে ডাকছে বাসুকে। সাদা প্যাণ্ট, কলার তোলা সিল্কের গেঞ্জি, মুখে সিগারেট। তুই ঠিক দেখিস নন্তো, ও হাতাবে, আমি বলে রাখছি।'

নন্তু যদিও মাথা ঘাড় নাড়ল না—তবু যেন কথার সমর্থন জানাল চোখে চোখে। বললে, 'মদ খেয়ে খেয়ে কি রকম মুটিয়েছে দেখেছিস পন্টুদা।'

'হ্যাঁ, খাসি হয়ে গেছে স্রেফ।'

একটু চুপচাপ। নন্তু তাসগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ বললে, 'তুই যাই বল্ না পঞ্চা, বাসুর দিদি কিন্তু মেয়েটা বড় ভাল। আমাদের বাড়িতে পড়াতে আসে তো কৃষ্ণা কাবেরীকে—দেখি রোজই। মা বৌদিও খুব সুখ্যাতি করে। বলে একটুও নাকি বেচাল নয়।

'আরে ধ্যুৎ, মেয়েছেলে রাস্তা-ঘাট হেঁটে চাকরি করতে যাচ্ছে, বেচাল হতে কতক্ষণ?'

আলোচনাটা সে-দিন ওই পর্যন্তই থাকে।

পণ্টু সম্পর্কে বাসুর অনুরাগ ভক্তি শ্রদ্ধা অনেক দিন থেকেই। তবে আগে এতটা ছিল না। দূরে থেকে পণ্টুদার কাজ-কর্মের গুণপনা প্রচার করত বাসু এবং নিজেও মুগ্ধ হত। বাসুর ধারণায় পণ্টুদা আদর্শ মানুষ। যেমন শরীর স্বাস্থ্য, তেমনি বিক্রম। এক হাঁকে তিনটে পাড়া কাঁপিয়ে দেয়, তটস্থ করে রাখে। পণ্টুদা একবার সাইকেল করে গলি দিয়ে ঘুরে গেলে সব ঠাণ্ডা। আর লোকও তেমনি, ঠাণ্ডা আছে ত ঠাণ্ডা আছে, বিগড়লো কি ব্যস্—ঝড় বইয়ে দিল। যার ওপর বিগড়লো তাকে পুনর্জন্ম দেখিয়ে দিল। কারুর তোয়াক্কা করে না তখন। বাজারে একটা পান বিড়িওয়ালাও যা, নন্তুর বাবা কী মল্লিকদের বড়কর্তাও তাই। ঘর থেকে টেনে এনে দরজায় দাঁড় করিয়ে গালাগাল দিয়ে ভূত করে দেবে। কার সাধ্য তখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলে কি বাধা দেয়। থানার লোক পর্যন্ত খাতির করে পণ্টুদাকে।

লোকে অবশ্য বলে বটে গুণ্ডা। তা লোকে বলবেই বা না কেন? তারা সব বাবুক্লাসের লোক। সাত চড়েও কথা বলতে জানে না। যে যার নিজেরটি নিয়ে আছে। পাড়ার লোকের খোঁজ খবরটি পর্যন্ত রাখে না, এক বিয়ের না হয় শ্রাদ্ধর নেমন্তন্ন ছাড়া। পাশের বাড়ির কেউ মরে যাচ্ছে শুনলেও জানলা

খুলে মুখ বাড়ায় না। তখন ডাক পাড়তে হলে পল্টুদাকে। পল্টুদা তার চেলা টেলাদের পাঠিয়ে দেয়। ওমনিতে আবার পরোপকারীও বটে পল্টুদা। ধরে পড়তে পারলে নানা রকমে সাহায্য করে। সেটাই আশ্চর্য! নিজের বলতে কিছুই নেই। তবু টাকা-পত্র কোথা থেকে যে যোগাড় করে কি ভাবে —কে জানে। থাকেও আজকাল ব্র্যাবোর্ন কোর্টে ঘর নিয়ে। চাকর আছে; রান্না বান্না করে দেয়। দিব্যি তোফা আরামে আছে, ভাল খেয়ে ভাল পরে। কেউ কেউ বলে পল্টুদা জমিদাবেব ছেলে, সৎমাব জন্যে ঘর ছাড়া হয়ে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায় পড়াশোনা করতে, তারপব আর মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি। কেউ বলে, আসলে ও-একটা পুলিসেব লোক, পুলিস থেকে টাকা পায়। অন্যদলের ধারণা, স্রেফ গুণ্ডামি বাহাজানি করে রাজার হালে দিন কাটায় রাস্কেলটা।

বাসুর অবশ্য ধারণা, পল্টুদা জমিদারের ছেলেই। বাড়ি থেকে টাকা আসে মাসে মাসে। একা ফুর্তিতে আছে।

সে যাই হোক, পল্টুদা সম্পর্কে বাসুর দুর্বলতা যত, আকর্ষণও তত। আদর্শ পুরুষ হিসেবে পল্টুদা তার চোখেব ওপব সর্বক্ষণ ভাসছে। এবং বাসুর মনে মনে ইচ্ছে, সেও ঠিক ওই পল্টুদার মতন হযে উঠবে, অমনি বেপরোয়া, দুর্দান্ত, শক্ত সমর্থ তেজী পুরুষ মানুষ। সাচ্চা জোয়ান যাকে বলে। যত সহজে সাইকেলের প্যাডেল ঘুরোবে ঠিক তত সহজেই সোডার বোতল কি ছুরি চালাবে। তবেই না।

সামান্য একটু খটকা লাগল সেদিন। অবশ্য খটকাও বলা যায় না ঠিক, কেমন একটু দোনামোনা হয়েছিল বাসু গৌরাঙ্গর কথা শুনে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয়েছিল। উঠে মুখ ধুতে নিচে যাচ্ছিল, যাবার সময় বললে আরতিকে, 'আমার শার্ট প্যাণ্টগুলো ঠিক করে রাখতো, লণ্ড্রীতে নিয়ে যাব।'

এ সব আদেশ তামিল করে আরতিই বরাবর। বলা যায় না শার্ট কিংবা

প্যাণ্টের পকেটে দু একটা বিড়ি সিগারেট থাকতে পারে। দেশলাইও হয়ত। মা দিদির হাতে পড়লে রক্ষে থাকবেনা—তিন প্রস্থ গালমন্দ লেকচার। কাজেই এ-সব আরতিই করে—এবং পকেটে যা পায় মা দিদির অজান্তে লুকিয়ে রাখে। যথা সময়ে বাসুকে দিয়ে দেয়।

সেদিন মুখ হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এসে বাসু দেখে ঘরের মধ্যে তিন মাথার ভিড়। আরতি, দিদি, মা। দিদির হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট। আব-হাওয়াটা থমথমে।

নোটটা দেখেই বাসুর বুকের মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠল। টাকাটা তার জামার পকেটেই ছিল। আরতি লণ্ড্রীতে দেবার আগে পকেট হাতড়াতে গিয়ে বের করেছে। আর নিশ্চয় ওর বোকামির জন্যে মা দিদির কাছে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে।

মুখটা একটু শুকিয়ে উঠলেও বাসু জোর করে একটা নিস্পৃহতার ভাব এনে মুখ মুছে চুল আঁচড়াতে লাগল বেরুবার জন্যে।

'এ টাকা তুই পেলি কোথায়?' সুধা রুক্ষ গলায় বললে, শাসনের ভঙ্গিতে।

'কি?' বাসু না তাকিয়েই গম্ভীর মুখে বললে।

'কি, শুনতে পাস নি, না? তোর পকেটে এ-টাকা কিসের?'

এবার মুখ ঘোরাল বাসু। অনেক কষ্টে আসল মনোভাবটা লুকোবার চেষ্টা করছিল, 'টাকাটা আমার নয়।'

'কার তবে, তোর পকেটে এল কি করে?'

পণ্টুদার টাকা। একজনকে দিতে দিয়েছে।'

কথা শেষ হতে না হতেই সুধা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে যেন চিৎকার করে উঠল, 'পণ্টুদা, পণ্টুদা; পণ্টুদার তুই চাকর খানসামা খাজাঞ্চীখানা নাকি? মিথ্যেবাদী, পাজি, বদমাশ কোথাকার। চোর।'

'মিছেমিছি গাল দিয়ো না দিদি।' বাসু মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াল। এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল।

সুধা থ। একটি মুহূর্ত শুধু। তার পর সুধার গলা আশ্চর্য এক ক্ষোভে তিক্ততায় কেঁপে গেল, 'কি, তুই আমাকে চোখ বাঙাস ?'

'তুমিই বা কেন আমাকে চোখ রাঙাবে?' বাসু ঝাঁঝাল গলায় জবাব দিল।

'বেশ করব রাঙাব। বাটপাড়ি, ছেঁচড়ামি করে টাকা আনবে তুমি, তোমায় পুজো করব নাকি!'

'যা জান না, তা বলো না। তা ছাড়া আমি যেখান থেকে খুশি টাকা আনি, তোমার কি!'

সুধা কাঁপছিল রাগে; অপমানে। মুখটা অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। চোখ যেন ঠিকরে পড়বে। নাকের ডগাটা লাল।

বাধা দিলেন রত্নময়ী। তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে ডাকলেন, 'বাসু।'

বাসু মার দিকে তাকাল।

'বাড়িতে মা দিদির সঙ্গে ছোটলোকের মতন ঝগড়া করতে তোমার লজ্জা করে না?'

'কে করতে যায় ঝগড়া। তোমার মেয়ে বড় বলে যা মুখে আসবে তাই বলবে নাকি। আর মুখ বুজে আমায় সহ্য করতে হবে। ওর কোনো রাইট নেই আমায় কিছু বলবার। তা আমি স্পষ্ট বলে দিলুম।'

একপাশে ঝোলান বেঁকা আলনা থেকে পুরনো ছেঁড়া শার্টটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপাল বাসু। লণ্ড্রীতে দেবার খাকী জামা প্যাণ্ট তাল পাকিয়ে বগলে পুরল। পুরতে পুরতে অগ্নিবর্ষী চোখে আরতির ভীত সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নিল একবার।

যদিও মুখ ফুটে নোটটা চাইল না বাসু, তবু দৃষ্টিটা নোটের দিকে রেখে দাঁড়াল। সুধা ছুঁড়ে দিল মাটিতে কাগজখানা। নীরবে সেটা কুড়িয়ে পকেটে পুরল বাসু। ঘর ছেড়ে চলে গেল। মা মেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

পথে নেমে মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল কেমন, যদিও রাগ ছিল তখনও পুরো মাত্রায়। দিদির সবতাতে কর্তামি আর গার্জেনি ফলানো

অনেক সহ্য করেছে বাসু। ভাবে কি দিদি সকলকে! সব সময় খেঁকাবে, তম্বি ফলাবে। দিয়েছে আজ মুখের মতন জবাব। এবার থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে; নিজের মান বাবা নিজের কাছে, সব সময় পেছনে লাগতে গেলে এমনিই হয়।

দিদির বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছুটো কথা শুনোতে পেরেছে—এর জন্যে অবশ্য একটা গর্ব বোধ করছিল বাসু। অর্থাৎ এই স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করতে পারার সাহস যে আজকাল তার হয়েছে এটা বাসুর পৌরুষের যে একটা বড় লক্ষণ তা বেশ অনুভব করতে পারছিল বাসু। এবং খুশী হচ্ছিল।

মনটা খুঁতখুঁত করছিল অবশ্য অন্য কারণে। বাড়িতে মা দিদির কাছে যাই বলুক, যতই মেজাজ দেখাক আসলে টাকাটা দিদি যা বলেছে অনেকটা যেন তাই।

ভাবতে ভাবতে গৌরাঙ্গর বাড়ি গেল বাসু। তাকে ডেকে নিল। বেশ গম্ভীর। চোখ মুখও বিরক্তিভরা। দু একটা হুঁ না ছাড়া কথা বললে না। লণ্ড্রীতে গিয়ে জামা প্যাণ্ট ফেলে দিল। তারপর সটান গৌরাঙ্গকে নিয়ে ঢুকল এসে বউবাজার-মোড়ের বড় চায়ের দোকানে।

টোস্ট, ওমলেট চায়ের অর্ডার দিয়ে বাসু টেবিলে কনুই রেখে গালে হাত দিল। নাক দিয়ে শব্দ করলে একটা ঠোঁট চেপে।

'আজ যে পকেট খুব গরম রে, কি ব্যাপার?' গৌরাঙ্গ হেসে প্রশ্ন করে।

কথার কোন জবাব দেয় না বাসু। হঠাৎ উঠে গিয়ে অন্য টেবিল থেকে কাগজখানা টেনে এনে চোখ বুলোয়।

'হিটলারটা বাঘের বাচ্চা।' অসংলগ্ন ভাবে বলে বাসু, 'লেনিনগ্রেডের মাটি কামড়ে পড়ে আছে।'

'ওই পড়ে থাকাই সার। রুশগুলোও তেমনি—জান দিয়ে লড়ছে।'

'লড়ুক। হিটলারের কাছে উড়ে যাবে।'

'উড়ছে কই।'

বাসু কাগজটা মুড়ে একপাশে ঠেলে দিল। আসলে হিটলার নামটাই সে জেনে রেখেছে। আর কাগজের হেড্‌লাইনে যেহেতু লেনিনগ্রেড লেখা আছে তাই বলতে পারল নামটা—নয়তো লক্ষ্ণৌ আর লেনিনগ্রেড সম্পর্কে ওর ধারণা একই।

গৌরাঙ্গ তবু একটু আধটু জানে। কাগজ টাগজ দেখে। ওর সঙ্গে পারবে না কথা বলতে গেলে। কাজেই খবরের-কাগজ দুমড়ে পাশে সরিয়ে বিরস মুখে বললে বাসু, 'চুলোয় যাক হিটলার। শোন্ একটা কথা বলি।'

ততক্ষণে ওমলেট টোস্ট চা এসেছিল। চামচে করে ওমলেট ছিঁড়তে ছিঁড়তে টোস্টে কামড় বসিয়ে বাসু সব বলল। খানিক আগে বাড়িতে যে কাণ্ডটা ঘটে গেছে মোটামুটি তার আভাস দিল।

শুনে গৌরাঙ্গ শুধোল, 'মোদ্দা কথা টাকাটা তুই পেলি কোথায়?'

কোথায় পেয়েছে টাকাটা তার বিবরণ বিস্তৃত ভাবে দিল বাসু। কাল পল্টুদার সঙ্গে রোজকার মতন রাত্রে টহল দিচ্ছিল। গণেশচন্দ্র এভিন্যুর মোড়ে ঠিক নয়—একটু পিছিয়ে একটা প্রাইভেট-গাড়ি ব্ল্যাক আউটের আবছায় এক রিক্‌শাবালাকে ধাক্কা লাগায়। রাস্তায় তখন লোক ছিল না বলা যায়। পল্টুদা আর বাসু একটু দূরে সাইকেলে। গাড়িটা পালাচ্ছিল। পল্টুদা গিয়ে ধরলে। থানায় ধরে আনার নাম করে তাকে নিয়ে আসছে—পথের মধ্যে একটা রফা হয়ে গেল। পঁচিশ টাকা। পল্টুদা টাকা নিয়ে ছেড়ে দিল। পাঁচটা টাকা দিল বাসুকে। বললে, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলিস আমরা সাইকেলে ছিলাম—লোকটা গাড়িতে ছিল—চান্স পেতেই হাওয়া কেটেছে।

'আর রিক্‌শাবালাটা?' গৌরাঙ্গ উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল।

'জানি না। ওদিকে আর যাই নি আমরা। পল্টুদা মানা করলে। বেটা জোর জখম হয়েছে।' বাসু প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল।

গৌরাঙ্গ চুপ। টোস্টে কামড় দিতে গিয়ে দাঁতটা যেন কনকন করে

উঠল। মুখ চোখ কেমন একটু করুণ করে বললে, 'কাজটা কিন্তু ভাল করিস নি, বাসু।'

'কি টাকা নিয়ে! তা আমি কি করবো। পন্টুদাই তো নিল। রোজই ও বাবা একটা আধটা ফিকির করে নিচ্ছে।' বাসু ধোঁয়া ছাড়ল।

'টাকার কথা বলছি না, লোকটার কথা বলছি। বেচারী মরল কি বাঁচল একবার দেখলি না।' ক্ষুব্ধ শোনাল গৌরাঙ্গর গলা।

'তখন দেখতে গেলে ঝামেলা হতে পারত। গাড়িটাকে আমরাই ধরেছিলাম কি-না। রাস্তার লোক, কনেস্টবল সাত সতেরো প্রশ্ন করত। থানায় জমা দিয়েছি কি না তাই নিয়ে ফ্যাচাং বাঁধাতে পারত।'

গৌরাঙ্গ আর কিছু বললে না। চুপ মুখে জিবের শব্দ করে চা খেতে লাগল।

চা খাওয়া শেষ হলে বাসুর সিগারেটটা নিয়ে ক'টা টান মারল পরপর। হঠাৎ বিজ্ঞের মত বললে, 'দেখ বাসু—চুরিটুরি আমরা দুচার আনা বাড়ি থেকে সবাই করে থাকি—কি করব হাতখরচা তো আছে। তা বলে মাইরি, এটা, এই কাজটা অন্য রকম যেন। একটা লোক মরল কি বাঁচল তার তোয়াক্কা করলি নে, ক'টা টাকা পকেটে পুরে স্রেফ সব চেপে দিলি। এ শালা একটা পাপ কাজ হল।'

বাসু গৌরাঙ্গর দিকে তাকাল। কথাটা তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করলে। এবং ভাবল খানিকক্ষণ। কেমন যেন দোনামোনা লাগছে। তা একরকম অন্যায় হয়ে গেছে বৈকি। লোকটার রিক্‌শায় যদি তেমন জোর ধাক্কা না লাগত তবে অবশ্য কিছু যেত আসত না। টাকা ক'টা নিলেও এই সামান্য মন খুঁতখুঁত থাকত না। থাকে না তাদের। পন্টুদাই বা কেমন লোক। দিব্যি টাকার কথা পাড়লে, টাকা নিল, প্যাণ্টের পকেটে গুঁজল আর ছেড়ে দিল।

কিন্তু কথাগুলো ভাবতে বাসুর ভাল লাগছিল না। উঠে পড়ল চেয়ার

ছেড়ে। গৌরাঙ্গর কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছে এমন ভাবে বললে, 'ঠিক আছে রে, ও সব শালাই চোর। যেমন লালবাজার থেকে সাড়ে পনেরো টাকা মাইনে দেবে মাসকাবারি, টু পাইস চাই তো। সিভিক গার্ড হয়েছে বলে ফেলনা নাকি সব।'

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটছিল দু'বন্ধু। মোড়ের মাথায় দাঁড়াল। ট্রামে বাসে ভিড়। অফিস যাচ্ছে লোকজন। দিদিও এতক্ষণে বেরিয়ে গেছে, ভাবল বাসু। দিদি অবশ্য গলি পথ দিয়ে গিয়ে মিশন রোয়ে পড়ে। হেঁটেই অফিস যায়। চলে গেছে এতক্ষণে।

তবু টাকা ক'টা বাড়িতে নিয়ে যেতে আর সাহস হচ্ছিল না বাসুর। চা-টা খেয়েও গোটা চারেক টাকা থেকে গেছে। কি করা যায়! গৌরাঙ্গর কাছেই থাক। আজ একটা থিয়েটার দেখলে.কেমন হয়। দুর্গাদাসের থিয়েটার।

বুড়ো একটা ভিখিরী এসে হাত পাতল। তার মুখের দিকে একবারটি চাইল বাসু। কালকের রাত্রের সেই রিক্শাবালার কথাটা মনে পড়ল আবার। গৌরাঙ্গর কথাগুলোও।

একটা দুআনি টুপ করে ভিখিরীটার হাতে ফেলে দিল বাসু। যেন কালকের পাঁচটা টাকার প্রায়শ্চিত্ত করলে।

গৌরাঙ্গ আড়চোখে দেখল।

ট্রামবাসের ভিড় কমতে রাস্তা পেরিয়ে এল ওরা। বাসু বললে, টাকা ক'টা গৌরাঙ্গর হাতে গুঁজে দিয়ে, 'তোর কাছে রেখে দে। পারিস তো দুটো থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে আনিস থিয়েটারের। খবর দিস।'

সাত

বাসু সিভিক গার্ডে ঢোকার পর থেকে রত্নময়ীর দুশ্চিন্তা দিন দিন বাড়ছিল। শুধু সুধাই যে কাজটা মনে প্রাণে অপছন্দ করত বলে, তা নয়, নিজেও তিনি ছেলের এই অতি সাধারণ হীন বৃত্তি পছন্দ করতে পারতেন না। আর আশ্চর্য, রত্নময়ী স্বচক্ষে কিছু দেখুন আর না দেখুন, সুধা, আরতি, পারুল, বেলা, এ ও, এদের কারুর মুখেই একটা ভাল কথা শুনতেন না বাসুদের কাজকর্ম সম্বন্ধে। সকলেই কেমন হেয় জ্ঞান করত ওই বৃত্তিটাকে। তা ছাড়া কাজটা যে মোটেই উঁচু জাতের নয়, এর সবার বড় প্রমাণ হয়ে দেখা দিয়েছিল যারা সিভিক গার্ডগিরি করতে ঢুকেছে তারা নিজেরাই। পাড়ার যত বকাটে, আড্ডা-বাজ বাপ-মা-খেদানো ছেলে, গো-মূর্খের দল গিয়ে ঢুকেছিল ওই দলে। সেই থেকে ধারণাটা ওদের সম্বন্ধে খারাপই হয়েছে রত্নময়ীর। তার ওপর সুধা যখন তখন নানান কথা বলত—যা শুনে উদ্বিগ্নতা আরও বেড়ে উঠত।

তবু রত্নময়ী সহ্য করে ছিলেন। সে দিনের ঘটনার পর তাঁর সহ্য, ধৈর্য শিথিল হয়ে গেল। দুশ্চিন্তা রীতিমত আশঙ্কায় পরিণত হল! সুধা স্পষ্টই বললে, দেখলে ত, তোমার ছেলে লায়েক হয়ে গেছে। কেমন চোখ রাঙিয়ে কথা বলে গেল। ক'দিন আগেও এতটা পারত না। এ সব কুসঙ্গের দোষ। আমার কি, নেহাত ভাই তাই বলি। চুরি, জোচ্চরি, বাটপাড়ি, বদমাইশি সব শিখুক, তারপর জেলে যাক, ফাঁসি যাক, জুতো পেটা খাক—তুমি সামলো, আমি দেখতেও যাব না। অত করে বললুম, ওকে নিয়ে একবার মোহিত-কাকার বাড়ি যাও। তা তোমার সম্মানে লাগছে। যাক্‌গে, সংসারের কথায় আর থাকছি না আমি। যার যা খুশি করুক।

মোহিত ঠাকুরপোর কাছে নিজের দৈন্য নিয়ে দাঁড়াতে রত্নময়ীর সম্মানে কতটুকু বাঁধছিল কে জানে, তবে দারুণ একটা অভিমান বাদ সাধছিল। টাকার জন্যে নয়, টাকা মোহিত ঠাকুরপো না দিক্, হয়ত পাওনাই নেই তাদের কিন্তু যার কথায় বিশ্বাস করে, ভরসা রেখে ওরা গ্রামের ভিটে মাটি ছেড়ে

চলে এল, সে কি না আজ প্রায় দেড় বছরেরও ওপর একটি বার খোঁজ খবর পর্যন্ত নেয় না। চন্দ্রকান্তর শ্রাদ্ধর পর মাঝে আর দু'তিনদিন এসেছিল। ব্যস্ তারপর সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে।

বাসুর কথা ভেবে ভেবে শেষাবধি রত্নময়ীকে হার মানতে হল। মান অভিমান, রাগ, আত্মসম্মান—সব খুইয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

পুজো কেটে গেছে। সে দিনটা কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন। পুজোর পর দেখা করতে যাচ্ছেন—মনে মনে এ রকম একটা অছিলাও রয়েছে রত্নময়ীর। এবং পথে যেতে যেতে তিনি ভাবছিলেন, কথাটা শুরু করবেন ঠিক সেই ভাবেই, বিজয়ার পর দেখা করতে এসেছেন যেন।

ক্রীক রোয়ে ঢুকে বেশ নিস্তব্ধ নিঝুম শান্ত এক ডানহাতি গলির মুখেই মোহিত ঠাকুরপোর বাড়ি। বাসু চিনত।

বাড়িটার দরজায় এসে রিক্‌শা থামিয়ে নেমে পড়ল বাসু। রত্নময়ীও নামলেন।

ঢুকতেই একটু গেট মতন। গেটের মাথায় মরচে ধরা বেঁকানো লোহার শিক, তাই জড়িয়ে জড়িয়ে লতা-গাছ উঠেছে। অল্প ক'টি লালচে ফুল। গেটের ভেতর ঢুকেই সদর। মাঝে হাত তিনেক জমি। সদর খোলাই ছিল। বাসু পিছনে রত্নময়ী আগে—সদর দিয়ে অন্দরে চলে গেলেন রত্নময়ী। যেতে যেতে পা-টা একটু কাঁপছিল, বুকটাও শুকিয়ে আসছিল।

অন্দরে পা দিতেই দালান। ডানদিক দিয়ে দোতালার সিঁড়ি উঠে গেছে। বাঁ দিকে বারান্দা-ছোঁওয়া দুটি ঘর। দালানে ঝি-চাকরে জটলা করছে—কাঁসার বড় বড় বাসন-পত্র নামানো। কতকগুলো বালতি। উঠোনের এক কোণে গোটা দুই ঝুড়িতে তরিতরকারি ডাঁই হয়ে রয়েছে।—ঘরের একটি খোলা—ধোঁয়া উঠছে। রান্নাঘরই হবে।

রত্নময়ী একটু দাঁড়ালেন। ঝি চাকরের দু একজন তাকাল এদিকে।

কাছে ডাকার আগেই বুড়ি ঝি মানদা এগিয়ে এল সামনে।

'ওমা, বামুন ঠাকরুণ যে! এক যুগ পরে।' বুড়ি ঝি নিচু হয়ে প্রণাম করলে।

'থাক্ থাক্। ভাল আছ তো তোমরা। কর্তাবাবু কোথায়, বাড়ি আছেন? দিদিমণি?'

'সবাই ওপরে। যান না।'

'আচ্ছা, দেখা করে আসি মা আগে।' রত্নময়ী গায়ের চাদরটা সামনে টেনে সিঁড়ি উঠতে এগিয়ে গেলেন। বাসুও।

দোতলায় উঠে বারান্দায় পা দিতেই দেখা হয়ে গেল মীনাক্ষীর সঙ্গে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছিল। চোখে মুখে জল। মুখে সদ্য ঘুম ভাঙার ছাপ।

রত্নময়ীকে দেখে অল্পক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থাকল মীনাক্ষী, তারপর তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললে, 'জেঠাইমা! এতকাল পরে। কি ভাগ্য আমার।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা নুইয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

চিবুকে হাত ছুঁইয়ে সেই হাত নিজের ওষ্ঠে স্পর্শ করে চুম্বন করলেন রত্নময়ী। বুকের পাশটিতে টেনে নিলেন মীনাক্ষীকে।

এবার মীনাক্ষী দেখছিল বাসুকে। আর বাসু মীনাক্ষীকে। দুজনেই দুজনের কাছে একেবারেই অপরিচিত তা নয়, তবু খুবই স্বল্প পরিচিত।

বাসু বুকের ওপর হাত জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরনে তার পুজোর দরুণ ধুতি কায়দা করে মাল কোঁচা মারা, গায়ে চৌকো ছিটের শার্ট। পায়ে স্লিপার। জামা কাপড় যদিও সদ্য পাট ভাঙা, ধোপ দুরস্ত নয় তবু মোটামুটি ফরশাই। গৌর বর্ণ, পেশী চিকন ধারাল চেহারাটা কিন্তু এই বেশেও চমৎকার মানিয়েছে। উঁচু কপাল, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো উল্টানো চুল, টিকলো নাক, থুতনিটা সরু, মুখের গড়ন ঈষৎ লম্বাটে, জ্বলজ্বলে ধারাল দুটি চোখ।

'বাসু না!' মীনাক্ষী রত্নময়ীর দিকে চোখ ফিরিয়েই আবার বাসুর দিকে একটু হাসি চোখে তাকাল। ঠোঁটে গালে সামান্য একটু কুঞ্চন।

'চিনতে পারছিস না! দিদিকে প্রণাম কর বাসু।'

'না, না, ছি, ছি—প্রণাম কি!' মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি একটু সরে গিয়ে সঙ্কুচিত হবার ভঙ্গি করলে. 'আমি দিদি না ও দাদা বোঝাই মুশকিল জেঠাইমা। ক'বারই বা দেখেছি, আগের বারও যখন দেখেছিলাম অমন বড় সড় জোয়ান হয় নি। বড় সুন্দর চেহারাটি আপনার ছেলের।' মীনাক্ষীর গলা দিয়ে প্রশংসা উপচে পড়ছিল। আর এক ধরনের উষ্ণ, আরক্ত আভা গালে রঙ ফেলছিল।

প্রণাম ব্যাপারে বাসু খুব অভ্যস্ত নয়, পছন্দও করে না তেমন। মার কথার সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে মেয়েটি তাকে বাঁচিয়েছে। আর বাঁচিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, প্রথম দর্শনেই তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাসুর এ-বিষয়ে একটা সচেতনতা আছে। কথাগুলো তাই শুধু কানে ঢুকল না, মধু ঢেলে দিল। মনে মনে খুব খুশী বাসু।

যদিও মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল বাসু তবু এতক্ষণ নিষ্পলক চোখে যাকে দেখেছে তার চেহারাটার কথাই ভাবছিল এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছিল।

রঙ ফর্সা নয় মীনাক্ষীর, বরং একটু ময়লাই। মুখের গড়ন লম্বাটে হলেও চাপা। কপাল ছোট, নাক দীঘ তবে টিকলো নয়, চোখের ভুরু ঘন, টানা টানা। দীর্ঘপক্ষ চোখ। চোখের তারা কালো। দৃষ্টিতে কেমন এক কুহক মাথান। কিসের এক আঁচ, স্পষ্ট বা প্রখর নয় কিন্তু ঝিকমিক করছে।

মীনাক্ষীর পরনের শাড়িটার খোল সাদা। পাড় কালো। খুব চওড়া নয়। একটি রেখার বুনন দেওয়া। গায়ের জামাটাও সাদা। শাড়ি জামা দুই-ই মিহি সুতোর। যুঁই ফুলের মতন ধপ্‌ধপ্‌ করছে। মাড় খসখসে। হাতে দুটি করে চার গাছি চুড়ি। গলায় লকেট দেওয়া সরু হার। কানে

কোন গয়না নেই। মাথার চুল এলো। কাল চুলের রাশ পিঠ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝ কপালে লম্বা সরু সিঁথি। সাদা।

রত্নময়ীকে সঙ্গে নিয়ে মীনাক্ষী বারান্দা দিয়ে ঘরে যাচ্ছিল। বাসু ছিল পিছনে। মীনাক্ষীর অলস মন্থর পা ফেলার সুন্দর একটি ছন্দ ওর চোখে পড়ছিল।

সাজানো গোছানো পরিপাটি ঘর। মীনাক্ষী বললে, 'বসুন জেঠাইমা। খাটেই বসুন আপনি।'

পালঙ্কের একপাশে বসলেন রত্নময়ী। পাশে দাঁড়াল মীনাক্ষী। বাসুকে বললে, 'দাঁড়িয়ে কেন তুমিও বস ভাই, ওই চেয়ারটায় বস।'

মুখোমুখি একটা গদি আঁটা নরম চেয়ারে বসল বাসু।

'ঠাকুরপো কোথায়? ঘরে নাকি?' শুধোলেন রত্নময়ী।

'হ্যাঁ—, দোকান বন্ধ। খেয়েদেয়ে দুপুরে একটু শুয়েছেন। ওঠার সময় হয়ে এল প্রায়।'

'ভাল আছেন উনি?'

'তা একরকম ভালই। আপনি কিন্তু বড রোগা হয়ে গেছেন, জেঠাইমা। সে রঙ আর নেই বাপু।' মীনাক্ষী রত্নময়ীর পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটু হাসল।

'তা বয়স তো হচ্ছে, পাগলি।' রত্নময়ীও মিষ্টি হাসলেন।

'ও কথা বলবেন না জেঠাইমা, বুড়ি হবার বয়স কিন্তু হয়নি আপনার।' মীনাক্ষী অল্প একটু ঢেউ তুলে হাসল, 'সুধার কত হল বয়েস?'

'তা এখন উনিশ।'

'আর আপনার ওই কার্তিকঠাকুর ছেলের?' বাঁকা চোখে বাসুর দিকে চেয়ে একটা কটাক্ষ করলে মীনাক্ষী।

'ষোল।'

'তবে, এতেই বুড়ি হয়ে গেলেন।' মীনাক্ষী রত্নময়ীর পাশটিতে বসে পা ঝুলিয়ে দিল। 'ছেলেবেলায় দেখেছি তো আপনাকে, কত ছোট্টটি ছিলেন। ঠাকুমা বলতেন পুতুল-বউমা।'

রত্নময়ী ওর ডান হাতটি তুলে নিয়ে হাত বুলোচ্ছিলেন আদর করে। বললেন, 'আমাদের যে পুতুল-খেলার বয়সে বিয়ে হত মা। আমারই বিয়ে হয়েছে চৌদ্দ বছরে। ষোল বছরে সুধা হল।' বলতে বলতে বুঝি সুধার কথা মনে পড়ছিল। একটু থেমে বললেন, 'এখন দেখছি যে, সে একরকম ভালই ছিল।'

রত্নময়ীর খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কানের কাছে চাপা নিশ্বাসের সঙ্গে 'ভাল' শব্দটার মৃদুকণ্ঠ পুনরাবৃত্তি শুনে মুখ ফিরিয়ে মীনাক্ষীর দিকে চাইলেন। মুখের ঈষৎ বিষন্ন ভাবটা যত-না চোখে পড়ল, তার চেয়ে ওর নিষ্ঠুর শ্লেষসূক্ষ্ম হাসিটা সহজেই চোখে থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রত্নময়ী অপ্রস্তুত ; লজ্জিত। বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে চেষ্টা করে তাড়তাড়ি মীনাক্ষীকে বুকের কাছটিতে টেনে নিলেন।

'কিছু মনে করিস না মা। মাথার কি ঠিক আছে আর। কি বলতে কি বলে ফেলি।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না মীনাক্ষী, শুধু বললে, 'না জেঠাইমা, মনে করব কেন। ভাগ্যে না সইলে ষোল বছরও যা বাইশ চব্বিশও তাই। আমার ভাগ্যে সয় নি।'

সত্যিই ভাগ্যে সয় নি তার। মেয়েটা কী যে এক খারাপ ভাগ্য নিয়ে জগতে এসেছিল। দশ এগারো বছর বয়সে মা মারা গেল। বছর পনেরো বয়স হতেই তাঁর জানাশোনা এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেন মোহিত ঠাকুরপো। নিজের কাছেই রাখলেন মেয়ে-জামাইকে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মীনাক্ষীর সিঁথির সিঁদুর মুছল। মোহিত ঠাকুরপো বড় দাগা পেয়েছিলেন। চন্দ্রকান্তর কাছে গিয়ে কত কান্নাকাটি, আক্ষেপ করেছেন। বলেছেন, ও-মেয়ের আবার বিয়ে দেব। একটা বছর ঘর করতে পারল না, ছেলে নেই পুলে নেই ; স্বামীর মুখ পর্যন্ত ভাল করে চিনল না।

বিধবা মীনাক্ষীকে কয়েকবারই মাত্র দেখেছেন রত্নময়ী। সাজ সজ্জা

ঠিক বিধবার মতন নয়। পাড় দেওয়া শাড়ি পরে, গায়ে অল্পস্বল্প গয়না রাখে, জুতোও পরে। আচার আচরণ সব যে মানে তা নয়—ওই কোন কোনটা। তা হোক। এই বয়সের বিধবা মেয়ের পক্ষে ওতে কিছু যায় আসে না।

ঘরের আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে এসেছিল। রত্নময়ীও মনে মনে বেদনা বোধ করছিলেন। চুপ করে ছিল মীনাক্ষী।

খানিক পরে মীনাক্ষীই ঘরের গুমোট ভাবটা তরল করবার চেষ্টা করলে, ‘সুধা কেমন আছে জেঠাইমা?’

‘ওই এক রকম।’

‘চেহারা তেমনি ছিপছিপেই আছে?’

‘তা হ্যাঁ, তেমনিই বই কি!’

‘আরতি?’

‘ভালই আছে।’

‘এখন বেশ বড়টি হয়েছে, না?’

‘বয়স হচ্ছে, বড় হবে না।’

‘ওর কত হল?’

‘তেরো পেরিয়েছে।’

একটু চুপচাপ। মীনাক্ষী এদিক-ওদিক তাকালেও বাসুকে প্রায়ই চোখে চোখে দেখছে। বাসুও।

‘ওদের আসতে বলেন না কেন জেঠাইমা মাঝে মাঝে। একলা থাকি আমি। আর এমন দূরও নয় এ-বাড়ি?’

‘বলব।’ রত্নময়ী সংক্ষিপ্ত উত্তরে এ-আলোচনার ছেদ টানলেন।

বাইরে চটির শব্দ উঠছিল। শুকনো কাশির খক্ খক্।

‘বাবা উঠেছে। আমি দেখছি।’ মীনাক্ষী পালঙ্ক থেকে নেমে মন্থর পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মা আর ছেলে চুপচাপ বসে থাকল ঘরে। দুজনেই এ ঘরের সাজসজ্জা

দেখছিল। গাঢ় সবুজ রঙ ধরানো দেওয়াল। লাল মেঝে। পালিশ তোলা পালঙ্ক। নরম বিছানা, দুধ-সাদা চাদর। একদিকে কাঁচের পাল্লা দেওয়া আলমারি। একটি বুককেস। ছোট্ট লেখার টেবিল, দোলনা চেয়ার —বেতের বুনুনি তার ওপর গদি। দেওয়ালে ক'টি ছবি, একটি নতুন ধরনের সুন্দর দেওয়াল ঘড়ি। জানালায় কাঁচের শার্সি গুটোন। দুপুর গড়ানো রোদ জানালার পর্দায় পড়েছে পাশ কাটিয়ে। ঘরের দরজায় নীল-রঙ পর্দা দুলছে একটু একটু।

তাকিয়ে তাকিয়ে রত্নময়ী গোপনে ক'বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বাসু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে টেবিল থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে ছবি দেখছিল। সিনেমার কাগজ একটা। বেশ তন্ময় হয়ে গেল ছবি দেখতে দেখতে।

ফিরে এল মীনাক্ষী। ঘরে ঢুকেই হেসে বললে, 'বাবা কি বলছে জানেন জেঠাইমা? বলছে, বৌদি কি পথ ভুলে এসে পড়েছেন নাকি? তা ঠিকই কিন্তু, সে আপনি যাই বলুন। আসুন বাবার ঘরে।'

রত্নময়ী উঠলেন। বাসু উঠবে কি উঠবে না ভাবছিল। মীনাক্ষী সেটা লক্ষ্য করলে। বললে, 'তুমি ভাই এ-ঘরেই বসো বরং, ও বুড়োমানুষদের কথায় গিয়ে কি করবে। এঘরে বসে আমরা গল্প করি।'

রত্নময়ী দাঁড়ালেন। কথাটা মন্দ বলে নি। তাঁদের কথার মধ্যে বাসুর না থাকাই ভাল। বিশেষ করে যখন পাঁচ রকম কথা হবেই সংসারের, বাসুর ব্যাপার নিয়েও। কাছে থাকলে রত্নময়ীও হয়ত অস্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারেন, বাসুরও ভাল না লাগতে পারে।

রত্নময়ী একটু ভেবে বললেন, 'বেশ ও এ-ঘরেই বসুক। তবে আগে কাকাবাবুকে প্রণাম করে আসুক।'

বাসু উঠে দাঁড়াল।

পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন রত্নময়ী, মীনাক্ষী বললে আবার, 'বাবার সঙ্গে

গল্পগাছা করে পালিয়ে গেলে চলবে না জেঠাইমা। আজ কিন্তু রাত পর্যন্ত আটকে রাখবো।'

চোখে প্রশ্ন তুলে চাইলেন রত্নময়ী।

'আজ যে বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো। পুজো তো আছেই, তার ওপর কিছু লোক জনের নেমন্তন্ন আছে। চাকর বামুনেই করছে সব। আমি কিইবা জানি জেঠাইমা, আপনি এসেছেন ভালই হল, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন।'

'বেশ তো।' রত্নময়ী মাথা নাড়লেন। বাড়ি ঢুকতেই দেখেছিলেন দালানে চাকর ঝিয়ের জটলা, উঠোন জুড়ে বাসনপত্র নামানো, রান্নাঘরে ধোঁয়া—। এসবের তাৎপর্য এতক্ষণে বুঝতে পারলেন রত্নময়ী।

আট

কুশলাদি প্রশ্নের পর সাধারণ কয়েকটা কথা বলে দুজনাই থেমে গিয়েছিলেন। মোহিতবাবু এবং রত্নময়ী।

কয়েকবার অনুরোধ সত্ত্বেও রত্নময়ী বসেন নি, দাঁড়িয়েছিলেন; একটু দূরে, মুখোমুখি। কপালের ডগা পর্যন্ত ঘোমটা নামানো। ক'টি রেখা ভুরুর ওপর যেন পেন্সিলে আঁকা হয়ে রয়েছে। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ, একটু বা উদাস।

কালো পালিশ-তোলা হাতল দেওয়া ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন মোহিত। গোলগাল মোটাসোটা মানুষ, রঙটা কালোই। মাথায় টাক পড়েছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, চোখ দুটো সামান্য লালচে। ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর চশমার খাপ, ভাঁজ ভাঙা খবরের কাগজ।

অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মোহিতবাবুই আবার কথা শুরু করলেন, 'দেশের বাড়ি ঘরের খবর টবর কিছু রাখেন না কি বৌদি?'

'না; কই আর রাখি।' রত্নময়ী উদাস গলায় জবাব দিলেন।

'আমি তো যাচ্ছি দুচার দিনের মধ্যেই।'

'হঠাৎ?' আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন রত্নময়ী।

'মা মারা যাবার পর আর যাই নি; অনেককাল হল তা। এবার একবার গিয়ে ঘরবাড়িটা তাড়াতাড়ি বাসযোগ্য করিয়ে আসব। যা সর্বনাশ মাথার ওপর ঘনিয়ে আসছে।' মোহিতবাবু কথা বলতে বলতে কাগজের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

সর্বনাশটা যে কী রত্নময়ী বুঝতে পারছিলেন না। অবাক চোখে মোহিত বাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কথাটা আরও পরিষ্কার করলেন মোহিতবাবু। বললেন, 'চারপাশে অবস্থা যেমন হয়ে আসছে তাতে আর বিশ্বাস নেই কিছু। বলা যায় না কখন কি ঘটে, কলকাতায় দুম্-দাম্ বোমা এসে ছিটকে পড়া বিচিত্র নয়।'

চোখে মুখে বেশ একটা উত্তেজনা ফুটিয়ে রত্নময়ীকে ব্যাপারটা বুঝোলেন মোহিতবাবু। বললেন তারপর—একটু থেমে, 'যারা ভেতরের খোঁজ খবর রাখে তাদের দু একজন করে কলকাতা ছাড়ছে। আমার এক বন্ধু পুজোর ছুটিতে ফ্যামিলি নিয়ে গিয়েছিল যশিডিতে। বাড়ি আছে তার। অবস্থা-গতিক দেখে কলকাতায় আর আনতে চাইছে না এখন। বাড়ি ঘরদোর যাদেরই আছে বাইরে—সব একে একে যাবার কথা ভাবছে। সর্বক্ষণ বিপদ মাথায় করে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকা যায় নাকি। তাই ঠিক করে ফেলেছি দরকার হলে দেশের বাড়িতেই গিয়ে উঠব। তাড়াতাড়িতে যা হয় একটু মেরামত টেরামত করিয়ে রাখি।'

মোহিতবাবু চুপ করলেন একটু। বললেন তারপর, 'আপনাদেরও একবার যাওয়া উচিত।'

'আমাদের।' রত্নময়ী চমকে উঠলেন। তাঁর মুখে যে খানিকটা উদ্বিগ্নতার ছাপ না পড়েছিল তা নয় তবে একটা গভীর হতাশায় আরো মুখখানি কেমন যেন ম্লান হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রত্নময়ী অকস্মাৎ ঠোঁটে করুণ একটু হাসি টেনে বললেন, 'আমাদের যাওয়া কি অত সহজ ঠাকুরপো।'

আবার একটু নীরবতা। রত্নময়ী ভাবছিলেন কথাটা একবার শুরু করতে হয়। কিন্তু কি ভাবে আরম্ভ করবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হল, বই টাকাপত্রর কথা না তোলাই ভাল—শুনলে মোহিত ঠাকুরপো হয়ত মনে করবেন সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা এসেছেন ওঁর বাড়ি। এতে অসন্তুষ্ট হবেন উনি। তার চেয়ে বাসুর কথাই গোড়াগুড়িতে শুরু করা যেতে পারে।

আরও খানিক নীরব থেকে গলা পরিষ্কারের শব্দ করলেন রত্নময়ী। বললেন মৃদুকণ্ঠে, 'ছেলেটাকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম, ঠাকুরপো।' বলে রত্নময়ী তাকালেন মোহিতবাবুর মুখের দিকে। মোহিতবাবুও তাকালেন। চোখটা আর ঠিক মোহিতবাবুর চোখে নয়, ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর রেখে বললেন রত্নময়ী, 'ওর একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে নয়। বসে থেকে থেকে

আর পাড়ার বদমাশ ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে মিশে বাঁদর হয়ে উঠছে। কোনো রকম একটা কাজ কর্ম—!' রত্নময়ী থামলেন। ঘোমটা ঠিক করলেন।

কথাটার জবাব দিলেন না মোহিতবাবু। মুখ একটু গম্ভীর হল। দৃষ্টিও। যেন তিনি ভাবছেন। বাসুর কাজ কর্মর কথাই।

রত্নময়ীও দারুণ অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন। কি শুনতে হবে, কেমন ধরনের কথা।

অবশেষে মুখ খুললেন মোহিতবাবু। তাঁর মুখচোখের ভাব বদলাল না সামান্যও।

'লেখাপড়া তো করলে না।'

'হ্যাঁ, ওই ম্যাট্রিক পর্যন্ত!' রত্নময়ীর কণ্ঠের স্বরটা দৈন্যের, কেমন যেন অপরাধীর মতনই। তা একটু বাড়িয়েই বললেন বৈকি।

'ম্যাট্রিক তো আর পাশ করে নি।'

'না।' মাথা নাড়লেন রত্নময়ী ধীরে।

'ভাল কাজ করেনি।' মোহিতবাবু বলছিলেন থেমে থেমে, 'চাকরি-বাকরি এমনিই জোটান মুশকিল, তার ওপর ম্যাট্রিকটা অন্তত পাশ না করলে কেউ আমল দেবে না। শুনি আজকাল অফিস-টফিসের চাপরাসী পিয়নগুলো পর্যন্ত ম্যাট্রিক পাশ।'

একটু থেমে শব্দস্পষ্ট দীর্ঘনিশ্বাস তুলে বললেন আবার, 'দাদা আমাদের সারা জীবনটা পড়ে লিখে কাটালেন, অথচ তাঁর ছেলেকে দেখুন। এমন ভাগ্য। কপাল। ও বিদ্যেও কপালে লেখা থাকে।'

কথাগুলো শ্রুতিমধুর নয়, সান্ত্বনারও না। রত্নময়ীর খারাপ লাগছিল। ভীষণ খারাপ।

'তা বটে। আনলাম তবু আপনার কাছে—আর কোথায় বা যাব। আমি মেয়ে মানুষ, কীই বা জানি, কাকেই বা চিনি। আপনার পাঁচ জায়গায়

চেনাশুনো আছে, যদি একটা গতি হয়।' মনে মনে যেন আক্রোশে ফেটে প'ড়ে রত্নময়ী তাঁর দীনতাটুকু চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করলেন।

'এনেছেন ভালই করেছেন। আজ-কালের মধ্যেই যে কিছু করে উঠতে পারব সে ভরসা আপনাকে দিচ্ছি না। তবে দেখি কতদূর কী করতে পারি।'

ভরসা না, তবুও শেষের কথাগুলো যেন ভরসাই। রত্নময়ীর ভাল লাগল। মনটা যতটা হতাশ হয়ে পড়েছিল, একটু আশার ছোঁয়ায় তা যেন কাটল খানিকটা।

'সুধা চাকরিই করছে তা হলে!' মোহিতবাবু প্রশ্নান্তরে গেলেন।

'হ্যাঁ।'

'কি রকম পায় টায়?'

'সামান্যই। তা আশি পঁচাশি।'

'মন্দ কি! মেয়েটা তবু সংসারের কাজে লাগল।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আজকাল মেয়েরা অনেকেই চাকরি বাকরি করছে। না করে উপায় কি। যা দিনকাল পড়েছে, আর আমাদের মতন লোকের চলে না।'

এমন সময় মীনাক্ষী এল। হাতে চায়ের পেয়ালা মোহিতবাবুর জন্যে। ইজিচেয়ারের কাছে ছোট্ট একটি টিপয় ছিল কাঁচ পাতা। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে মীনাক্ষী তাকাল রত্নময়ীর দিকে।

'আপনার জন্যে আমি আলাদা করে চা করেছি জেঠাইমা। আসুন।'

'আমার জন্যে আবার কেন?' রত্নময়ী আপত্তি তুললেন।

'আ খাবেন তো ক' চুমুক চা। মেয়ে করেছে কষ্ট করে, গলাটা ভিজিয়ে নিন।' মোহিতবাবু হাসলেন। অগত্যা রত্নময়ী একটু নড়ে চড়ে উঠলেন।

'জেঠাইমা আর বাসুকে আমি রাত পর্যন্ত আটকে রাখছি বাবা, পুজোর পাট, লোকজনের খাওয়াদাওয়া—খানিকটা ঝঞ্ঝাট পুইয়ে যাক জেঠাইমারা।' হাসছিল মীনাক্ষী।

'বেশ করেছিস। আসল লোককে পাকড়াও করেছিস। তবে আর কি বৌদি, মেয়ের সঙ্গে একটু হাত লাগান।' চায়ে চুমুক দিতে দিতে মোহিতবাবু হাসলেন।

রত্নময়ীকে সঙ্গে করে মীনাক্ষী ঘর ছেড়ে চলে গেল!

নিজের ঘরে এনেই রত্নময়ীকে বসাল মীনাক্ষী। ধবধবে সাদা পাথরের গ্লাসে করে চা দিল। না নিয়ে পারলেন না রত্নময়ী। যদিও কোথাও জলস্পর্শ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ, তবু এক্ষেত্রে ওই মেয়েটির সযত্ন এই আন্তরিকতাটুকুকে উপেক্ষা করতে বাধল।

চা খাচ্ছিলেন রত্নময়ী। মীনাক্ষীও। পাশেই বসে। বাসু সেই আগের চেয়ারটিতে। সামনে খাবারের প্লেট, চায়ের কাপ। দুই-ই সে নিঃশেষ করে এনেছিল।

মীনাক্ষী চা খেতে খেতে ভুরুর ওপর চোখ তুলে তুলে তাকাচ্ছিল বাসুর দিকে। বললে একসময়, 'আপনার ছেলের সঙ্গে আমার কত গল্পটল্প হয়ে গেল জেঠাইমা।'

'তাই নাকি, কী গল্প?' রত্নময়ীর ভয় হচ্ছিল, বাসু না সগৌরবে তার সিভিকগার্ডের গল্পগুলো করে থাকে।

'কত রকমের। যাই বলুন, ছেলের আপনার বেজায় সাহস!' মীনাক্ষী একটা হাসির কটাক্ষ অন্য পাশে ছুঁড়ে দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

তা হলে যা ভেবেছেন রত্নময়ী তাই। বাসু সেই সব হতচ্ছাড়া ছোঁড়াগুলোর গল্পই করেছে।

ছেলের পক্ষ হয়ে যেন একটা কৈফিয়ত দিচ্ছেন এমন সুরে রত্নময়ী বললেন 'ওর আবার গল্প, যত দুরন্তপনার কথা।'

'তাই তো ভাল।' চট্ করে বললে মীনাক্ষী, 'জবুথবু শান্তশিষ্টর চেয়ে পুরুষ মানুষের দুরন্ত হওয়াই সাজে।'

রত্নময়ী চোখ তুলে তাকালেন। খানিকটা বিস্ময় বোধ করছেন বৈকি মীনাক্ষীর কথায়। ঠাট্টা করছে না তো মীনাক্ষী। মুখ দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই। হাসি চাপা ঠোঁট, ঝিকমিকে চোখ।

যার সম্পর্কে এই কথা তার কিন্তু ভালই লাগছিল। লাগছে প্রথম থেকেই। আজ পর্যন্ত বাড়িতে মা দিদি শুধু ছি ছি করেছে, না উৎসাহ, না প্রশংসা। অথচ বাইরের লোক হয়েও মীনাক্ষীদি'র শুরু থেকেই প্রশংসা। আদর যত্ন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত জিজ্ঞাসাবাদ। শুনতে শুনতে মীনাক্ষীদি'র চোখ যেন ঠিকরে আসছিল, আগ্রহে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মতন অবস্থা। এমন সুন্দর মতন একটি মেয়েকে তার নিজের পাঁচরকম গল্প শুনিয়ে অভিভূত করতে পেরেছে ভেবে বাসুর নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রত্নময়ী তবু হেসে বললেন, 'ছেলে বয়সে দুরন্তপনা অন্য জিনিস, কিন্তু বড় হলে আমাদের সংসারে তাই কি মানায়, না ভাল!'

'না মানাবে কেন? এ-সব ছেলেরাই দেখবেন শেষ পর্যন্ত কত ভাল ভাল কাজ করে বসেছে। যা-ই আপনি বলুন জেঠাইমা, ঘরকুনো মেনিমুখো ছেলেগুলোকে দেখলে আমার কান্না পায়। খ্যাংরা কাঠি চেহারা, কোনো-রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে পরীক্ষা পাশ, তারপর একটা কেরানীগিরি আর বিয়ে। দেখে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে।' ঠোঁট উল্টে নাকের ডগা কুঁচকে কেমন এক ধিক্কারের ভঙ্গি করলে মীনাক্ষী। তারপর তাকাল বাসুর দিকে—টান টান চোখের চাপা কৌতুকে।

রত্নময়ী ছেলের দিকে একবারটি চেয়ে মীনাক্ষীকে হেসে হেসেই বললেন, 'একেই মা মনসা, তারপর আর তুই ধুনোর গন্ধ দিস না মা। আমায় তাহ'লে আর বাঁচতে হবে না।'

মীনাক্ষী সরবে হাসল, 'তাই নাকি, বড় জ্বালাতন করে আপনাকে।'

'জ্বালাতন কী শুধু, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে।'

'মা হলে অমন একটু জ্বলতেই হয়, না কি বাসু?' মীনাক্ষী বাসুর দিকে সকৌতুক-চোখ তুলে প্রশ্ন করলে।

জবাব দেবার ইচ্ছে থাকলেও মার সামনে মুখ খুলতে পারল না বাসু এই অবস্থায়। চোখ দুটোতে মৃদু সম্মতির আভাস তুলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঠাকুর ডাকাডাকি করছিল, ঝি-ও এসে দাড়িয়েছিল ঘরের মধ্যে। রান্নাঘরে একবার যেতে হবে, ভাঁড়ার থেকে এটা সেটা বের করে দিতে হবে—পুজোর ফল পাকড় কাটাকাটি আছে।

মীনাক্ষী রত্নময়ীকে ডাকলে, একবার চলুন তো জেঠাইমা।

রত্নময়ী বললেন, 'চল্ যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা মা।'

'কি?'

'তুই কি সত্যিই আমায় রাত পর্যন্ত আটকে রাখবি? তা হলে বাসুকে দিয়ে বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে হয়, না হলে মেয়ে দুটো হা পিত্যেশ করে থাকবে।'

'বেশ তো।' মীনাক্ষী একটু থেমে কি ভেবে বাসুর দিকে চাইল, বললে, 'সেই ভাল ভাই, তুমিই যাও বরং, আসার সময় সুধা-আরতিকে নিয়ে এস।'

রত্নময়ী বাধা দিলেন। দুই মেয়ের কারুর যে আসা সম্ভব নয় তার একটা অস্পষ্ট যুক্তি দেখিয়ে বললেন, আজ থাক পরে ওদের একদিন পাঠিয়ে দেব।'

মীনাক্ষীও বিশেষ পীড়াপীড়ি করলে না।

বাসু হঠাৎ কি-ভেবে নিজের একটু দাম বাড়াবার চেষ্টা করলে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল আগেই। এবার প্রথমে মীনাক্ষী তারপর মার মুখের দিকে চেয়ে যেন রত্নময়ীকেই উদ্দেশ্য করে বললে, 'আমি আটটার সময় আসব।'

'সে কি, কেন?' মীনাক্ষী প্রশ্ন করলে।

'দশটা পর্যন্ত আমায় ডিউটি দিতে হয়।' বাসু বলছিল বেশ একটা আত্মমর্যাদা নিয়ে, 'আটটার আগে আসা মুশকিল।'

'আ, রাখো।' মীনাক্ষী বাধা দিলে, 'একটা তো দিন। ও তুমি বলে-কয়ে ব্যবস্থা করতে পারবে। পারবে না?' ভুরুতে কাঁপন তুলে ঠোঁট একটু কুঁচকে আশ্চর্য এক হাসি ফুটোল মীনাক্ষী, 'তবে আর কি ছাই দিদি হলুম তোমার!'

নয়

রত্নময়ী ধারণা করতে পাবেন নি। কাজে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন। আয়োজনটা সামান্য নয়। লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ মোহিত ঠাকুরপো, মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ আরও উজাড় করে পাবার জন্যেই বোধ হয় ব্যবস্থাটা করেছেন ফলাও করে। নামে পুজো হলেও একটা ছোটখাট যজ্ঞ বলা যায়।

মীনাক্ষী কাজের মেয়ে, চাকর ঝি-ও যথেষ্ট। আরও কটা এসে জুটেছে আজকের মতন। তবু কি সহজে সামাল দেওয়া তার সাধ্য ছিল। রত্নময়ীও হিমসিম খেয়ে গেলেন। নিচে বামুন ঠাকুরগুলো সুযোগ বুঝে লুটে পুটে একশা করছে। ওপবে পুজোর জিনিস ছত্রাকার। মোহিত ঠাকুরপো এই নিচে ডেকে পাঠান, মীনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে ওপবে আসতে জোর তাগিদ শুরু করে। ওপর নিচ করতে করতে হাঁফ ধরে গেল রত্নময়ীর বুকে। সেই আগের শরীর আর নেই। একটু পরিশ্রমেই শ্রান্ত হয়ে পড়েন, বুকে হাঁপানির টান ওঠে, মাথাটা ঝিমঝিম করে।

বেশ ক্লান্ত বোধ করলেও রত্নময়ী কিছু বলেন নি। মাথা ধরে উঠেছিল, যন্ত্রণা হচ্ছিল, তবু চুপ করে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বুকের টান উঠল। চেষ্টা করেছিলেন একটু জিরিযে সামলে নেবেন, পারলেন না।

মীনাক্ষী বললে, আপনি আমাব ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকুন জেঠাইমা। আরাম পাবেন।'

রত্নময়ী সম্মত নন। বললেন, 'পুজোর পাট তো চুকেছে মা। নিচে রান্নাবান্না শেষ। রাতও হয়েছে। আমি যাই।'

উপায় কি। মোহিতবাবুও ওপরে এলেন, বললেন, 'তাই তো! আপনাকে আর আটকে রাখব না তা হলে।'

ব্যবস্থাটা করলে মীনাক্ষীই। লোকজন আসতে শুরু করেছে। বাসু পরিবেষণে হাত লাগাতে তৈরী। তা ছাড়া ওকে না খাইয়ে কিছুতেই

যেতে দেবে না মীনাক্ষী। অত খাটাখুটি করল ছেলেটা। জেঠাইমা তো আর কিচ্ছুটি মুখে দেবেন না। আহা, মীনাক্ষীর বুঝি মনে কষ্ট হয় না।

'আপনাকে আমি বাড়ির ঠাকুর আর মানদার সঙ্গে গাড়ি ডেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, জেঠাইমা। বাসু থাক্ এখন। পরে যাবে। আর তেমন রাতই যদি হয়—থাকবেই না হয় এখানে, ও তো আর জলে পড়ে নেই।'

মীনাক্ষীর অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, বলতে কি, আগাগোড়াই বড় ভাল লাগছিল রত্নময়ীর। যত না অভিমান রাগই করে থাকুন মোহিত ঠাকুরপোর ওপর—তবু এতদিন পরে একটি অতি পরিচিত প্রায়-আত্মীয় পরিবারের মধ্যে আবার নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরে—মনে মনে তিনি শুধু খুশী হন নি, তৃপ্তি পাচ্ছিলেন। আপত্তি করার কিই বা থাকতে পারে। বরং মীনাক্ষীর কথায় লজ্জিত হয়ে বললেন, 'কি যে বলিস, থাক্না বাসু—এখানে থাকবে আমার ভাববার কি আছে।'

মীনাক্ষী পুজোর প্রসাদ, কিছু মিষ্টি আলাদা পরিষ্কার করে সাজিয়ে বেঁধে গাড়ি ডাকিয়ে রত্নময়ীকে তুলে দিল। সঙ্গে দিল বাড়ির ঠাকুর আর ঝিকে। পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ঠাকুরদের বলে দিল, 'জেঠাইমাকে বাড়ির মধ্যে দিয়ে, ওই প্রসাদের থালাটা নিজেরা হাতে করে তুলে দিয়ে তবে আসবে। যাবে আর ফিরবে। দেরি করো না।'

যাবার সময় প্রণাম সেরে বললে, 'একেবারে ভুলে বসে থাকবেন না জেঠাইমা। আসবেন মাঝে মাঝে।'

'আসব মা।' মীনাক্ষীর ওষ্ঠে করস্পর্শ করে চুম্বন করলেন রত্নময়ী।

রাত হয়েছিল ; ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বাসু। লোকজন একে একে বিদায় নেবার পরও কাজ যেন শেষ হয় না। ওকে একটু ডাকতে, এটা একবার তুলে ধরতে, এবং সেটায় নজর দিতে আরও খানিকটা সময় গেল। তারপর ঘড়িতে চোখ তুলে বাসু দেখে এগারোটা বেজে গেছে।

মীনাক্ষী বললে, যাও তুমি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এবার পরিষ্কার হয়ে এস। ততক্ষণে বাবার ঘরে খাবার দিয়ে আসি আমি। তারপর একসঙ্গে খাবোখন।'

পরিবেষণের সময় যত রান্না-বান্না ঘেঁটে ঘেঁটে আর দৌড়-ঝাঁপ করতে করতে ঘামে ময়লায় শরীরটা ঘিন ঘিন করছিল বাসুর। কথাটি আর না বলে ও বাথরুমে চলে গেল।

পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসতে খানিকটা সময় লাগল।

মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা হল বারান্দাতেই। রেলিংয়ে হাত দিয়ে কপাল টিপে দাঁড়িয়েছিল। মোহিতবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

বাসু কথা বলে নি কোন, শুধু চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল এবং বেশ একটু-ক্ষণই বলা যায়। মীনাক্ষী যেন দেখেও দেখে নি—বা দেখলেও ইচ্ছে করে চুপ করে ছিল।

শেষে বললে, অস্বস্তি আর যন্ত্রণা মেশান স্বর গলায়, 'কপালটা যেন ছিড়ে যাচ্ছে।'

'মাথা ধরেছে খু...ব!' বাসু বোধ হয় সমবেদনা জানাল।

'ধরেছে সন্ধ্যে থেকেই, গা করিনি। এখন যেন দাঁত ফুটিয়ে ধরেছে।' মীনাক্ষী একটু কাত হয়ে দাঁড়াল। তাকাল বাসুর দিকে। আঙুল দিয়ে কপাল টিপছে। ক্লেশকর যন্ত্রণার অস্ফুট দু একটি শব্দ করছে থেকে থেকে।

মনে মনে বাসু রাত বাড়ার কথা ভাবছিল। এখন বুঝি সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। যেতে যেতে বারোটা হবে। পথ অবশ্য সামান্যই, তবু কার্তিক মাসের রাত বারোটা কম কী। গা হাত সব যেন ভেঙ্গে আসছে, ঘুম পাচ্ছে। খাটুনি কিছু কম হয় নি।

মীনাক্ষী বললে, 'আমি ভাই একটু হাতে মুখে জল দিয়ে আসি; আরাম পাব খানিকটা। কেমন?'

বাসু কি বলবে আর না বলবে তা শোনার অপেক্ষায় না থেকে আবার

বললে মীনাক্ষী, 'তোমার কোন ভাবনা নেই। জেঠাইমাকে আমার বলা আছে, রাত হয়ে গেলে আজ এখানেই থাকবে।' একটু থেমে, 'না কি, কষ্ট হবে তোমার, ঘুম আসবে না এ-বাড়িতে।'

অপ্রস্তুত হল বাসু। 'না, কষ্ট কিসের।'

'তবে একটু দাঁড়াও ভাই, দাঁড়াবেই বা কেন, ওই—ওই ঘরটায় বস, আমি এখুনি আসব।' মীনাক্ষী আঙুল দিয়ে তার পাশের একটি ঘর দেখিয়ে চলে গেল।

বাসু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বারান্দায়, একা। মোহিতকাকার ঘরের বন্ধ দরজা দিয়েও কেমন একটা গন্ধ আসছিল! মদের গন্ধের মতন। বাসু সেই গন্ধ শুঁকছিল আর অবাক চোখে তাকাচ্ছিল বন্ধ দরজার পাল্লার দিকে।

ঘরের জানলার গা-লাগিয়ে ছোট পালঙ্কে বিছানা পাতা। পুরু গদি। ধবধবে সাদা চাদর, ফোলা ফোলা বালিশ দুটো। ঘরের একপাশে একটি শুধু ড্রয়ার-আলমারি, বেঁটে মতন। আর এককোণে আলনা।

ঘরের মেঝেটা ঝি মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। আসন পেতে দিল কার্পেটের; তারপর এল ঠাকুর খাবারের থালা হাতে। একটু পরেই মীনাক্ষী। তার হাতেও ছোট মতন একটি থালা।

বাসুকে আসনে বসতে বলে একটু তফাতে বসল মীনাক্ষী। তার থালাটি নামিয়ে নিল নিজের কোলের কাছে। আড়চোখে দেখছিল বাসু। ক'খানা লুচি, সামান্য তরিতরকারি, দুটি মিষ্টি। 'নাও শুরু কর, দু'জনে গল্প করতে করতে খাই।'

পাত না ছুঁয়েই বাসু বললে, 'এত আমি খেতে পারব না।'

'অত আর কই! জোয়ান ছেলে ও-টুকু খাবে না কি! খাও।' মীনাক্ষী যেন ছোট্ট করে আদরের ধমক দিল। দিয়ে নিজের পাতের লুচি ছিঁড়ল টুকরো করে।

'অত আমি খাই না; খিদেও নেই তেমন, মরে গেছে।' বাসু তবু আপত্তি তোলে।

'খাও না যা পার,' মীনাক্ষী চোখ তুলে তাকাল, 'আমি বলছি। আমার কথা শুনতে হয়।' বলে মীনাক্ষী হাসল, সুন্দর করে মুখের ভঙ্গিতে—চোখে, ঠোঁটে।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল টুকটাক। বাসু এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। মীনাক্ষীকে দেখছে। মুখ হাত ধুয়ে শাড়ি বদলেছে মীনাক্ষী। সেই দুধ সাদা শাড়িই, তবে খুব পাতলা, পাড়ে কটি মিহি কালো টান। গায়ে ফিকে নীল পাতলা জামা। মুখে পাউডারের গুঁড়ো, চুলে চিরুনির সদ্য স্পর্শ।

'তুমি কি খেতে সবচেয়ে বেশি ভালবাস, মিষ্টি না নোনতা?'

'আমার মাংসই ভাল লাগে বেশি।'

'আমারও লাগত। যখন মাছ মাংস খেতুম, তখন মাংস বললে আর কথা ছিল না। নাম শুনলে জিব দিয়ে জল পড়ত।' মীনাক্ষী তাকিয়ে তাকিয়ে হাল্কা গলায় বলছিল। হাসছিলও মিষ্টি মিষ্টি।

'দই খেতেও আমার খুব ভাল লাগে।' বাসু বললে।

'তাই নাকি, আমারও ঠিক তাই। গরম শীত—সব সময় দিনের বেলায় অন্তত দই আমার চাই-ই।'

একটু চুপ। হঠাৎ চাপা গলায় হেসে উঠে মীনাক্ষী বললে, 'তোমায় আমায় খুব মিল তো।'

বাসুও মুখ তুলে হাসল। কী ভেবে একটু পরে বললে, 'আচ্ছা কোন্ রঙ আপনার পছন্দ?'

রঙের পছন্দ অপছন্দের ধার দিয়েও গেল না মীনাক্ষী। বাসু, 'আপনি' বলবে কেন, কোন যুক্তিতে। বয়সে বড়? সে কি-ই বা এমন। যদি তাই হয় তবে বাসু কি সুধাকে আপনি বলে? বয়সে সুধার চেয়ে মীনাক্ষী বছর খানেকেরও বেশি ছোট। সুধাকে যদি না বলে, মীনাক্ষীকে কেন বলবে।

আপনি কথাটা বড় দূর-দূর পর-পর। তুমি বলতে হবে তাকে। নামের সঙ্গে দিদি থাক—মীনুদি—তাতে মীনাক্ষীর আপত্তি নেই।

প্রথম প্রথম একটু আড়ষ্ট লাগল, মুখ দিয়ে বেরুলে কেমন শোনাচ্ছিল যেন। তারপর 'তুমি' আর আটকাল না বাসুর মুখে। সয়ে গেল কানে। বরং ভালই লাগল। আগের চেয়ে।

কি করে, কোন কথার কি শাখা পল্লব ধরে কথা উঠেছিল কালী পুজোর। বাসু বলছিল, তাদের পাড়ায় খুব ধুমধাম করে কালীপুজো হয়, তুবড়ি কম্পিটিশন তো আছেই, তার ওপর যাত্রা।

'আমাদের এখানেও কিছু কম হয় নাকি ?' মীনাক্ষী হাসল, 'ওই যে বিছানা—ওই বিছানায় শুয়ে বালিশের ওপব মুখ থুবড়ে জানলা দিয়ে সারা রাত আমি যাত্রা দেখি। জানলার নিচে যে ছোট মতন মাঠ—ওখানে আসর বসে।'

'বা বেশ তো।' ওপরে সামিয়ানা থাকে না ?'

'হ্যাঁ। থাকলেই বা কি, পাশ থেকে দেখছি তো, সবই সুন্দর দেখা যায়।

'তোমার তা হলে খুব মজা।'

'একা একা মজা লাগে না, ঘুম পেয়ে যায়। এবার তোমায় নেমন্তন্ন করছি, আগে থেকেই। আসবে তো !'

মাথা নাড়ল বাসু। আসবে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে বাসু উঠল। মীনাক্ষীও। বাসু সামনের দরজার দিকে এগুতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মীনাক্ষী বললে, 'ওদিকে নয়—ওই সামনে যাও।'

যে-দিকে মুখ করে খেতে বসেছিল—সেই দিকে মীনাক্ষীর ঘর। একটা দরজা ছিল সে-দিকের দেওয়ালে, একপাশে ; বন্ধ। প্রথমটায় বুঝতে পারেনি বাসু। হকচকিয়ে গিয়েছিল।

দরজা খুলে এগিয়ে গেল। ছোট মতন প্রায় তে-কোণা বাথরুম। কল-টল আছে। আলাদা করে টিনের গামলায় জলও। মীনাক্ষীর ঘর দিয়েও

এ-বাথরুমে ঢোকা যায়। দরজা রয়েছে। শুকনো খট্‌খটে বাথরুম। দিনে বুঝি ব্যবহারই করা হয় না।

বাসু ফিরে এলে মীনাক্ষী ঢুকল। মুখ ধোবার জল ফেলার আশ্চর্য এক শব্দ উঠছিল। বাসু শুনছিল আর মনে মনে এই সুন্দর, সচ্ছল গৃহবাসীদের সৌভাগ্যকে যেন একটু ঈর্ষাই করছিল।

ফিরে এসে মীনাক্ষী বললে, 'জান, আদ্ধেক রাত যায় আমার ঘুম আসতে; রাত দুটো তিনটে। কিছুতেই ঘুম আসে না, ভাই। কী কষ্ট। তখন খালি জল খাচ্ছি আর ওই বাথরুমে ঢুকে ঘাড়ে, মুখে জল ঢালছি।'

ঝি এসে মসলা দিয়ে গেল—পান-ও। হ্যাঁ, মীনাক্ষী পান তুলে মুখে দিলে। বাসুও।

জায়গাটা পরিষ্কার করছিল ঝি। মীনাক্ষী বললে, 'এই ঘরটায় তুমি শোবে। বেশ ঘরটা, না?'

'হ্যাঁ, বেশ সুন্দর।' বাসু সবে দাঁড়াল। ঘর পরিষ্কার করে বেরিয়ে গেল ঝি।

একটু থেমে, পান চিবোন মুখে কতকগুলো সুন্দর ভঙ্গি করে বললে মীনাক্ষী, 'এবার তো তুমি শোবে। খুব খাটাখুটি গেছে—খুব ঘুম পেয়েছে নিশ্চয়ই। আমার পায়নি। এখন একটু ছাদে গিয়ে বেড়াব। কোজাগরী পূর্ণিমা—এতো সুন্দর লাগবে। যাবে না কি?'

ঘুম পেয়েছিল বাসুর। চোখ যেন বুজেই আসছিল। তবু কেমন যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করল বাসু। বললে, 'ছাদে যাবে? চলো না। ফাইন জ্যোৎস্না।'

মুখ টিপে হাসল মীনাক্ষী, 'গিয়েই কিন্তু বলতে পারবে না ঘুম পাচ্ছে নিচে যাই।'

মাথা নাড়ল বাসু। না বলবে না।

কোজাগরী পূর্ণিমার সেই-কুহক জ্যোৎস্না এখানেও নেমেছে, ক্রীক্ রোর

এই অল্প একটু ছাদেও। আর উপচে পড়া সেই যুঁইফুল-জ্যোৎস্নায় ইট কাঠ কংক্রিটের কাঠিন্য যেন এখনকার ঈষৎ হিমে ভিজে ভিজে গলে নরম হয়ে গেছে। এখন এই ছাদ যেন আর ছাদ নয়, আশ্চর্য এক বিছানা। আর স্বপ্নের নিবিড় আলস্যের মতন আশ্চর্য এক অনুভূতি এই আলোয়, হাওয়ায়। একটু অস্পষ্ট, জল-ধোওয়া ছবির মত পাশাপাশি বাড়ির ছাদ, জানলা, চিলে কোঠা, রেডিয়োর এরিয়াল চোখে পড়ছে কি পড়ছে না—মন শুধু এই নিস্তব্ধতায়, আলোয়, শূন্যতায় কেমন এক বিচিত্র স্বাদ মেখে দীঘিজলের কাঁপন তুলছে নিজের মধ্যে।

সুপুরি গাছের ঝাঁকড়া মাথার ওপর দিয়ে একটা কাক বুঝি ভুল করে ডাক দিয়ে উড়ে গেল। সিরসির হাওয়াও ঢেউ দিয়ে গেল ছুঁই-না-ছুঁই আঙ্গুলে। আলো এসে, হিম ঝরে যখন দিন-দুপুর-সন্ধ্যের কাঁটাতার মন, ঠোঁট সমস্ত ভিজিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেছে, তখন মীনাক্ষী কথা বললে, নিশ্বাসের স্বরে।

'বাসু!'

'কি?'

'কী সুন্দর, না!'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ভাল লাগছে?'

'লাগছে।'

একটু চুপ।

'আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো?'

বাসু চুপ। তাকিয়ে রয়েছে। সাদা শাড়ি চাঁদের আলোয় এক ফালি জ্যোৎস্নার মতন অসাড়। টানা টানা লম্বা দুটি ভুরুর নিচে নীল উজ্জ্বল চোখের তারা যেন ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। গায়ের পাশেই মীনুদি।

'আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে এখানে শুয়ে পড়ি।' মীনাক্ষীর গলা অসম্ভব চাপা, বড় মৃদু কিন্তু কাঁপা।

'ঘুমোবে ?' মীনাক্ষী যেন এক পা সরে এল, ওর নিশ্বাস বাসুর গাল ছুঁয়ে গেল।

'এখানে, এই ছাদে ! ঠাণ্ডা লাগবে তোমার।'

'লাগুক। শোবে ?' মীনাক্ষী একটু থেমে যেন বাসুর উত্তরের অপেক্ষা করতে করতেই কি ভাবল মনে মনে। আর হাসল নিজের মনে, কি ভেবে, বললে, 'ফাঁকা জায়গায় শুতে অনেকে ভীষণ ভয় পায়, আকাশ ভেঙে পড়বে যেন বুকে। পাগল ! ঘরের ছাদও তো ভেঙে পড়তে পারে। পারে না ?' শিসের মত সরু একটু হাসি, তারপর, 'চল, নিচেই যাই। ঘুম পাচ্ছে।'

দশ

অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সবাই চলে গেল একে একে। আটকে গেছে সুধা। ঠিক ছুটির মুখে মুখে সুপারিনটেনডেণ্ট হঠাৎ কতকগুলো খুঁটিনাটি জানতে ফাইলপত্র চেয়ে পাঠালেন। বার দুয়েক তলবও করেছেন নিজের কামরায়। বলা যায় না, ফাইলপত্র যখন এখনও ফেরত আসেনি, আরও দু চারবার কি না ডাকবেন কিংবা অন্য কোনও ফাইল চেয়ে না পাঠাবেন। অবশ্য অফিস ছুটি হয়ে গেছে, চলেও গেছে সকলে দু একজন ছাড়া, সুধা যদি চলেও যায় বলবার কিছু নেই। তবু এ-ভাবে কেউ যায় না, যেতে সাহস পায় না।

নিজের চেয়ার আর ছোট টেবিল আগলে কলমের গোড়া ঠোঁটে ঠেকিয়ে সুধা চুপ করে বসেছিল। কখনো বা আঁকিবুঁকি কাটছিল কাগজের ওপর। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল—অফিসের হলঘর ফাঁকা, দূরে এককোণে তখনও স্টোর সেকশনের বড়বাবু হেলানো আলো টেবিলের পাশে জ্বালিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে কাজ করছেন একমনে। আর একজনও রয়েছেন হলের উত্তর কোণে। চেয়ারে গা এলিয়ে মাথা কড়ি বরগার দিকে তুলে বোজা চোখে কী ভাবছেন যেন। ইনি অ্যাকাউণ্টেণ্ট। একটি দুটি চাকর বেয়ারা এদিক ওদিক যাওয়া আসা করছে।

হলঘরটায় অন্ধকার এসে গেছে এর মধ্যেই। আজকাল বেলা ছোট। সুপারিনটেনডেণ্টের ঘরে আলো জ্বলল। সহজে উনি আজ উঠছেন না বলেই মনে হয়। শোনা যাচ্ছে কার্ক এণ্ড্ হিল্টন কোম্পানীর ব্যবসা ফুলে উঠছে। ম্যানেজিং এজেণ্টসরা কলকাতা-বোম্বাই দৌড় ঝাঁপ করছেন। অটমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং গুড্সের পোয়াবারো অবস্থা। এই অফিসটা নাকি আরও বাড়বে, আরও লোক নেওয়া হবে।

সুধার মন শশকবৃত্তি করছিল। এই এখানে থেমেছে, একটা কথা

ভাবছে ; হঠাৎ পলকে অন্য জায়গায়, অন্য কথা ভাবছে তখন। অফিসের কথা ভাবতে বসে হঠাৎ বাড়ির কথা ভাবতে লাগল, আবার বাড়ির ভাবনাটা মাঝ পথে ফেলে রেখে টিউশনির কথা—কৃষ্ণা কাবেরীর কথা।

ভাবছিল আর থেমে থেমে, থেকে থেকে কাগজের উপর আঁকজোঁক কাটছিল। কাগজের ওপর যে একটা কিম্ভূতকিমাকার জন্তু কখন তৈরি হয়ে উঠেছে ও বুঝতে পারে নি, খেয়াল করে নি।

খেয়াল হল ডাক শুনে। একটু চমকেই উঠেছিল সুধা। ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠছিল আর কি, ভেবেছিল সুপারিটেনডেণ্ট ডাক দিয়েছেন আবার।

'এখনো বসে রয়েছেন!' বললে সুচারু। কাজ শেষ করে মুখে চোখে জল দিয়ে এসেছে ; ভিজে মুখ মুছছিল রুমালে।

সুচারুকে দেখে নিশ্চিত বোধ করলে সুধা। বললে, 'আমার ফাইল ফেরত পাই নি এখনো। যদি আবার ডাকেন—'

'আর ডাকবেন না। ওঁর টেবিলে ফাইল পড়ে আছে। কাল এসে আনিয়ে নেবেন। নিন্ উঠুন। ছটা বাজে।'

কলম আর কাঁচের পেপারওয়েট দুটো ড্রয়ারে পুরে সুধা উঠে পড়ল।

করিডোর দিয়ে আসতে আসতে সুধা প্রশ্ন করলে, 'সুপারিনটেনডেণ্টের ঘরে বাতি জ্বলছে আর আপনি যে চললেন বড়?'

'হুকুম নিয়েই যাচ্ছি।'

'কিসের এত চাপ পড়ল কাজের ওঁর!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কিসের যেন একটা এস্টিমেশন করছেন।'

'আমাদের অফিস নাকি আরও বাড়বে?'

'বোধ হয়।'

'লোকজন নাকি নেবে?'

'নিতে পারে দরকার হলে। তা আপনার তাতে কি লাভ!' সুচারু হাসল।

'না, এমনিই বলছি।' সুধা চোখ উঠিয়ে আবার নামিয়ে নিল।

'অফিস সম্পর্কে অতো কৌতূহল রাখবেন না তো। ঝানু কেরানীদের মতন খেতে বসতে শুতে খালি অফিস অফিস করলে দেখবেন অফিস ছাড়া জগৎ সংসারে চিন্তা করার মতন আর কিছু নেই।'

সুধা লজ্জিত হল। যদিও আর কিছু বললে না তবু মনে মনে ভাবল, অফিস আর মাইনে ছাড়া বাস্তবিক আর কি-বা সে চিন্তা করতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে মিশন রো'র মোড়ে এসে পড়েছিল ওরা।

'আপনি তো সোজা বাড়িই যাবেন?' সুচারু শুধোল।

'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোথায়—' সুধা বললে।

'আমি একটু এস্প্ল্যানেডের মোড় হয়ে যাব। একটা জিনিস কেনার আছে। খিদেও পেয়েছে খুব। চলুন না, একটু চা-টা খেয়ে এস্প্লানেড্ থেকে ট্রামে চলে যাব।

'আমি—!' সুধা কী বলতে চাইছিল কিন্তু বলতে পারল না। কেমন যেন কুণ্ঠা বোধ করছিল। সুচারুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে এবং এ-ভাবে সুচারুর সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে কোথায় যেন বাধছিল। বিব্রত মুখে দাঁড়িয়েছিল সুধা; স্পষ্ট কোনো জবাব দিতে পারছিল না।

'সর্বনাশ, আপনি যে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন দেখছি।' সুচারু সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, এত ভাববার কি আছে? চায়ের পয়সা নিশ্চয়ই দিতে বলব না, আমিই যখন ডাকছি—শুধু সঙ্গে যাবেন, বড়জোর আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নষ্ট।'

'আমি কি তা বলেছি।' সুধা আরও লজ্জিত, কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, 'সন্ধেবেলা দুটি বাচ্চা মেয়েকে পড়াই। রাত হয়ে গেলে—ওদেরই কষ্ট হয়।'

'কখন যান পড়াতে ?' সুচারু পথ হাঁটতে লাগল।

'সাতটার আগে হয়ে ওঠে না।'

'ও! এমন জানলে আপনাকে আটকাতুম না। কিন্তু—! আচ্ছা চলুন, আধঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব।'

রেস্টুরেণ্টে চা খেতে বসে সুচারু বললে, 'কলকাতার এই ঘোমটা টানা চেহারাটা কেমন লাগে আপনার ?'

'বিশ্রী !' ঠোঁট ওল্টায় সুধা।

একটু চুপচাপ। সুচারু বললে আবার, 'মাঝে মাঝে আমার তো সবই বিশ্রী লাগে, গোটা জগৎটাকেই।'

সুধা চোখ তুলল। সুচারুর এই বৈরাগ্য হঠাৎ যে কেন, না জানলেও এ ধরনের কথাবার্তায় বেশ মজা পায় সুধা। 'জগৎটা হঠাৎ আপনার কি করল !' বললে সুধা।

'আমার আর কী করবে—নার্ভগুলোয় টেন্‌শন বাড়ে এই যা ! সুচারু একটু হেসে হঠাৎ গম্ভীর, 'সত্যি, এই যখন দেখি ঢাকায় দাঙ্গা, ওখানে হরতাল, কটা লোক ছুরি খেয়ে মরল, প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে মারপিট—' অল্প ছেদ, আবার, 'ওদিকে হিটলার গলা ফুলিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে কত যেন বাইশ না পঁচিশ হাজার কামান, হাজার কুড়ি ট্যাংক, লক্ষ লক্ষ রুশ সাবাড় করেছে, বারোশো মাইল ধরে যুদ্ধ চলছে—তখন এইসব পড়ে, দেখে-শুনে মনে হয় ভগবান, কী জগতেই আমরা আছি। খাসা দুনিয়া।' কথা শেষ করে সুচারু বিষণ্ণ হাসি হাসল।

'ঢাকায় দাঙ্গাটা এখনো থামল না, সত্যি।' সুধা বললে যেন আলোচনায় তার অযোগ্যতা প্রকাশ না করতেই শুধু। এসব বিষয়ে তার কোন উৎসাহ নেই। নেহাত অফিসে বসে কাগজটা দেখেছিল, তাই বলতে পারল।

'থামবেও না। ও চলছে, চলবে। এমনি থামবে, যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি মাঝে মাঝে থেমে যায়, কিন্তু আকাশ মেঘে ভরা।'

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল সুচারু।

কথা বলতে বলতে ধর্মতলা স্ট্রীটে এসে পড়ল ওরা। সুচারু চোখ তুলে তাকিয়ে দোকানটা একবার খুঁজে নিল। তারপর এসে ঢুকল এক রঙের দোকানে।

সুধাও ঢুকেছিল। এবং ঢুকে অবাক হচ্ছিল, ভীষণ অবাক, সুচারু হঠাৎ রঙের দোকানে কি কিনতে ঢুকলো। আচ্ছা পাগল লোক তো!

সুচারু ততক্ষণে কথা বলছে দোকানদার ভদ্রলোকের সঙ্গে। তুলি আর রঙ নিয়ে। ক্রিমসন রেড, হোয়াইট, ব্ল্যাক।

সুধা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সুচারু তুলি, রঙ পরখ করছে, পছন্দ করছে।

কেনাকাটি শেষ করে পথে বেরিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরাল সুচারু।

'এসব কার জন্যে কিনলেন?' সুধা প্রশ্ন করলে।

'কেন, নিজের জন্যে—।'

মুখে আর কথা ফুটল না সুধার। সুচারু শব্দ না করে হাসছিল, সুধার বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে।

'অবাক হচ্ছেন কেন অত? সওদাগরী অফিসে চাকরি করি বলে আমার কি ছবি আঁকবার অধিকার নেই।' সুচারু ধোঁয়া ছাড়ল সিগারেটের, 'ট্রাম আসছে, আসুন ওঠা যাক।'

ট্রামে উঠে, লেডিজ সিটে সুধা বসতে পেল। পাশে জায়গা ছিল। সুধা এক পাশে সরে বসল। অর্থাৎ কি-না জায়গা দিল সুচারুকে। ভেবে চিন্তে কিছু করেনি সুধা, কেমন যেন স্বাভাবিক ভাবেই নিজের অজান্তে সব হয়ে যাচ্ছিল।

সুচারু বসল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল সুধা।

ওয়েলিংটনের মোড় ছাড়িয়ে যেতে আচমকা সুধা শুধোল, কার কাছে শিখলেন ছবি আঁকা?'

'ছেলেবেলায় শিখতাম মামার কাছে। তিনি ভাল আর্টিস্ট ছিলেন। তারপর মোটামুটি চর্চা ছিল বাড়িতেই। বি-এ পাশ করার পর আর্ট স্কুলেও পড়েছিলাম বছর দুয়েক। বাবা চোখ বুজলেন। ছেড়ে দিলাম স্কুল। ছবি এঁকে পেট ভরে না, তা ছাড়া আমি তো পাশ করা ছাত্র নয়—ওসব আর্টিস্টের চাকরিই বা আমার জুটবে কেন। কেরানীগিরি বরং জুটল। ভালই হল। পেশার সঙ্গে নেশার কোন সম্পর্ক থাকল না। অবশ্য গুরু আমার একজন আছেন এখনও।' একটু থামল সুচারু, বললে আবার, 'এক আধটা নেশা প্রায় সকলেরই থাকে, কারুর বাজনা, কারুর লেখাপত্র, নিদেনপক্ষে খেলাধুলো। আমার ছবি আঁকাও তেমনি। আঁকতে কি আর সত্যি সত্যি জানি—ওই নিজের মনকে ভাল লাগানো।'

কথা শুনতে শুনতে সুধা ঘাড় ঘুরিয়ে সুচারুকে দেখছিল। সুচারু থেমে গেলে এমন একটা বিস্তৃত এবং খাপছাড়া নীরবতা থাকল যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। সুধার পছন্দ হচ্ছিল না এই ছেদ, এই নীরবতা। সুচারুকে যেন কি একটা বলা দরকার। কোনও রকম কথা। কিন্তু কি বলবে সুধা?

'বাড়িতে আপনার কে কে আছেন?' হঠাৎ সুধা বললে।

'পিসিমা, একটি ভাই।'

'মা?'

'ছেলেবেলাতেই ও-পাট চুকিয়ে দিয়েছি।' সুচারু ম্লান হাসল।

একটু বেদনা বোধ করলে সুধা সুচারুর জন্যে।

'ভাই কি করে?'

'বি-এস-সি পড়ছে।'

সুধার হঠাৎ বাসুর কথা মনে পড়ল। অস্পষ্ট ভাবে একটা তুলনাও মনের মধ্যে চকিতে উঠে মিলিয়ে গেল।

বহুবাজারের মোড়ের আগের স্টপেজেই নেমে গেল সুধা।

এগারো

বাসু ফিরেছিল আশ্চর্য এক উত্তাপ আর উত্তেজনা নিয়ে। স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও অনুভব করতে পারছিল কেমন এক নতুন ধরনের জ্বালায় সে জ্বলছে। এমন অনুভূতি এই প্রথম। মনটা সব সময় ক্রীক রোর সেই সাজান গোছান ঝকঝকে বাড়িটার ছাদ, ঘর, বারান্দার এখানে ওখানে পড়ে আছে, পড়ে থাকছে। সর্বক্ষণ শুধু মীনুদিকেই মনে পড়ছে; মীনুদির মুখ, মীনুদির কথা। টুকরো টুকরো ঘটনা, মীনুদির কোন কোন কথা, কখনো কোন হাসি কী ভ্রূভঙ্গি বার বার মনে করতে হচ্ছে। এবং তাই নিয়ে ভাবতে ভাল লাগছে বাসুর। এ যেন এক নেশা। এমন নেশা, যার মধ্যে যত তলিয়ে যাও ততই সুখ। ততই অদ্ভুত স্বাদ।

এ-স্বাদের অনুভূতিটা কিন্তু কেমন বিচিত্র। কখনো মনটা হাওয়ার মতন হাল্কা হয়ে আসে, একটা সুখ সিরসির করে সারা গায়, এ কেমন এক আকুলি বিকুলি. কী যেন ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই ভাব। আবার কখনো হঠাৎ ভীষণ ভার হয়ে আসে মন, শক্ত পুরু হাতে কেউ যেন চেপে ধরেছে কিংবা একটা অদৃশ্য কোন ভার চাপিয়ে দিয়েছে। বুকটাও অস্বাভাবিক রকম ভারি হয়ে আসে। নিশ্বাস দীর্ঘ হয়, একটু কষ্টও। গা হাত শিথিল। কেমন এক শূন্যতা মেঘ করে আসা আকাশের মতন চেতনাটাকে গুমোট করে আনে। আবার কখনো এ-সব কিছুই নয়। সারা শরীর যেন আগুন ধরা, কোথায় একটা দপ্ দপ্, রক্ত যেন শিরায় শিরায় ফুটছে, ছুটছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে হৃদপিণ্ডে, ধক্‌ধক্ করে যাচ্ছে হৃদপিণ্ডটা, তারপর অকস্মাৎ নিমেষে সবটুকু রক্ত যেন শুষে নিয়ে উধাও। বুকটা কনকন করে ওঠে তখনই।

এই উত্তাপ আর উত্তেজনাটাই বেশি। বাসু এমনি এই উত্তাপেই

জ্বলছিল। ছটফট করছিল। সহজে আজকাল আর ঘুম আসত না, ঘুম আসুক তাও চাইত না। বরং ওই সময়টা মীনাক্ষীর কথা আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবত এবং অনেক কিছু অস্পষ্টভাবে কল্পনা করত। আর মনে মনে চাইত সারা রাত যেন মীনুদিব স্বপ্ন দেখে। বাসু শুনেছিল ঘুমোবার আগে কাউকে একমনে অনেকক্ষণ ভাবলে তাকে স্বপ্নে দেখা যায়। কথাটা বাসু বিশ্বাস করেছিল, কারণ প্রথম দিন সে মীনুদিকে ভেবেছিল অনেকক্ষণ এবং স্বপ্নও দেখেছিল। তারপর থেকে অবশ্য আর স্বপ্নে মীনুদিকে দেখা যাচ্ছে না—তার বদলে আজে বাজে কতকগুলো স্বপ্ন দেখেছে—কোনদিন পরী কি ডলি, ছড়ি, রাস্তার গলি, দরজা, হাঁড়িকুড়ি বাসনপত্র সাপ, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া—এমনি বাজে, অদ্ভুত জিনিস। একদিন দেখল পরী মীনুদির খাটে শুয়ে রয়েছে, আর একদিন দেখল গুব্‌দো মতন ডলিটা ওর হাত ধরে মাঠে বেড়াচ্ছে। বাসু তা বলে আশা ছাড়ল না। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে লাগল মীনুদিকে, মীনুদির গোটা শরীরটাকেই —তার চোখ, চুল, নাক, কান, হাত, হাতের আঙুল, ঠোঁট, শাড়ি, ব্লাউজ, কথা, কথার স্বর, হাসি, হাঁটা, বসা, চলা—সব, সমস্ত। কিন্তু মীনুদি আর স্বপ্নে আসছিল না।

ক্রীক রোর দুরন্ত তীব্র আকর্ষণ বাসু ঠেকাতে পারল না। আবার গেল। দুপুর করেই একদিন। মোহিত কাকা যখন বাড়ি থাকেন না। কে জানে কেন মোহিত কাকাকে তার গোড়াগুড়ি থেকেই অপছন্দ। চেহারা দেখে, কথাবার্তা শুনে প্রথম থেকেই তাঁর ওপর বিরূপ হয়েছে বাসু। কেমন এক কচ্ছপের মত চোখ, টাকের তলায় যেন ঘাপটি মেরে রয়েছে। ক্যাটকেটে কথা।

যে-দুপুরে বাসু এল ক্রীক রোর বাড়িতে, সে-দুপুরে মীনাক্ষী যাচ্ছিল ম্যাটিনী-শোয়ে সিনেমা দেখতে। সাজগোজ করে বেরুচ্ছে, এমন সময়। সঙ্গে এক রোগা মতন ছোকরা, খুব স্নো-পাউডার ঘষেছে

গালে, চোখে রোল্ড-গোল্ডের ফিনফিনে চশমা, সাজ পোশাক করেছে কাপ্তেনী ধাঁচে। তাকে দেখেই বাসুর মেজাজ চড়ে গিয়েছিল।

হাসি মুখে মীনাক্ষী বললে, 'এই দুপুরে হঠাৎ কি মনে করে ভাই। আমি যে সিনেমায় যাচ্ছি, ওর সঙ্গে। যাবে তুমি?'

মাথা নেড়ে সাফ না জানিয়ে দিল বাসু। তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যেন মীনাক্ষীর কাছেই আসে নি—দরকারী কোন কাজে এসেছে এমনি এক ব্যস্ত ভাব ফুটিয়ে বললে, 'কাকাবাবু কোথায়?'

'বাবা তো দেশের বাড়ি দেখতে গেছে।'

অবাক হয়ে বাসু বললে, 'তুমি একা?'

'তা এক রকম একাই।' মীনাক্ষী সেই রোগা মতন লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ও অবশ্য রয়েছে, কমল; আমার এক মামাতো বোনের বর ঃ ও রোজ এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। বাবা কাল পরশুর মধ্যেই ফিরবেন।'

'ও!' বাসু চুপ করে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে মীনুদির এক মামাতো-বোনের-বর কোথাকার এক কমল সম্পর্কে অদ্ভুত এক বিতৃষ্ণা এবং রাগ বোধ করছিল বাসু। লোকটার হাওয়ায়-উড়ে-যাওয়া-চেহারা আর সাজ পোশাকের পারিপাট্য দেখে হাসি পাচ্ছিল তার। বাসু ভাবছিল, লোকটা মেয়েমানুষেরও অধম। এই দিন-দুপুরে ক্রীম পাউডার ঘষেছে গলা ঘাড় অবধি, তেমনি ন্যাকা ন্যাকা চাউনি, আর কী-বা সাজগোজ। যেন জামাই ষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। একে খুব সম্ভব সেই লক্ষ্মী পুজোর দিন খেতে বসতেও দেখেছে বাসু। হ্যাঁ, সে-রকমই মনে হচ্ছে।

মীনুদি যে কেন ওর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে বাসু ভেবেই পেল না। মনটা মুষড়ে গেল। কোথায় বসে বসে দুটো গল্প করবে, তা না কোথাকার

কোন কমল এসে সব ভেস্তে দিল। মনে মনে অস্ফুট স্বরে কয়েকটা গালাগাল দিয়ে আক্রোশটা মিটোতে চাইল বাসু।

তখনকার মত আক্রোশ হয়ত মিটল কিন্তু স্বস্তি পেল না, পাচ্ছিল না বাসু। ছটফট করছিল। আর দিন গুনছিল কবে কালীপুজো আসবে। কবে।

আর একদিন সন্ধে করেই গেল বাসু ক্রীক রোয়ে। ওয়েলিংটনের মোড়ে বেঞ্চি পেতে চার সিভিকগার্ড মিলে ডিউটি দিচ্ছে। হঠাৎ বাসু আসছি বলে সাইকেল নিয়ে উধাও।

বাসুর বেশভূষা আর বুকটান ভঙ্গি দেখে মীনাক্ষী হেসে বললে, 'ও বাবা, এ-যে দেখছি একেবারে যুদ্ধের সাজ।'

বাসু সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, 'পরশু দিন সন্ধেবেলা তোমাদের এই রাস্তাটা দিয়ে বার দুয়েক গিয়েছি। সাইকেলের ঘণ্টি দিলাম কী জোরসে। শুনতে পাওনি?'

'কি করে বুঝব কোন্‌টা তোমার সাইকেলের ঘণ্টি, চিনে তো রাখি নি তার শব্দ কেমন,' মীনাক্ষী গলা বেঁকিয়ে ভুরু তুলে হাসল, 'সারাদিন কত সাইকেলই তো যাচ্ছে আসছে রাস্তা দিয়ে ঘণ্টি বাজিয়ে।' হাত বাড়িয়ে বাসুর খাকি শার্টের বুক থেকে একটা কুটো নখের ডগা দিয়ে ফেলে দিতে দিতে আবার বললে, 'চিনিয়ে দিয়ে যেয়ো তোমার ঘণ্টির শব্দ; শুনলেই সব কাজ ফেলে ছুটে এসে জানলায় দাঁড়াব।'

মীনাক্ষী মুখ গম্ভীর করে কথাটা বলেই একটু অপেক্ষা করল। বাসুকে দেখছিল। শেষে হেসে উঠল খিল খিল করে। বাসুও হাসল। লজ্জাও পেল বোধ হয়। মুখটা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

'তোমার ডিউটি দেওয়া শেষ হয়ে গেল?'

'শে—ষ! হুঁ! সবে শুরু। রাত দশটার আগে নয়।'

'তাই ন'কি! তবে যে এলে! পালিয়েছ বুঝি?'

'তা-ছাড়া আবার কি! কে-ই বা থাকছে সব সময়!'

'খুব ফাঁকি শিখেছ!' মীনাক্ষী কটাক্ষ করলে, 'মীনুদিকে দেখার নাম করে একবার বুড়ি ছুঁয়ে গেলে।'

হঠাৎ একটা পরিহাস মনে এসে গেল। বললে বাসু, 'তুমি কি বুড়ি নাকি?'

'বুড়ি নই!' বিস্ময়ের কৃত্রিম ভঙ্গি করলে মীনাক্ষী, 'কত বয়েস আমার জান?'

'জানি।'

'কত?'

'বাইশ।'

'কে বলেছে?'

'শুনেছি। মা বলছিল।' বাসু এদিক ওদিক তাকাল, 'এক গ্লাস জল খাওয়াও তো মীনুদি।'

নিজের হাতেই জল গড়িয়ে এনে দিল মীনাক্ষী। বাসু এক চুমুকে শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলে।

'একটু খাবার খাবে?'

'কী খাবার?'

'যা খাবে বল। আর না হয়—আমি যা দেব তাই খেতে হবে।'

চা আর খাবার খেতে খেতে আরও টুক টাক কথা হল। কোন্ কথায় কথা উঠতে বাসু বললে, 'জান মীনুদি, সেদিন তোমায় স্বপ্ন দেখেছি।'

'ওমা, তাই নাকি! কি দেখলে?'

'সে কত রকম। সব মনে নেই। খালি একটা জায়গা মনে আছে—। কোথায় যেন গিয়েছি আমরা, বড্ড অন্ধকার, ঘরদোর দেখা যাচ্ছে না। তুমি একটা মোমবাতি আমার হাত থেকে নেবার চেষ্টা করছ আর খালি

বলছ, বাতিটা জ্বালাও, জ্বালাও। আমি পকেট হাতড়েও দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না, অথচ কোথাও যেন আছে দেশলাইটা, বেশ বুঝতে পারছি তা।'

বাসু চুপ করল।

মীনাক্ষী একদৃষ্টে তাকিয়েছিল বাসুর মুখের দিকে। তেমনি ভাবেই তাকিয়ে থাকল আরও খানিক।

'মোমবাতিটা জ্বালালে না?'

'কি জানি। শেষ পর্যন্ত কি করলাম, মনে নেই।'

ওঠার সময় বাসু বললে, 'ভাল কথা, আমাদের পাড়ায় কালীপুজোর দিন ঠাকুর দেখতে যাবে নাকি?'

'না, ভাই। বাড়ির পাশেই তো পুজো হচ্ছে, ঠাকুব একটা দেখলেই হল।'

'তুমি যে বলেছিলে যাত্রা হবে, হচ্ছে নাকি এবার! আমাদের পাড়ায় হয়ত হবে না।' বাসু ঘুবিয়ে ফিরিয়ে আসল কথায় এল।

'হ্যাঁ—, হবে। আমাদের সেই সারা রাত যাত্রা দেখার কথা। ভুলে গেছ নাকি! আসবে কিন্তু। তুমি ববং সন্ধে করেই চলে এস। রাত্রে এখানেই খাওয়া দাওয়া করবে।'

বাসু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

মাসের কটা দিন উদগ্রীব হয়ে কাটিয়েছে বাসু। দিন গুনে গুনে। অনেক বারই ইচ্ছে হয়েছে মীনাক্ষীর কাছে চলে আসে। কিন্তু আসে নি। অত ঘন ঘন গেলে মীনুদি কী ভাববে, বাসু মনে করত। আর এ-টুকু বেশ বুঝতে পারত, মীনুদি যাই ভাবুক, অত ঘন ঘন যাওয়ার মধ্যে কেমন এক লজ্জা আছে। তা ছাড়া, বলা যায় না, মোহিতকাকার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, যা বাসু পারতপক্ষে চায় না।

বাড়িতে রত্নময়ীর কাছেও বাসু ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে নি ক্ষীক রোয়ে

সে মাঝে মাঝে যাচ্ছে। কারুর কাছেই নয়। এমন কি যার কাছে সব কথা না বললে ওর পেটের ভাত হজম হয় না, প্রাণের বন্ধু সেই গৌরাঙ্গর কাছেও বাসু মীনাক্ষী সম্পর্কে একটি কথাও বলে নি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত বলে, বলে ফেলে কিন্তু কোথায় যেন আটকাত।

কালীপুজোর দিন পাড়ার পুজো মণ্ডপে খানিকটা মোড়লি করে বাসু সটান ক্রীক রোর পথে পা বাড়িয়ে দিল। ও জানত, রত্নময়ীকে আজ তার কিছু বলার দরকার হবে না। তিনি জানেন, পাড়ার আর দশ জন ছেলের মতন আজকের রাতটা ওর হয় মণ্ডপে না-হয় নন্তুদের বাড়ির বৈঠকখানায় তাস ক্যারাম খেলে হৈ চৈ করে খবরদারিতে কাটবে। প্রতি বছরই তাই কাটে।

নিশ্চিন্ত মনে বাসু মীনাক্ষীদের বাড়ি এসে পৌছল। তখন আটটা বেজে গেছে।

মীনাক্ষী যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। বললে, 'এসেছ, আমি ভাবলুম বুঝি পাড়ার পুজোয় মেতে গেলে। চল খাওয়া দাওয়া সেরে নি আগে!'

খাওয়া দাওয়া সেরে সেই ঘরটিতে এসে বসল ওরা। ঘরের বাতিটা জ্বলছে। কালো পেস্টবোর্ডের ঢাকনা পরানো। দেওয়ালগুলো ছায়া মোড়া। ঘরের মেঝে আর বিছানার খানিকটা অংশ আলোয় ধবধব করছে।

'কাকাবাবু বাড়ি নেই?' বাসু হঠাৎ প্রশ্ন করলে। আসা পর্যন্ত মোহিত-কাকার কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিল না ও।

মীনাক্ষী পানের গোল কৌটো থেকে পাতলা মতন সুগন্ধি একটা পান তুলে নিচ্ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমে প্রশ্ন করলে, 'পান খাবে একটা? খাও, আমিও তো খাচ্ছি।' হাত বাড়িয়ে পান দিচ্ছিল মীনাক্ষী। দিতে দিতে বললে, 'বাবা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি গেছেন। নেমন্তন্ন আছে। কখন ফিরবেন ঠিক নেই কিছু।'

কৌটোটা বিছানায় রেখে মীনাক্ষী বললে, 'তুমি বস, আমি আসছি।'

জানলার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে বাসু যাত্রার আসর দেখতে লাগল। নিচে ছোট মতন এক ফালি মাঠ, কারুর কেনা জমি পড়ে আছে হয়তো, তিনদিকেই তার বাড়ি ঘেরা। লম্বা লম্বা তেরপল দিয়ে মাঠটা ঢাকা হয়েছে। কাঠের ঠেকা তো আছেই। তার ওপর মুখোমুখি বাড়ির রেন্-পাইপ, ছাদের খাঁজ কাটা আলসে, কোন কোন বাড়ির জানলার গরাদে তেরপলের প্রান্তভাগের দড়িগুলো বাঁধা। রাস্তার দিকটাও ঢেকে দেওয়া হয়েছে, সরু মতন একটু পথ রেখে। জব্বরভাবে ঢেকেছে সব—কোথা দিয়েও একটু আলো বেরুবার পথ নেই। ব্ল্যাক্-আউটের নিয়ম কানুন মেনেও ছোট্ট আসরটি বেশ সাজিয়ে ফেলেছে। আর হ্যাঁ, মীনুদি যা বলেছিল তা ঠিক। এই দোতলার জানলায় বসে স্পষ্ট সবই দেখা যাচ্ছে। এ-বাড়ির জানলার মতন সব বাড়ির জানলাই খোলা। কত মুখ সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বাসু বুঝতে পারল, পাড়ার মেয়েরা অনেকেই যাতে ঘরে বসেই দেখতে পায় তাই বুঝে এমন ব্যবস্থা। তাই অত উঁচু করে—দোতলাব জানলারও ওপর দিয়ে তেরপল ফেলা হয়েছে।

আসরে তখন হারমোনিয়াম, ক্ল্যারিয়োনেট, বেহালা, ডুগি তবলার কনসার্ট চলেছে। কেউ ঢুকছে, কেউ বসছে, কটা ছেলে মোড়লি করছে। গোলমাল, হৈ চৈ। নিজেদের পাড়ার যাত্রার কথাই বাসু ভাবছিল, এ-সব দেখতে দেখতে। তাদের পাড়ায় এর চেয়েও বড় আসর বসে। এবারে ব্ল্যাক-আউটের ঠেলাতেই এক রকম বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এদের মতন বাড়ি-ঘেরা মাঠ পেলে অবশ্য বন্ধ করার কথাই উঠত না। যাত্রার পয়সায় এবার বাসুরা ভিখিরী খাওয়াবে।

ঘরের বাতিটা হঠাৎ নিভে যেতে বাসু অন্ধকারেই মুখ ফেরাল।

'কি, আর কত দেরি? দশটা যে বাজতে চললো!' অন্ধকারেই মীনাক্ষীর গলা শোনা গেল। বিছানায় এসে বসল ও।

'দুটো ঘণ্টা ঠুকে দিয়েছে।' বাসু নড়ে চড়ে বসতে বসতে জবাব দিল।

বাসুর গায়ের পাশ দিয়ে ঝুঁকে মীনাক্ষী তাকাল। সুন্দর একটা গন্ধ লাগল বাসুর নাকে। মীনাক্ষীর চুলের তেলের হতে পারে, কিংবা পাউডারের, সেণ্টের ফিকে গন্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়।

এই অন্ধকার এবং এই গন্ধ বাসুর শরীরটাকে কেমন আড়ষ্ট করে দিল।

আসরটায় চোখ বুলিয়ে মীনাক্ষী অন্য অন্য বাড়ির খোলা জানলাগুলো দেখছিল। বেশির ভাগ বাড়িরই ঘরের আলো নিভনো। জানলার কাছ ঘেঁষে গরাদে মুখ ঠেকিয়ে যারা বসে আছে, আসরের আলোয় তাদের মুখ এক রকম স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বাতি জ্বলছে যে-সব ঘরে, সে-সব ঘরের আলো-জড়ানো জায়গার খাট, মানুষ, চলাফেরা আরও স্পষ্ট। মীনাক্ষী ওদের কারুর কারুর পরিচয় বাসুকে শোনাতে লাগল, কার বা সেদিন বিয়ে হয়েছে, কে-বা বি-এ পড়ে, ফিল্মের নন্দিতা কার দাদার মাসতুতো শালী হয়, কার সঙ্গে বা মীনাক্ষীর খুব ভাব।

দেখতে দেখতে বাসু প্রশ্ন করলে, 'বাতি নিভিয়ে বসে আছে কেন সব?'

'না, নিভোলে দেখছ না ঘরের সমস্ত দেখা যায়। তা ছাড়া অযথা বাতি জ্বালিয়ে লাভ। অন্ধকারে বসে দেখতেও যে ভাল লাগে।'

কথাটা ঠিকই। বাতি না নিভোলে ঘরের সমস্ত দেখা যায়।

বাসু চুপ করে ছিল। মীনাক্ষীই হঠাৎ একটি বিশেষ জানলার একটি মেয়ের দিকে বাসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, 'ওর নাম কি জান, পাখি।'

'পাখি!' বাসু রোগা লম্বা ফর্সা মতন একটি মেয়ের হাঁটু গুটিয়ে বসা চেহারা দেখতে দেখতে বললে, 'পাখি আবার নাম হয় নাকি?'

'কেন হবে না, নাম সবই হয়। ওই পাখি কি করেছিল জান, গত বছর এমন দিনে।'

'কি?'

'আফিং খেয়েছিল মরবে বলে।'

'আফিং খেয়েছিল—' বাসু অবাক সুরে প্রশ্ন করলে, 'কেন?'

'সে এক কাণ্ড।' মীনাক্ষী একটু থামল, মনে হল যেন ঘটনাটা ভেবে হাসছে ভেতরে ভেতরে। বললে, 'ও একটা ইস্কুলে নাচ শিখত। সেখানকার এক মাস্টারকে ভালবেসেছিল— একটু চুপ, মীনাক্ষী যেন বাসুকে বুঝতে সময় দিচ্ছে আর অন্ধকারেই লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছে কিছু, 'সেই মাস্টারকেই ও বিয়ে করবে; মা-বাপ দেবে না। মাস্টারটা আবার কায়স্থ, মেয়েরা বামুন। এই নিযে মেয়েব জেদ, বাড়িতে রাগারাগি। ঠিক আজকের দিনেই বুঝি কিছু হয়েছিল সকালে। এমন চাপা মেয়ে—সারাদিন কিচ্ছুটি বলে নি। মনে মনে ঠিক করেছে যা করবার। সবাই যখন যাত্রা দেখছে—কোন ফাঁকে একা ছাদে গিয়ে আফিং খেয়েছে।'

'বাড়ির লোক জানল কি করে?' বাসু রীতিমত আগ্রহ অনুভব করছিল।

'জানল!' মীনাক্ষী এমন ভাবে ছেড়ে, মধ্যেব অক্ষরে জোর দিয়ে এবং শেষের অক্ষরে একটা নিশ্চিত টান দিয়ে কথাটা শেষ করলে, যার অর্থ— জানতে পারল কোন রকমে।

খানিক চুপ থেকে মীনাক্ষীই আবার বললে, হাল্কা সুরে, পাতলা হাসি হেসে, 'আমার যদি কোনদিন মরতে ইচ্ছে করে. আফিং টাফিং আমি কিছুতেই খাচ্ছি না। তার চেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়া ভাল।'

'তুমিই বা মরবে কেন?' বাসু বললে। মীনাক্ষীর মুখে চোখ রেখে।

মীনাক্ষী যেন এই প্রশ্নটার প্রত্যাশাই করছিল। জবাব দিল, 'তা কি বলা যায়। ইচ্ছে তো হতে পারে। পাখির মতন।'

'পাখির মতন!' অন্ধকারেই বাসুর অবাক-চোখের তারা তীব্র দেখাচ্ছিল।

'তো কি, পারে না। আমিও যদি কাউকে—।' মীনাক্ষী ইচ্ছে করেই থেমে গেল। গলায় উদাস স্বর ফুটিয়ে হঠাৎ যেন সেই উদাস রেশটুকু আরও ছড়িয়ে দেবার জন্যেই কথা না বলে চুপ করে গেল।

আর কেউ কথা বলছিল না। মীনাক্ষী মাথাটা একপাশে একটু হেলিয়ে জানলার গোটান শাসির কাঁচে চোখ রেখে বসে। বাসুর গালের কাছে একরকম চাপা উষ্ণ নিশ্বাস এসে লাগছে। মিষ্টি একটা গন্ধও। মীনাক্ষীর কাঁধের পাশ থেকে আঁচলটা খসে বাসুর হাতে পড়েছে। ওর পিঠে মীনাক্ষীর গা আলতোভাবে ছোঁয়া। বাসু তা অনুভব করতে পারছিল। আর সিরসির করছিল তার গা।

আসরে আবার ঘণ্টা বেজে গেল। দুজনেই যেন মনের মধ্যে চমকে উঠে নিচে তাকাল।

নিচে তখন হট্টগোলটা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। বস বস, সর সর, চুপচুপ রব। কনসার্ট থেমে গেছে। বেহালাটা শেষবারের মত বার কয়েক ককিয়ে উঠে থামল।

'কি বই হচ্ছে তোমাদের?' বাসু নড়ে চড়ে জানলার দিকে ঝুঁকে পড়ে শুধোল।

'কি জানি কী হবে। একবার শুনলাম 'কুরুক্ষেত্র', একবার শুনলাম 'উষা-হরণ।' মীনাক্ষীও পা গুটিয়ে বাসুর পাশে ভাল হয়ে বসল।

যাত্রা শুরু হতেই টুক্ টুক্ করে সমস্ত জানলার বাতিগুলো নিভে আসতে লাগল। আসরে ঢুকল একদল সখী। সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম বেজে উঠল, বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, ডুগি তবলা। নূপুরের রুন ঝুন। সখীরদল গান ধরলে। নাচতে লাগল আসরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে সার বেঁধে। গানের মাঝপথে এসে ঢোকে রাজকুমারী, সঙ্গে সহচরী।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল পালাটা হচ্ছে উষা-হরণের।

এককালে দলটার নাম ছিল। এখন পড়তির মুখ। এক অনিরুদ্ধ ছাড়া

কারুর পার্টই তেমন জমছিল না। উষাকে অবশ্য মোটামুটি মানিয়েছিল ভাল। মোটা দশাসই চেহারার একটা লোক দানবরাজ বাণ সেজে প্রচণ্ড হুঙ্কার করছে আর মাঝে মাঝে অট্টহাস্য হাসছে।

রাত যতই বাড়ছে ততই চুপ-হয়ে-আসা আসর আর আশপাশের নিস্তব্ধতার মধ্যে কুশীলবদের কণ্ঠস্বরের উঁচু পর্দা, কেমন এক অদ্ভুত শোনাচ্ছিল। উজ্জ্বল আলোর তলায় ঝুটো জরির রকমারি রাজসাজ ঝিকমিক করছিল। মাঝে মাঝে বিবেকের গান, চড়া পর্দায়, তত্ত্ব মেশানো। বিচিত্র সে স্বর।

মাঝখানে মীনাক্ষী একবার উঠে গিয়েছিল। ফিরে এসে বসল আবার। নিজে থেকেই বললে, বাবা ফিরে এসে শুয়ে পড়েছেন।

বাসু বললে, 'এক গ্লাস জল খাওয়াও, মীনুদি ?'

'জল খাবে না চা ?'

'চা ?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে তাও খেতে পার। তৈরি করাই আছে ফ্লাস্কে।'

'ওরে বাস, তুমি রাত জাগার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছ দেখছি। না, জলই দাও।'

জল খেয়ে বাসু একটু গা এলিয়ে বসল। মীনাক্ষী জানলার দিকে মুখ করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বুকের তলায় বালিশ। মুখটা উঁচু করে রাখল কনুই ভর করে, দু হাত দু গালে রেখে।

'এখনও উষা হরণ হল না ?' মীনাক্ষী হেসে বললে।

'হুত্ ! বেটা নিজেই বন্দী হয়ে এখন বাপ ঠাকুর্দাকে ডাকছে। বুঝলে মীনুদি, বই চয়েস্টা তোমাদের বাজে হয়েছে।'

'তোমার কাছে তো তরোয়াল ঘুরিয়ে যুদ্ধ করলেই ভাল। খারাপ কি এটা—উষাকে দেখে অনিরুদ্ধ ভালবেসে ফেলেছে। তাকে দৈত্য বাপটার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চায়।'

'যাবে তো যাক না, সে মুরোদই নেই। খালি মেয়ে মানুষের মতো কাঁদছে আর কপাল চাপড়াচ্ছে। যাই বল বাপু, তোমার অনিরুদ্ধর কোন ক্ষমতাই নেই।'

'থাক্, থাক্। নিজের তোমার কত ক্ষমতা! তুমি হলে পারতে!' মীনাক্ষী একপাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। বাসুর দিকে ওর মুখ।

এমন আচমকা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না বাসু। এতক্ষণ গা-এলিয়ে ছিল। সোজা হয়ে বসল।

'আবার বসছ কেন, যাত্রা তোমার ভাল লাগছে না, শুয়ে পড় তার চেয়ে।'

বলতে কি, বসে থাকতে থাকতে পিঠ পা ধরে এসেছিল বাসুর। তারপর সারাটা দিনই আজ পুজোতে কম খাটে নি বাসু। কাঁধ হাত সবই ব্যথা ব্যথা করছে। গা-হাত ছড়িয়ে খানিকটা শুতে পারলে মন্দ হত না। যাত্রাটাও তেমন ভাল লাগছে না। শুতে পারলে খানিকটা আরাম হত। কিন্তু কি করে শোয় বাসু মীনুদির পাশে।

একটুক্ষণ উসখুস করে বাসু বললে, 'ঠিক আছে। দেখিই না শেষ পর্যন্ত, মাঝরাত তো জেগেই কাটল।'

'তবে তুমি দেখ, আমি বাপু একটু ঘুমিয়ে নি।' বলার সঙ্গে সঙ্গে গা-হাত নেড়ে চেড়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মীনাক্ষী। হাত দুটো বুকের ওপর রাখলে। জায়গা বদল করলে না, তেমনি জানলার দিকেই বালিশটা থাকল, আড়াআড়ি শুয়ে পা গুটিয়ে নিল, পা ধরছিল না খাটে।

বাসু মীনাক্ষীর মাথার কাছটিতে বসে। জানলা দিয়ে যদিও যাত্রার আসরের দিকে তাকাচ্ছিল ও তবু এই অন্ধকারে, অস্পষ্ট একটু আলোর আভাস-আসা ঘরে বার বার ওর চোখ মীনাক্ষীর মুখে এসে পড়ছিল।

মীনুদি ঘুমিয়ে পড়েছে—খানিক পরে বাসুর মনে হল। চোখের পাতা

বন্ধ, গভীর নিশ্বাসের সুন্দর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। গা-হাত-পা কিছু আর নড়ছে না। বুকটা শুধু উঠছে নামছে, ধীরে ধীরে।

কেমন এক আকুলতা আর বিস্ময় নিয়ে বাসু সামান্য আলো-আভাস ঘরে মীনাক্ষীকে দেখছিল এক দৃষ্টে।

চোখ না চাইলে কেমন যেন অন্য রকম মনে হয় মীনুদিকে—বাসু ভাবছিল। কেমন যে, কি রকম তা ঠাওর করতে পারছিল না। তবে চোখের পাতা বুজলে অনেক কিছু যেন হারিয়ে যায়। মুখের মধ্যে একটা দুঃখ দুঃখ ভাব।

গাল, নাক, ঠোঁট,- সমস্তই আলাদা আলাদা করে বাসুর চোখে পড়ছিল। আর গলা, হাত। শরীরের সেই আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গির সবটাই।

এমন সময় সামান্য একটু নড়ে উঠল মীনাক্ষী। পাশ ফিরে গেল, বাসুর দিকে মুখ করে। আঁচলটা বুক থেকে সরে গেল। আলগা হল। ঘুমের ঘোরে শিথিল একটি হাত অলস ভাবে ছড়াতে গিয়ে বাসুর হাঁটুর ওপরে পড়ল।

পড়ল তো পড়লই, আর নড়ে না। মুঠো খোলা মোলায়েম হাত। বাসুর গা সিরসির করে কাঁটা দিয়ে গেল। ক টা স্নায়ু পায়ের মাংসপেশীর মধ্যে দপ্ দপ্ করে থেমে গেল। বুকটাও কেমন করছে। গুর্ গুর্। চোখ, কান গরম হয়ে আসছে।

বাসু ভাবছিল, হাতটা ছোঁবে। এক টুকরো দুরন্ত লোভ অন্ধকারে যেন চুম্বকের মতন আকর্ষণ করছে। ছোঁবে না কি বাসু? যদি ছোঁয়, আর ভেঙে জেগে ওঠে মীনুদি; তবে? কি ভাববে? .ট কষ্ট

বাসু একটা যুক্তি খুঁজছিল মনে মনে। হাতটা ও সরিয়ে দিল। আস্তে করে: মীনুদি যদি জেগে ওঠে, বাসু বলতে পাচ্ছিল। সুধার আর সত্যি, হাতটা সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। সুধা, 'তোকে সাহস হচ্ছিল না, সাহস আনার চেষ্টা করছিল বসবি।'

নিজের কানে ওর নিশ্বাসের দ্রুত শব্দ অদ্ভুত শোনাচ্ছিল, হাত কাঁপছিল, থর থর করছিল ঠোঁট,—তবু কখন যেন মীনুদির মুঠো বাসু তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। তালুতে নরম অথচ কিসের এক আঁচ লাগছে।

মীনুদি অসাড়। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

মুখটা একটু নিচু করলে বাসু। খোপার গন্ধ ভুরভুর করে উঠল। না খোপার নয়, সেন্টের। মীনুদির জামায় শাড়িতে কোথাও এক সুন্দর গন্ধ ছিটনো আছে। সর্বাঙ্গে যেন।

গন্ধটা বাসুর চেতনাকে অবশ করছিল। আর সেই অবশ মুহূর্তে বাসু সমস্ত ভুলে যাচ্ছিল; চোখের মনের রাস্তা থেকে সব সরে যাচ্ছিল, শুধু একটি অস্পষ্ট মুখ, দুটি পুরু ঠোঁটের সুন্দর নেশা। এবং মোহ।

হঠাৎ চমকে উঠল বাসু। ভীষণ ভাবে। বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠল। সারা গা বয়ে চকিতে একটা সাপ যেন জড়িয়ে সরে গেল।

মীনাক্ষী বাসুর মুঠো থেকে হাত ছাড়াবার জন্যে আলতো একটু টান দিয়ে যেন ঘুমের ঘোরে অস্ফুট, নেশা মাখানো সুরে বললে, 'শীত করছে। নিচের পাটটা ভেজিয়ে দাও জানলার।'

বাসুর যখন একটু একটু চেতনা ফুটছে—ঘুম ভেঙেও না-ভাঙার কুয়াশা, বাসু চোখ খুলতে পারছিল না, শুনল মীনুদি যেন বলছে, 'উষাহরণ শেষ হয়ে গেল।'

আড়আর বাসু সেই অর্ধস্ফুট চেতনায় অনুভব করতে পারছিল মীনুদি বিছানা বাসুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

যাত্রার আসৎ সকাল হচ্ছে! অন্ধকার মুছে আকাশ কি ফরসা হচ্ছিল! আলোর আভাতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। অদ্ভুত এক সুখ আর ঘুম আর আলস্য পড়ছিল। রছিল।

মীনুদি ঘুমিয়ে

বারো

প্রথম শীতে কি ভাবে যেন ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাঁধিয়ে বসেছিল সুধা। জ্বর গায়েই অফিস গিয়েছিল প্রথম দিন। পরের দিন আর পারল না। তার পরের দিনও। সারা গায়ে বুকে যত যন্ত্রণা তত অসহ্য মাথা ধরা। গা পুড়ে যাচ্ছিল। কাশির দমকে গলার শিরা ফুলে লাল হয়ে উঠেছে।

জ্বর যন্ত্রণার জন্যে সুধার কষ্ট ছিল, দুশ্চিন্তা ছিল না। যত দুশ্চিন্তা অফিসের জন্যে। নতুন চাকরি। কামাই হলেই ভয় করে। অস্বস্তি বাড়ে। ছুটি-ছাটা পাওনার কথা এক বচ্ছর পরে। ক্যাজুয়েল লীভ, তাও বা কদিন পেতে পারে সুধা, বড় জোর চার পাঁচ দিন। এর মধ্যে যদি জ্বর না ছাড়ে, অফিস যেতে না পারে সুধা—মাইনে কাটা যাবে।

অফিসে একটা চিঠি পাঠানোর জন্যে বাসুকে খুঁজলো সুধা; দ্বিতীয় দিনে। বাসু ঘরে নেই। কোন দিনই থাকে না এমন সময়। বেলা একটা নাগাদ তার টিকি দেখতে পাওয়া গেল। সুধা তখন জ্বরের ঘোরে, মাথার যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

রত্নময়ী এসে বললেন 'চিঠি দিবি নাকি?'

কথা বললে না সুধা। শুধু মাথা নেড়ে, যন্ত্রণা বিকৃত মুখ তুলে জানাল, না চিঠি দেবে না।

দুপুরে আরো দুটো ইনফ্লুয়েঞ্জা আর অ্যাসপ্রিন ট্যাবলেট খেয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকল সুধা কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

বিকেলের দিকে মাথাটা খানিক ছাড়ল। সর্দিতে যদিও কপাল কট্ কট্ করছে, গলা বসে গেছে। জ্বরের ঘোরটাও কেটেছে বলে মনে হচ্ছিল।

রোজকার মতন পোশাক চড়িয়ে বাসু ডিউটি দিতে বেরুচ্ছিল। সুধার ঘরে ঢুকতেই লাল ছলছল ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে বললে সুধা, 'তোকে সকালে বলেছিলাম না আমার অফিসে একটা চিঠি দিয়ে আসবি।'

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাসু মুখ ঘুরিয়ে সুধার দিকে একটিবার তাকিয়ে নিল। 'বললাম তো মাকে।'

'বললি আবার কী, বেলা দুপুরে আড্ডা মেরে ফিরে তবে মনে পড়ল। তখন চিঠি পাঠিয়ে লাভ।'

'মনে ছিল না।' বাসু তার অপরাধস্খালনের অত্যন্ত সহজ, সরল, স্পষ্ট জবাব দিলে।

সুধা ভাইয়ের এই কাটছাঁট জবাবে অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। শেষে বললে কটুকণ্ঠে, 'তা মনে থাকবে কেন। চাকরিটা যাক্—দুবেলা যখন ডাল ভাতও জুটবে না তখন মনে পড়বে।'

কথাটা যেন শুনেও শুনল না বাসু। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাসুর এই ব্যবহার সুধাকে দিন দিন পীড়িত অধৈর্য করে তুলছে। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। সুধা ভেবেই পায় না, ষোল সতেরো বছরের সবল সুস্থ একটা ছেলে কি করে এমন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিন কাটাতে পারে। এতটুকু তার ভাবনা হয় না মা-বোনের জন্য। এমন কি, সবচেয়ে এইটেই আশ্চর্যের বিষয় যে, বাসু ওদের—ওকে, মাকে—আজকাল সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। সুধার চিঠি নিয়ে যায় নি, তারজন্য একবিন্দু যদি ভাবনা থাকে ওর। যায় নি, যায় নি– বেশ করেছে, এমন ভাব যেন।

ভাবতে বসলে মনে হয়, মা যথেষ্ট আশকারা দিয়েছে এই ছেলেকে। ছেলেবেলা থেকেই আরও কড়া শাসন করা উচিত ছিল। শুধু মুখে নিষেধ শোনার মতন ছেলে ও নয়। আর বাবাও বাসুর দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখেন নি। ছেলে, ছেলে— ; পড়াশুনো করবে, খাবেদাবে, খেলাধুলো করবে— এইসব। তাকে নজরে রাখা দরকার বাবা তা মনে করেন নি। বরং মেয়েদের তবু কাছেটাছে ডাকতেন, আদরটাদর করতেন। অবশ্য পড়াশোনার ব্যাপারে সুধার নিজের গা ছিল, গরজ ছিল। আর বাবা কখনই তাতে অনুৎসাহ দেখান নি। বাসুর ও-সবের বালাই ছিল না। বাবাও কিছু বলেন নি।

কিন্তু এমনিভাবে কতদিন চলবে? সুধা ভাবছিল। কতকাল সুধা এই বুড়ো মন্দ ভাইয়ের ভার ঘাড়ে করে টানবে। আর এমনি মজা, যে বোনের চাকরির ক'টা টাকার ওপর ওদের সকলের পেট সম্বল—বাসু সেই চাকরি সম্পর্কেও নিরুদ্বিগ্ন। নয়তো এমন অবহেলা কি সম্ভব।

বাসু দিন দিন আরও বদলে যাচ্ছে। বড় তাড়াতাড়ি। সহজেই চোখে পড়ে সে পরিবর্তন। সুধাও লক্ষ্য করেছে। বাসুর বাবুয়ানি আজকাল বেড়েছে। কোথা থেকে টাকা পায় ও সুধা জানে না। তবে সিভিক গার্ডের সাড়ে পনেরো টাকার চাকরির দাপট এত হতে পারে না। সেই সাড়ে পনেরো টাকা তো বাসুর চা বিড়ি সিগারেটে যায়। তার ওপরও টুকটাক আছে কত। একটা পয়সাও বাড়িতে দেয় না। কখনো যদি এটা ওটা আনে, মা বললে, তবে আলাদা। কিন্তু সেই ছেলে সেদিনও একটা ফুলপ্যান্ট করিয়ে আনল, হাফশার্ট নীল রঙের। মাথায় মাখার জন্যে এক শিশি গন্ধ তেলও। নিজেকে ফিটফাট ঝকঝকে রাখার ওপর আজকাল ওর বেশ নজর পড়েছে। অল্প কিছুদিন হল। কেন যে, সুধা বুঝতে পারে না।

তেমনি আর একটা জিনিসও দেখছে সুধা আজকাল বাসু বাড়িতে তাদের সঙ্গে, তার কথা না হয় বাদই দিল,—মা আরতির সঙ্গেও বেশি কথা বলে না। কেমন যেন চুপচাপ থাকে।

ভাইয়ের কথাই ভাবছিল সুধা, স্পষ্ট কোন খেয়াল ছিল না, বিকেল মধ্যে শীতের সন্ধে শুরু হয়েছে; হাল্কা অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ।

গা ধুয়ে রত্নময়ী কাপড় ছাড়তে ঢুকেছিলেন ঘরে। সন্ধে দিয়ে ঠাকুর প্রণামও শেষ করলেন। ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে কাছে এলেন সুধার। কপালে বুকে হাত দিয়ে উত্তাপটা দেখলেন।

'কিছু খাবি এখন?' রত্নময়ী মেয়ের বুকের ওপর কাঁথাটা টেনে দিতে দিতে বললেন।

'না, জিবে রুচি নেই। বরং একটু আদা-চা খেলে হয়। গলা বুজে আসছে।'

'তা খা না—ভালই তো।' রত্নময়ী চলে যাচ্ছিলেন।

'আচ্ছা মা!' সুধা ডাকল। রত্নময়ী ফিরে দাঁড়ালেন, 'বাসুকে একদিন মোহিতকাকার বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতে বল কি হল। একবার চোখের দেখা দিয়ে এলেই কি চলে! মাঝে মাঝে যেতে হয়।'

'গিয়েছিল একদিন।' রত্নময়ী হতাশ গলায় বললেন, 'দেখা পায় নি।'

হুড়মুড় করে আরতি এসে ঢুকল এমন সময়। হাঁপাচ্ছে। যেন এক নিশ্বাসে সব কটা সিঁড়ি ভেঙে ছুটে উঠে এল। 'দিদি, একজন লোক তোমায় ডাকছে?'

কথাটা প্রথমে সুধার কানে কোন অর্থ বোঝাল না। তারপর যেন বুঝল সুধা। আর অসম্ভব অবাক হয়ে ছোট বোনের মুখের দিকে তাকাল। 'আমাকে ডাকছে—! কে ডাকছে? আমায় কে ডাকবে!' সুধার গলায় সন্দেহ।

'হ্যাঁ, তোমায়। তোমার নাম বললে। অফিস থেকে আসছে।'

অফিস শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধক্ করে উঠল সুধার। কে এসেছে? সুচারু নাকি? হঠাৎ। দুঃসংবাদ আছে নাকি কিছু। সুচারুই বা আসতে যাবে কেন? ঠিকানা পেল কি করে? 'নাম বলে নি?' সুধা জানতে চাইল।

'না।' আরতি মাথা নাড়ল। আসলে নাম বলবার সুযোগ না দিয়েই ও ছুটে এসেছে ওপরে।

'কেমন দেখতে?'

'ফর্সা মতন, সুন্দর।'

সুচারু বলেই মনে হচ্ছে। সুধা হঠাৎ সঙ্কুচিত আড়ষ্ট হয়ে উঠল। অস্বস্তি বোধ করছিল। মার মুখের দিকে একটিবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। এবং ভাবছে কি করবে।

'ওপরে নিয়ে এসে ও ঘরে বসা।' গলাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললে সুধা, একটু বিরক্তি ফুটিয়ে, যেন মার কানে যায়।

আরতি চলে গেল।

'ও-ঘরে বসাতে বললি কেন? জ্বর গায়ে নাড়া লাগাবি আবার?'

'তা হোক।' সুধা ছোট্ট করে জবাব দিলে।

যা ভেবেছিল সুধা। সুচারুই। আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে ঘরে ঢুকতেই সুচারু তাকিয়ে বলে উঠলো, 'একি আপনি উঠে এলেন যে। জ্বর ছেড়েছে।'

'সামান্য আছে এখনও।' সুধা শুকনো ম্লান মুখে একটু হাসল।

'তবে ওঠা-উঠি না করলেই পারতেন; বসুন—দাঁড়িয়ে থাকবেন না।' সুচারু এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল।

বাসুর তক্তপোশের ওপর বসল সুধা।

'কি হয়েছে?' সুচারু প্রশ্ন করলে।

'এমনি সর্দিজ্বর বোধ হয়।'

'বোধ হয় কেন, ডাক্তার দেখান নি।'

'জ্বর হতে না হতেই ডাক্তার।' সুধার ঠোঁটের গোড়ায় একটু হাসি।

'তিন দিন তো হয়েই গেল। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে—এখনও বেশ জ্বর আছে।'

'না—সামান্যই।' সুধা কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল, 'হঠাৎ বাড়ি বয়ে হাজির, ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'আমি ঠিকানা পাব না, বলেন কি আপনি? সুপারিনটেনডেণ্টের পারসোনাল ক্লার্ক, সারভিস ফাইল সবই তো আমার জিম্মায়। তা ছাড়া আপনার চাকরির অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, সেটা যাবে কোথায়।' সুচারু হাসল।

'তাই তো', সুধাও মুখ তুলে হাসল, 'আমাদের নাড়ি-নক্ষত্রের হিসেব তো আপনার হাতে।'

একটু চুপ। সুধা দেওয়ালের একটা ময়লা-রঙ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে। মিটমিটে আলোয় তারিখগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, ছবিটাও।

'খোঁজ নিতে এলাম।' সুচারু বললে, 'সেদিন অত জ্বর গায়ে চলে এলেন; তারপর কোন খবর নেই। তিনদিন হয়ে গেল।' সুচারুর গলার স্বরে সুন্দর সহজ এক আন্তরিকতা ছিল যা সুধার কান এড়াল না।

'হ্যাঁ, অফিসে একটা চিঠি পাঠাব ভেবেছিলাম আজ। ভালই হল আপনি এসেছেন, কি করা যায় বলুন তো?' সুধা উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'আমায় কি ছুটি দেবে? মাইনে কেটে নেবে না তো?'

হাত নেড়ে সুচারু জবাব দিলে, 'আইনত সব পারে। কিন্তু চিন্তা নেই, সরকারী অফিস নয় এটা, ও দু-এক দিনের একস্ট্রা-লিভ্ ম্যানেজ হয়ে যায়। সবই প্রভুদের দয়া।' বলে সুচারু জোরে হাসলে।

এমন সময় আরতি একটি ছোট রেকাবি করে টুকরো টুকরো পাঁপর ভাজা আর চা নিয়ে ঢুকল। সুচারুর কাছে গিয়ে হাত বাড়াল।

'একটু চা খান।' সুধা বললে।

সুধার বলার অপেক্ষা না রেখেই সুচারু হাত বাড়িয়ে পাঁপর আর চায়ের পেয়ালা নিয়ে নিয়েছে। অগোছাল, নড়বড়ে ছোট মতন টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা রেখে অপ্রতিভ স্বরে বললে সুচারু, 'না বললেও চা আমি চেয়ে খাই। পাঁপরের খুব ভক্ত আমি। সেদিন একলাই এক-পো-টাক পাঁপর ভাজা সাবড়ে দিয়েছি।' বলে হাসছিল।

আরতি সুধার চা এনে দিল। দিয়ে দাঁড়াল। সুচারু দেখছিল আরতিকে।

'আমার বোন, আরতি।' সুধা বললে।

'তাই নাকি, বা বেশ্। তুমিই বুঝি পাঁপর ভেজেছ ভাই! আ, কী

মচমচেই হয়েছে, ফার্স্ট ক্লাস। আর চা কে করেছে, নিশ্চয়ই তুমি—কী বিচ্ছিরিই যে হয়েছে!' সুচারু চুরি করে হাসছিল।

আরতি চুপ। অবাক হচ্ছে যতটা, ততই অদ্ভুত লাগছে লোকটাকে। ভীষণ লজ্জাও পেয়েছে মনে হল। মাথা নেড়ে জানাল, না চা সে তৈরী করে নি, মা করেছে।

'আর পাঁপরটা তুমি! খুব চালাক মেয়ে, ভালটা নিজের, মন্দটা মা'র।'

'আসলে কোনটাই ও করে নি।' সুধা হাসল।

আরতি ততক্ষণে পালিয়েছে।

চা খেয়ে সুচারু একবার দরজার দিকে তাকাল। 'গুরুজন কেউ আসবেন না তো? নয়তো একটা সিগারেট খাই।'

'খান্।' সুধা মাথা হেলিয়ে হাসল।

সিগারেট ধরিয়ে গোটা কয়েক্ টান দিল সুচারু। একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কালকের কাগজ দেখেছেন?'

'না। কি আছে—?'

'সিগ্নিফিক্যান্ট্ খবর আছে একটা। আমাদের নাজিমুদ্দীন সাহেব লম্বা চওড়া এক বিবৃতি দিয়েছেন। যুদ্ধ নাকি দরজার কাছে এগিয়ে আসছে। কলকাতা রেইড্ হতে পারে।'

'এ তো শুনছিই কবে থেকে!' সুধা চোখে চোখে তাকিয়ে বললে।

'শুনছেন ঠিকই, কিন্তু আন্অফিশিয়ালি যতটা শুনছেন, অফিশিয়ালি ততটা শোনেন নি। বাংলা দেশের হোম্ মিনিস্টার নিজের মুখে বলছেন, ব্যাপারটার একটা ইমপর্টেন্স আছে বৈ কি!'

'কি বলে যেন খবরের কাগজে—!' সুধা মুখ তুলে এক লহমা ভাবল, একটু হাসল, 'ও, হ্যাঁ—বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ মহড়া। কাগজেই দেখছিলুম সেদিন; শিয়ালকোট, পেশোয়ার, অমৃতসরে খুব মহড়া চলেছে। এবার তবে কলকাতাতেও চলবে। আর কি!'

'তা চলতে পারে।' সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে দিল সুচারু।

'আমি তো অবাক হয়ে ভাবি, জার্মানী অতো দূর থেকে উড়ে এসে কি করে বোমা ফেলবে?' সুধা কথায় প্রশ্নের ইঙ্গিত এনে বললে।

'জার্মানী কেন, বোমা জাপানও ফেলতে পারে।' জবাব দিলে সুচারু, 'ভাববেন না চুপ করে বসে আছে বলে সত্যিই হাত-পা গুটিয়ে রয়েছে। জাপানের মতিগতি হাবভাব বিশেষ ভাল নয়। যেন ওৎ পেতে রয়েছে। সুযোগ বুঝলেই লাফিয়ে পড়বে। দেখলেন না, মিনিস্টারী ভেঙে নতুন মিনিস্টারী গড়া হয়ে গেল। তোজো এখন কর্তা। ভেতরে ভেতরে মতলব ওদের আছেই।'

সুধা কথা বললে না। বলার কিছু ছিল না তার। যুদ্ধের পাঁজি পুঁথির নির্ঘণ্ট অতশত সে বোঝে না। মোটামুটি যা বোঝে তাতে শুধু কে যুদ্ধ করছে, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, কারা হারছে বা জিতছে—এইটুকু তার বোধগম্য হয়।

'নাজিমুদ্দীনের এই সাবধান করে দেওয়ার অবশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে।' বললে সুচারু হঠাৎ নিজে থেকেই, কি যেন ভাবতে ভাবতে, 'কেউ কেউ বলছে এটা ধাপ্পা। ইণ্ডিয়ান সোলজার এবার খুব একটা রিক্রুট হচ্ছে না। আমাদের দেশের নেতারা নিউট্রাল থাকতে চান। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ব্যক্তিগত লড়াইয়ে তাঁরা গা দিতে চান না। ফলে গভর্নমেণ্ট পড়েছে মুশকিলে, যুদ্ধটুদ্ধ মাথার ওপর, বোমা পড়বে,—এই সব কথাটথা বলে ভয় দেখিয়ে যদি আমাদের বন্দুক ধরাতে পারে।'

'উচিত নয় ওদের সাহায্য করা।' সুধা বললে, 'নিজেদের ঝগড়াঝাঁটি নিজেরাই সামলাক তারা, আমাদের লোক কেন মাঝে থেকে মরবে!'

'তা অবশ্য বলতে পারেন আপনি। কিন্তু সত্যিই যদি যুদ্ধ দরজার গোড়ায় এসে পড়ে, তখন কি আর চুপ করে বসে থাকা যাবে। দেশ তো বাঁচাতেই হবে—ফ্যাসিজ্মের হাত থেকে।'

'কি হবে বাঁচিয়ে, আমাদের কাছে বাঘও যা সিংহও তাই।'

'না, না, এ কি বলছেন আপনি—। বিপদ দুয়েই, এ ঠিক। তবু এদের মধ্যে একটা 'কিছু' ভাল। ফ্যাসিজম্ বড় সাঙ্ঘাতিক। কী জানি কেন, আমি নিজে তো ওর ওপর ভীষণ চটা। হিটলারের দল কি করছে দেখছেন ফ্রান্সে। একটা জার্মান অফিসারকে মারার জন্যে পঞ্চাশ জন ফরাসীকে জামিনে আটক করেছে। আটকদের ক'জনকে, কথাবার্তা নেই স্রেফ গুলী করে মেরে ফেলল। মার্শাল পেঁতের মতন লোকও আর না থাকতে পেরে জার্মানীর কাছে জামিন থাকতে চেয়েছেন। ওরা বীস্ট্—পশু।'

'এরা নয়?'

'এরাও। তবে অতটা নয়। এরা খানিকটা লিবারেল। আইন, বিচার, মনুষ্যত্বকে ঠিক অতটা গোল্লায় পাঠাতে পারে নি। অন্তত খুঁটিয়ে ভাবলে তাই মনে হয়।'

সুধা আর কোন কথা বললে না। জানলার দিকে চোখ রেখে বসে থাকল।

হঠাৎ যেন খেয়াল হল সুচারুর। বললে, 'কথায় কথায় আপনাকে অসুস্থ শরীরে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। এবার উঠি। দিন্ চিঠিটা দিন্ অফিসের।'

'তাইতো। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়। একটু বসুন, আনছি!' সুধা উঠে ও-ঘরে চলে গেল।

মিনিট্ কতক পরে ফিরে এল চিঠি হাতে। এগিয়ে দিয়ে বললে, 'পরশু বোধ হয় অফিস যেতে পারব। চিঠিতে তা লিখিনি কিছু। জ্বর হয়েছে—তাই লিখেছি।'

সুচারু একবার চোখ বুলিয়ে চিঠিটা পকেটে ভরতে ভরতে বললে, 'ঠিক আছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল, বললে স্বচারু আবার, 'ভাল কথা, আপনার মাকে দেখলুম না তো! কোথায় তিনি?'

সুধা আবার আর এক অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। এমনিতেই তো স্বচারুর বাড়ি বয়ে দেখা করতে আসায়—মা কি ভাবছে কে জানে, তার ওপর আলাপ করতে গেলে, না জানি আরও কি ভাববার সুযোগ পাবে মা। কিন্তু স্বচারুকে স্পষ্ট না বলাও তো যায় না।

'দেখছি।' সুধা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই রত্নময়ী এলেন। চিটথানটা বদলে। মাথার ওপর সামান্য একটু ঘোমটা ছিল।

রত্নময়ী এসে দাঁড়াতে কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে স্বচারু। রত্নময়ী বাধা দেবার সময়ই পেলেন না।

সুধা রত্নময়ীর পেছনে—ঘরের প্রায় চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে। মনে হল না পরিচয়টা সে করিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে, বা বলবে কিছু।

নিজের পরিচয় নিজেই দিল স্বচারু, বললে, 'আমার নাম স্বচারু। আপনার মেয়ের সঙ্গে এক অফিসে কাজ করি।'

'শুনলাম।' রত্নময়ী সস্নেহ হাসি হাসলেন, 'ভালই করেছ এসে। ক'দিন অফিস কামাই হওয়ায় সুধা বড় ভাবনায় পড়েছিল।'

'ভাবনার কি আছে, অফিস থাকলেই কামাই হয়, শরীর থাকলেই মাঝে মধ্যে অসুখ।' স্বচারু লঘুস্বরে বলল। বলে হাসল।

'তা ঠিক।' রত্নময়ীও হাসি-হাসি মুখ করলেন! 'কোথায় থাক তুমি?'

'শ্যামবাজার।'

'মা-বাবাও কাছে থাকেন।'

'না' স্বচারু ঠোঁট কামড়ে হাসল।

'দেশে থাকেন বুঝি? কোথায় দেশ তোমাদের?'

'আদি বাড়ি চব্বিশপরগনার বারাসতের জাগুলিয়ায়। সে বাড়িটাড়ি

আমার জন্মের আগেই ছেড়ে এসেছিলেন বাবা। তারপর কলকাতাতেই স্থায়ী। ভাড়াটে বাড়িই বাড়ি।'

'তবে যে বললে বাবা-মা কাছে থাকেন না।' রত্নময়ী অবাক হয়ে বললেন।

'কোথায় আব থাকেন। দু'জনেই স্বর্গে। একজন, মানে মা গেছেন ছেলেবেলায়—বাবা বছর পাঁচেক আগে।' সুচারুর মুখে কোথাও বিষণ্ণতা নেই। বরং সুন্দর কোমল এক স্নিগ্ধ হাসি।

রত্নময়ী কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সুচারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

যাবার সময় সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত এসেছিল সুধা। সুচারু বললে, 'আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না, ঘবে যান। আমি নিজেই পথ চিনে চলে যেতে পারব।'

সুচারু চলে গেলে সুধা বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল আবার। শুলো কিন্তু স্বস্তি পেল না। সুচারুর এই আচমকা বাড়ি বয়ে দেখা করতে আসার কথাই ভাবছিল ও। ওদের পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যমূলক বন্ধুতা আছে—অন্তরঙ্গতা নেই এমন কিছু। কিন্তু কে জানে, মা যদি ভেবে বসেন তাঁর মেয়ে আর এই ছেলেটির মধ্যে—বেশ অন্তরঙ্গতা হয়েছে—তবে? ভাবতেও পারেন মা। ভাবা অস্বভাবিক হবে না। সুধার অস্বস্তি হচ্ছিল, লজ্জাও জাগছিল কেমন যেন। আর রাগ হচ্ছিল সুচারুর ওপর। আবার মাঝে মাঝে সুচারু এই খোঁজ নিতে আসার জন্যে সুন্দর এক আনন্দও।

তেরো

সরাসরি বাসু ভেতরে চলে যাচ্ছিল। নিচের বৈঠকখানা-ঘরের দরজা যে খোলা, আলো জ্বলছে বাসু দেখেনি,—দেখলেও খেয়াল করে নি। হঠাৎ ডাক শুনল, 'ওহে শোন।'

বাসু দাঁড়াল। আসলে পিছনে কেউ নেই। দু'পা পিছনে খোলা দরজা, ডান হাতি। বাতি জ্বলছে। ওকেই ডাকছে কেউ বাসুর মনে হল। পিছিয়ে এসে ঘরে ঢুকল বাসু।

মোহিতবাবু। সন্ধ্যের দিকে নিচের তলায় বৈঠকখানা-ঘরে মোহিত-কাকা বসে থাকবেন, বাসু ভাবে নি। আচমকা মুখোমুখি হয়ে ভীষণ অস্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল। দাঁড়িয়ে থাকল চুপ মুখে।

টেবিল চেয়ার থাকলেও ফরাশের ওপর কোলে বালিশ টেনে বসে ছিলেন মোহিতবাবু। পিঠের ওপর আলোয়ান চাপানো। ঘরের জানলা-গুলো সবই বন্ধ, একটি শুধু খোলা। কালো কাগজের লম্বা টুপি পরানো বাতিটা জ্বলছে। ফরাশের ওপরই আলো যা পড়েছে বাকী ঘর আঁধছা।

টাকের তলায় কপালের নিচে পুরু মোটা কালো ফ্রেমের চশমা কটকট করছিল। লালচে চোখদুটোর পাতা একবার গুটিয়ে, আবার পিটপিট করে মোহিতবাবু ভাল করে নজর করে বাসুকে দেখছিলেন। একটু পরে গম্ভীর খসখসে গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'মীনুদির কাছে।' বাসু জবাব দিল।

'কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন, 'কি দরকার ?'

এবার থতমত খেয়ে বাসু চুপ করে গেল। তাকাল সামনে। কচ্ছপের চোখের মতন এক জোড়া চোখ তার মুখের দিকে স্থির হয়ে আছে। অন্য কিছু মনে না আসায় বাসু বলে ফেলল 'মা পাঠিয়েছে।'

'মা পাঠিয়েছে!' মোহিতবাবু কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন এমন স্বরে যাতে মনে হল জবাবটা তাঁর মনঃপুত হয়নি। একটু থেমে আবার বললেন, 'প্রায়ই তুমি এ-বাড়িতে আস।'

বাসু না মাথা নাড়ল, না কথা বলল। এমন কি মোহিতবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না সোজাসুজি। চোরা চোখে দেখছিল। আর ভেতরে ভেতরে কেমন একটা ভয় হচ্ছিল।

'চাকরি টাকরি পেয়েছ?' মোহিতবাবু প্রশ্ন করলেন হঠাৎ, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। বাসুর সাজপোশাক দেখতে দেখতে।

'না।' মাথা নাড়ল বাসু।

'দিদির ঘাড়ে বসে খাচ্ছ?' মোহিতবাবু বিশ্রী ভাবে উপহাস করলেন।

বাসুকে যেন কড়া এক চাবুক কষিয়ে দিল লোকটা। ভেতরে ভেতরে বাসু রাগে জ্বলতে লাগল। মুখে বললে না কিছুই। চুপ। একেবারেই চুপ।

'মীনু তোমার চেয়ে বয়সে বড় না?' হঠাৎ প্রশ্ন পালটে গেল আবার। মোহিতবাবু চোখ দিয়ে যেন গিলে খাচ্ছিলেন বাসুকে।

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল বাসু।

'তার কাছে তোমার কিসের এত দরকার থাকে?'

কী জবাব দেবে বাসু। বিমূঢ় স্বরে হঠাৎ বলে ফেললে, 'এমনি আসি। গল্পটল্প করতে!'

'গল্প করতে! মীনু তোমার গল্প করার লোক!' যত না অবাক তার চেয়ে বেশি ব্যঙ্গ মোহিতবাবুর গলায়। একটু থেমে প্রায় ধমকের স্বরে বললেন, 'ও গল্প আড্ডা হাসি ঠাট্টা এ-বাড়িতে চলবে না।' অত্যন্ত কর্কশ, গম্ভীর স্বরে শেষ কথাটা বলে উনি থেমে গেলেন।

কথাগুলো যতটা কর্কশ করে বললেন মোহিতবাবু, তার চেয়েও তিক্ত কটু কষায় হয়ে বাসুর কানে প্রত্যেকটা শব্দ বিঁধে বিঁধে ঢুকল! বিমূঢ় হয়েছিল প্রথমটায় বাসু, তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হল

মীনুদির বাড়ির দরজা ঝপাং করে কেউ মুখের ওপর বন্ধ করে দিলে। ক' মুহূর্ত তাকিয়েই থাকল বাসু। এবার মনে হচ্ছিল, ওর কান, চোখ, মুখ গরম হয়ে আসছে। অপমান বোধ করতে শুরু করেছে বাসু এতক্ষণে। শিরাগুলো দমকা স্রোতে রক্ত ছড়িয়ে গা গরম করে তুলেছে। জ্বালা-ও করছে। দাঁতে দাঁত ঘষে গেল। চিবুক দুটো কঠিন হয়ে এল। বাসুর ইচ্ছে হচ্ছিল, লোকটার গায়ের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে গোটা কয়েক ঘুঁষি চালিয়ে দেয় ওর মুখে, নাকে, চোখে।

কিন্তু কিছুই করলে না বাসু। বিশ্রী এক উগ্রতা এবং তপ্ততা নিয়ে ধীরে ধীরে ও বাইরে বেরিয়ে এল। আর ভেতরে ঢুকল না। বাইরের দিকেই পা বাড়ালে। গেট খুলে রাস্তায়।

রাস্তায় পা দিয়েই গায়ের কাছে, আবছা অন্ধকারে কে যেন এসে পড়ল। চোখ তুলল বাসু। মীনুদি।

'বাসু!' মীনাক্ষী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'বাড়ি এসেছিলে, ফিরে যাচ্ছ! আমি ভাই পাশের বাড়িতে গিয়েছিলাম একটু। এস।'

বাসু টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গেট খোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে মীনাক্ষী ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল।

'এস।'

'না।' বাসুর কঠিন, স্পষ্ট-স্বর জবাব।

'কেন, কি হল?' মীনাক্ষী ঘুরে দাঁড়াল, গেট থেকে হাত নামিয়ে।

'তোমার বাবা আমায় বাড়ি ঢুকতে বারণ করেছে।' বাসুর গলায় ক্ষোভ, জ্বালা।

অন্ধকারেই মীনাক্ষী চমকে উঠল। এক-পা এগিয়ে এসে বাসুর মুখে চোখ তুলে বললে, 'মানে?'

'মানে আবার কী? ইনসাল্ট্ করেছে আমায়। তোমার কাছে আসি বলে শাসিয়েছে।'

অন্ধকারে মীনাক্ষীর মুখের রেখা-বদল বাসুর চোখে পড়ল না। সে নজরও ছিল না তার তখন। অসহ্য রাগে গজরাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। 'চট্ করে অত রাগ কর কেন?' মীনাক্ষী হাত ধরলে বাসুর, 'এস তুমি আমার সঙ্গে। কি হয়েছে বলবে চল।'

'না। আমি যাব না।' বাসু হাত ছাড়িয়ে নিল।

'কী পাগলামি করছ। আমি বলছি, এস। বাবার কথায় মনে করো না কিছু, রাত্তিরে তাঁর মাথার ঠিক থাকে না।' মীনাক্ষী আবার হাত ধরে টানল বাসুর।

'তোমার বাবা মাতাল না পাগল যে মাথার ঠিক থাকে না?' বাসু ছটফটে জ্বালা ধরা গলায় বললে। একেবারেই আচমকা। প্রথম দিনের সেই গন্ধটা যেন নাকে এসে লাগছিল।

অল্পক্ষণের জন্যে মীনাক্ষী চুপ। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছোট্ট করে বলল, 'হ্যাঁ, তাই।' একটু অপেক্ষা করল মীনাক্ষী, যোগ করল আবার, 'তাই তো বলছি, বাবার রাত্তিরের কথার কোন মাথা মুণ্ডু নেই। তুমি এস আমার সঙ্গে।'

'বৈঠকখানা-ঘরে বসে আছে তোমার বাবা।'

'তা থাক্, আমার সঙ্গে এলে তোমায় কিছু বলবে না কেউ। না হয় চল অন্য দিক দিয়ে ঢুকব আমরা। কোন ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না।'

বাসুর তবু পা বাড়াতে ভরসা হচ্ছিল না। মীনাক্ষী বললে, 'রাস্তায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। শীত করছে আমার। এস না। বলছি কোন ভয় নেই, তবু—।'

'ক'টা বেজেছে?' কি ভেবে বাসু শুধোল।

'কত আর সাড়ে সাতটা হবে। শীতের রাত্তির। এস।'

সামনে পা বাড়াল বাসু।

মীনাক্ষীর ঘরে নয়, পাশের সেই ঘর যেখানে একদিন রাত কাটিয়েছে বাসু, যাত্রা দেখেছে সারা রাত, সেই ঘরে আশ্চর্য কৌশলে এনে হাজির করাল বাসুকে মীনাক্ষী। ঘরের বাতি জ্বালাল না। নিজে দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে বললে, 'কি হয়েছে বল, আস্তে।'

কেমন যেন লাগছিল সব বাসুর। এই ঘর, এই অন্ধকার, মীনুদির সন্তর্পণ সতর্ক পাহারা, ফিস ফিস গলা।

বললে বাসু, চাপা স্বরেই, যা ঘটেছে। মীনাক্ষী সব শুনল। কথা বললে না অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে পিছনে মাথা হেলিয়ে দেখে নিচ্ছে বারান্দা দিয়ে কেউ যাচ্ছে আসছে কি না।

খানিকটা সময় ভেবে নিয়ে হতাশ গলায় বললে মীনাক্ষী, 'হঠাৎ বাবা তোমায় এ-সব কথা কেন বললে আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'কেউ হয়ত লাগিয়েছে।' বিরক্তি আর ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিল বাসু।

'লাগাবে! কি লাগাবে—! লাগাবেই বা কে!' মীনাক্ষীর মুখ ঠাহর করা না গেলেও অকস্মাৎ গলায় ঝাঁঝ ফুটেছে বোঝা গেল। একটু সময় ছেড়ে আবার বললে, 'ও-সব না। এক নেশার ঘোরে কি বলতে কি বলেছে, ঠিক নেই।'

কৌতূহল এড়াতে পারল না বাসু। প্রশ্ন করলে, 'তোমার বাবা সত্যিই মদ খায়?'

'হ্যাঁ, খান।'

'পুজোর দিন যখন রাত্রিতে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম, তুমি বাথরুমে গেলে তখন কাকাবাবুর ঘর থেকে মদের গন্ধ আসছিল।'

'ঘরে বসেই খান।' মীনাক্ষী মৃদু বিস্বাদ কণ্ঠে জবাব দিল।

'আজ কিন্তু কোন গন্ধ পাই নি।' বাসু বললে।

'তাই ত ভাবছি। শরীর খারাপ বলে আজ বিকেল বিকেল দোকান থেকে ফিরেছে বাবা। হয়ত—!' মীনাক্ষী হঠাৎ থেমে গেল।

অন্ধকার আর নিস্তব্ধতার ভারি আবহাওয়ার মধ্যে আরও একটু সময় বয়ে গেল। হঠাৎ কথা কয়ে উঠল মীনাক্ষী, মৃদু কিন্তু স্পষ্ট, ধারাল, বিক্ষুব্ধ স্বর। চাপা একটা হল্কা বেরুচ্ছে যেন আগুনের। তিক্ততা আর অভিযোগ। 'গুরুজনদের সম্পর্কে কিছু বলতে নেই—আর আমার কথা শোনার লোক কে-ই বা আছে। কিন্তু পারি না, থাকতে পারি না। উনি বাড়িতে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে মদ খাবেন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাড়ির বাইরে রাত কাটাবেন, আনন্দ করবেন। আমি কি কচি খুকি, বুঝি না—বুঝতে পারি না। সমস্ত বুঝতে পারি আমি। কিন্তু তাতে ওঁর কী আসে যায়! নিজের নেশা, অভাব, ফুর্তি কোথাও এক তিল ঘাটতি নেই। এই বয়সেও।' মীনাক্ষী যেন এবার সাপের মত হিস্‌হিস্‌ করছিল, তেমনই ফিস্‌ফিস্‌ স্বর, 'শুধু আমার বেলায় চোখে সয় না। বিধবা মেয়ে কি না।'

অন্ধকারের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাসু বিমূঢ় হয়ে বসেছিল। মীনাক্ষীর মুখের আলগা আভাস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না বাসু। কিন্তু অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করছিল। যা যা বলছে মীনুদি, বাসু সব ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে না হয়ত। কিন্তু মোটামুটি পারছে বৈকি। আর বুঝে পাথর-গা হয়ে বসে রয়েছে।

মীনাক্ষীর কথা ফুরোয় নি। অল্প একটু থেমে যেন নিশ্বাস-বন্ধ বুকের ভারটা হাল্কা করে নিচ্ছিল। আবার নিষ্ঠুর চিকন গলায় বললে, 'সবই আমার দোষ। আমার যদি বিয়ে হতে না হতেই স্বামী মরে যায়, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে না পারি রাতারাতি, কি করব আমি? বয়স বাঁধব, মন বাঁধব?' ছটফট করছিল যেন মীনাক্ষী, সোহাগ করে বলেছিলেন, 'তোর আবার বিয়ে দেব, মীনু। কেন, কেন দিলেন না? আমি কি না বলেছিলুম?' মীনাক্ষীর গলা ছাপিয়ে আবেগ উথলে পড়ল। ভিজে ভিজে স্বর। উচ্চারণে অন্যরকম এক বিকৃতি।

বাসুও তার বুকের শব্দ নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিল। কাঁধের কাছে একটা শিরা দপ্ দপ্ করছে। চোখ দুটোর জ্বালা যেন আরও বেড়েছে। কি করবে, কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। বোকার মতন বসে আছে।

মীনাক্ষীর ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে মিহি রেশ মেলানো ঝঙ্কার তুলে আটটা বেজে গেল। সেই শব্দে যেন চমকে উঠল দু'জনেই।

উঠে পড়ল বাসু, 'আমি যাই মীনুদি।'

'যাও।' মীনাক্ষী দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। খেয়াল হল পরক্ষণেই, 'চল তোমায় আমি গেট পর্যন্ত দিয়ে আসি।'

গেটের কাছে এসে বাসু একটু দাঁড়াল। আস্তে গলায় বললে, 'আমি আর কি এ বাড়িতে আসব না?'

'তোমার খুশি।'

'কাকাবাবু যদি দেখতে পান, আবার কিছু বলেন।'

'আমি কি জানি। সাহস না থাকে এস না।' শেষ কথাটার মধ্যে বিদ্রূপের খোঁচা ছিল। বাসু বুঝল কি বুঝল না জানার অপেক্ষায় না থেকে মীনাক্ষী পিছু ফিরল।

নিজের ঘরে এসে আলো জ্বালল মীনাক্ষী। বাতিটা চোখে লাগছিল। নিভিয়ে দিয়ে আবার অন্য সুইচ টিপল। হাল্কা নীল আলো ফুটল ঘরে। অন্যমনস্ক চোখে এ-কোণ ও-কোণ তাকাল মীনাক্ষী। কখনো বিছানা চোখে পড়ল, কখনো শার্সি ভেজানো জানলা, দোল খাওয়া চেয়ারটা। চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকল মীনাক্ষী কিছুক্ষণ। মৃদু স্তিমিত-আভা এই আলোয় ঘরের মধ্যে কোথাও মন রাখার একটা জায়গা যেন খুঁজছিল।

চোখে পড়ল আয়না। কাঁচের পাল্লা দেওয়া আলমারির আধখানায় নিজেকে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেয়ে খেয়াল হল হঠাৎ। পা পা করে এগিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী।

দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে।

এই মুহূর্তে নিজেকে দেখতে কেমন আশ্চর্য লাগছে মীনাক্ষীর। খুব স্পষ্ট, কী রেখা-গভীর একটি ছবির মতন যদিও সে ফুটে ওঠেনি—একটু আবছাই হয়ত বা, কিন্তু সমস্ত ভঙ্গি, সবটুকুই তার ফুটে উঠেছে।

তন্ময় হয়ে দেখছিল মীনাক্ষী। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ওর—হ্যাঁ, ওর অস্তিত্ব আলাদা হয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে; অন্য দু'টি মানুষে। যেন এখন এই ঘরে দুটি মীনাক্ষী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আয়নার কাঁচে একটি মীনাক্ষী গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে—, অন্যজন সে নিজে, পায়ের ভর সহজেই যে অনুভব করতে পারছে।

চোখে চোখে তাকিয়ে কত সময় কেটে গেল, নিস্তেজ নীলচে আলোয় কতবার নিশ্বাসের হাওয়া টেনে বুক কাঁপল, ঠোঁট নড়ল, পাতা পড়ল—কে জানে তারপর মনে হল কথা বলছে ওরা, ওরা দুটিতে, আশ্চর্য নীরব ভাষায়।

আয়নার মীনাক্ষী যেন ঠোঁটে বিচিত্র হাসি টেনে বলছিল : ও আসবে, আবার আসবে।

কড়ে আঙ্গুল মুখে তুলে আস্তে করে দাঁতে কামড় দিল যে-মীনাক্ষী এবং দিয়ে অনুভব করলে মৃদু ব্যথা, সে-মীনাক্ষী যেন জবাব দিল : আমার কী। আসুক, না-আসুক, মরে যাব না আমি। মরে যাচ্ছি না।

: তা ঠিক।

: তবে? ঠোঁটের কোণ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলে মীনাক্ষী। চাপা হাসিতে চোখ ঝিকমিক করে উঠল।

আয়নার মীনাক্ষীর মনে যেন অন্য কথা ছিল। ততটুকু হাসি ওর চোখ ততক্ষণই ধরে রাখল, যতক্ষণ না মীনাক্ষী চোখ নামিয়ে নিজের বুকের ওপর থেকে শাড়িটা একটু সরিয়ে নিল, লকেট্‌টা তুলে নিলে আঙ্গুলে। তারপর আর রাখল না, চোখের তারায় দু'টুকরো ফসফরাস ছিটকে পড়ে যেন জ্বলে উঠল আচমকা। ঘনকালো ভুরু, দীর্ঘপক্ষ চোখের

সাদায় যে লুকনো অন্ধকার ছিল—এবার তা মুছে গিয়ে পলকে একটি লোভী, ক্ষুধার্ত ব্যাকুলতা ফণা তুলে হিংস্রভাবে তাকাল।

দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসে বুক দুলছিল মীনাক্ষীর। আয়নার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কাঁপছিল এবং কঠিন হয়ে আসছিল চিবুক। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলছিলঃ যা খুশি আমি করব; করব। আমার শরীরটা গঙ্গাজল নয়, আর মনটা গাছ বা পাথর নয় যে নড়বে চড়বে না।

: তোমার বাবা? আয়নার মীনাক্ষী ভয় পাওয়াতে চাইলে।

: গ্রাহ্য করি না। করব না। নিজের পাপ দেখুন। নিজের দিকে তাকান উনি।

: আর তোমার দিকেও।

বিশ্রী একটা ঘৃণায় ঠোঁট উল্টে গা-রিরি ভঙ্গি করলে মীনাক্ষী। বিষগলায় হিস্‌হিস্ করে বললে, 'সে সাহস নেই, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমায় খোলাখুলি বলবার মতন মুখ কি আছে নাকি তাঁর! নেই। থাকলে বলতেন। আমার জবাবটাও শুনতেন।'

মীনাক্ষী সরে এল আয়নার সামনে থেকে। ভাল লাগছিল না আর। সারা গায়ে যেন আগুন জ্বলছিল, রক্ত চড়ে উঠেছিল মাথায়। মনে মনে কুটি কুটি করে ছিঁড়ছিল তার এই বাধ্য বৈধব্যকে। অসীম বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা জমছিল বাবার ওপর। এমন কি সমস্ত বাড়িটার ওপর।

বাতি নিভিয়ে বিছানায় বুক উপুড় করে শুয়ে পড়ল মীনাক্ষী। বালিশ আঁকড়ে। মুখ গুঁজে।

চৌদ্দ

মীনুদির বাড়ির দরজা এমনি ভাবে হঠাৎ মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাবে বাসু ভাবে নি ; মনে হচ্ছিল, মোহিতকাকা তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে। রাগে অপমানে বাসুর গা জ্বলে যাচ্ছিল কথাটা ভাবলে। আর অন্ধকার ঘরে সে-দিন মীনুদি যা সব বলেছে তার বাবার সম্পর্কে—কথাগুলো মনে পড়লে লোকটার ওপর ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় বাসুর নাক চোখ কুঁচকে উঠছিল। গা ঘিনঘিন করছিল।

ওই কচ্ছপ-চোখ, টাক-মাথা লোকটা যে এত বড় শয়তান বাসু তা ভাবতে পারে নি। বেটা বদমাশ, ঘোড়েল কাঁহাকার, মাতাল ! মেয়েমানুষের বাড়ি যায় !

এই লোকটা সে-দিন বেকাদায় বাড়ির মধ্যে পেয়ে খুব চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝেড়ে দিলে বাসুর ওপর। খুব গরম দেখিয়ে নিলে। কি করবে বাসু, নেহাতই মীনুদির বাবা, পরের বাড়ি—চুপচাপ সব শুনতে হল, হজম করতেও হল। অন্য কেউ হলে এই রোয়াব সেদিন বের করে দিত বাসু। দাঁতের পাটি গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ত। কপাল-জোরে বেঁচে গেছে সে-দিন শালা কচ্ছপ। এই বেইজ্জতি বাসু সহজে ভুলছে না। রাস্তায়-ঘাটে পাই একদিন তোমায়, বাসু বলছিল মনে মনে, খাতির টাতির নয়, দরজা তো আমার বন্ধ করে দিয়েছ, আবার কি, তোমায় দেখে নেব, আমিও ফটিক দে লেনের বাচ্চা।

ক্রীক রোর বাড়িতে আর যাবে না, বাসু ঠিক করে ফেলেছিল। যেখানে তাকে গলা ধাক্কা দিয়েছে সেখানে থুতু ফেলতেও আর পা মাড়াচ্ছে না ও। না দেখতে পাক মীনুদিকে। কি তার আসে যায়। এতদিন কি মীনুদি বলে কেউ ছিল ওর ? কি হয়েছে তাতে বাসুর, মরে গেছে

সাদায় সে ।মুদিও অনেকটা তার বাপের মতন ব্যবহার করলে। বাসু শুধু ক্ষুধা-ত চেয়েছিল, এর পর আর সে ক্রীক রোর বাড়িতে আসবে কি আসবে না, মীনুদি কেমন পেঁচিয়ে জবাব দিল, 'জানি না, তোমার খুশি। সাহস থাকে তো এস, নয়তো এস না।' এ-ভাবে কথা বলার কি মানে? কেন, বলতে পারত না মীনুদি, 'না, তুমি আসবে, নিশ্চয় আসবে!' এর আগে কতবার যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছে মীনুদি, আর সে-দিন ব্যাস্ একেবারে সাফ্ জবাব, তোমার খুশি। সাহস থাকে তো এস, নয়তো নয়!

সাহস আমার যথেষ্টই আছে, কিন্তু সাহস আছে বলেই তোমার বাপের কাছে ইনসাণ্ট্ হতে আমায় যেতে হবে তার কি মানে। তোমার বাপ তো আমার বাপ নয়। আবার যদি কিছু বলে বসে, বাসু ছেড়ে কথা বলবে না। তখন! তোমার গায়ে লাগবে।

তার চেয়ে যাঁবে না বাসু ক্রীক রোয়ের বাড়িতে। চুলোয় যাক্ সব।

দু' তিনটে দিন মনকে খুব শক্ত করে রাখলে বাসু। ক্রীক রোকে পাত্তাই দিতে চাইল না। মীনাক্ষীর কথা ঘুরেফিরে বার বার মনে পড়লেও নিজেই জোর করে তা উপেক্ষা করবার চেষ্টা করেছে।

বড়জোর তিন-চারটে দিন, তারপর আর পারছিল না বাসু। সব সময় থেকে থেকে মীনাক্ষীর মুখ মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, হাতছানি দিচ্ছে মীনাক্ষীর চাপা ঠোঁটের হাসি, কটাক্ষ। চুম্বকেব মত টানছে বাসুকে।

মনের জোর কমছিল। যতবারই ভাবতে গেছে, বাসু শুধু ভাবত, ভাবতে পারত আর ভালবাসত ভাবতে সেই মীনুদিকে, যে-মীনুদি যাত্রার দিন ওর পাশে গায়ে গায়ে এক হয়ে ছিল। আরও আগেকার পুরনো দিনের মীনুদি আজকাল আলতো করে পেন্সিলে আঁকা ছবির মত অস্পষ্ট, কোথাও কোথাও রবার ঘষে একেবারেই যেন মুছে ফেলা। শুধু সেই রাত্রির মীনুদি মুছে যায় না, মুছে যাওয়ার নয়। সব কিছুকে তা আশ্চর্য ভাবে ম্লান করে ফেলেছে।

আর এমন ঘন কালি দিয়ে সে ছবি আঁকা যা জলে ধোবার নয়। অত্যন্ত স্পষ্ট, প্রখর, গভীর ও লোভনীয়।

বাসু চোখ বন্ধ করলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা দেখতে পায়। এবং দেখে। মীনাক্ষী যেন যাদুকরী। বাসুকে এমন সব আশ্চর্য অদ্ভুত, আকর্ষণীয় যাদু দেখিয়েছে এক ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে, যার তীব্রতা আর উন্মাদনা এখন বাসুর রক্তে, স্নায়ুতে এবং চেতনায়। মীনাক্ষীর সজীব শরীরের সেই রহস্যময় মাদকতা এবং ক্ষুধাই তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। সেই জ্বালায় ছটফট করছে বাসু, জ্বরো রুগীর মতন।

বাসু চাইত, মীনাক্ষীর আবার ইচ্ছে হোক, আবার, আর একবার নতুন করে সেই যাদু দেখাক। ছুটে ছুটে যাচ্ছিল বাসু এই আশা নিয়ে। মুখ ফুটে বলতে পারত না, কিন্তু পায়ে পায়ে গায়ে গায়ে ঘুর-ঘুর করত। কুকুর বেড়ালের মতনই অনেকটা। তার অস্বস্তি, অধৈর্য, ছটফট ভাবটা চোখে না পড়ার নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য মীনাক্ষী যেন এ-সব আর দেখতে পেত না। বুঝতে পারত না।

আর ঠিক এমন সময়েই ক্রীক রোর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এক-পুকুর জল হঠাৎ যেন শুকিয়ে কাদা-সার। তেষ্টায় যখন ছটফট করছে বাসু, তখনই। ঠিক তখনই।

এতদিন যা একরকম বলেইনি, আভাস-ইঙ্গিত দিয়েই চেপে গেছে, এবার প্রাণের বন্ধু গৌরাঙ্গকে সেই কথা বললে বাসু। না বলে পারল না। কী যেন একটা ভার হয়ে চেপে বসছিল ক্রমশ, তাকে রীতিমত অস্থির, অধৈর্য এবং উত্তেজিত করছিল। মীনুদি আর তার বাবার জন্যে তার মনে দিনে দিনে এত কথা এত রাগ আর দুঃখ জমছিল যে শেষ পর্যন্ত অন্তত একটু হাল্কা হবার জন্যে গৌরাঙ্গকে সব কথাই

বলতে হল। শুধু যাত্রা দেখার সেই অদ্ভুত রাতটির কথা বলল না, বলতে পারল না।

শুনে গৌরাঙ্গ খানিকক্ষণ আর কথা বলতে পারল না। মুখ হাঁ, চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকল। যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাসুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে এ-সব কথার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে বোঝবার চেষ্টা করছিল।

অনেকক্ষণ পরে গৌরাঙ্গ খানিকটা সন্দেহ চোখে রেখে, ভুরু অল্প একটু কুঁচকে, হাসি টেনে বললে, 'এই জন্যে তুই রোজ ক্রীক রো ছুটতিস। বঁড়শির টান। জোর গেঁথে গেছে গলায়। না কিরে!'

বাসু বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল গাছের ঝোপের দিকে, যেখানে ছায়া জমছিল।

একটু চুপচাপ। গৌরাঙ্গ ভাবছিল। বেশ গম্ভীর মুখেই। সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিয়ে দিয়ে। 'দেখ বাসু—' হঠাৎ বললে গৌরাঙ্গ, 'ওসব দিদিটিদি ফালতু। আসলে এটা লভ্। প্রেমে পড়েছিস তুই।'

প্রেম শব্দটা নতুন শুনল না বাসু। কী এই প্রথম ও ভাবল না তা নিয়ে। তবু গৌরাঙ্গর মুখ থেকে শুনে কেমন এক সিরসির ভাব, যেন খুব নরম পালকের আগা ওর বুকের মধ্যে কেউ আলতো করে বুলিয়ে দিল। গায়ে একটু কাঁটা কাঁটা দিল বাসুর।

আবার খানিক চুপচাপ। বাসুই বললে শেষে, 'কি করি বল্ তো?'

'তাই ভাবছি—' গৌরাঙ্গ একটু একটু মাথা দুলিয়ে ভীষণ গম্ভীর মুখে বললে। বাস্তবিকই ভাবছিল গৌরাঙ্গ। একটু চুপ থেকে শুধোল, 'ক'দিন আর ও-বাড়িতে যাস নি তুই?'

'আজ নিয়ে পাঁচ দিন।'

'এক্কেবারেই যাস নি?'

'না। কাল একবার সাইকেল নয়ে রাস্তায় চক্কর দিতে গিয়েছিলাম। দেখতে পেলাম না।'

'হুঁ!' গৌরাঙ্গ চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত ভাবল। 'ও-সব চক্কর টক্কর নয়—কাল একেবারে স্ট্রেট চলে যাবি বাড়িতে।' গৌরাঙ্গ. হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে উপদেশ দিচ্ছিল, 'মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়াবি। বলে ফেলবি কথাটা। স্ট্রেট টক্ বাবা। তারপর হয় হ্যাঁ, নয় না।'

উপদেশটা তেমন মনে লাগল না বাসুর! এ আর এমন নতুন কথা কি! বাড়ির মধ্যে সটান যে যাবে, সেই তো টাক মাথা কচ্ছপটার ভয় আছে। তবু না হয় গেলই বাসু এক ফাঁকে—কিন্তু মীনুদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলবেটা কী ও। কিসের হ্যাঁ আর না।

মাথা নাড়ল বাসু। 'না, অন্য কোন উপায় বাতলা গৌবে।'

অন্য উপায়। গৌরাঙ্গও এবার ভাবল। সত্যিই তো বলবে কি বাসু মেয়েটাকে। বড় লোকের মেয়ে, বয়সে বড়, বিধবা, তেমন সম্পর্কে দিদি, চরিত্র টরিত্রও গঙ্গাজলে ধোয়া নয় মনে হচ্ছে, খুব চালু মেয়ে বাবা। এই মেয়েকে বাসু কি বলতে পারে—তোমায় ভালবাসি। বাসো তো বাসো। বয়েই গেল আমার। না হয় ধর সেও বললে, তোমাকেও আমি ভাল-বাসি বাসু। তারপর কি? কি করবে বাসু? মেয়েটাকে নিয়ে কেটে পড়বে? যাবে কোথায়, খাবে কি?

গৌরাঙ্গর মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে সব গুলিয়ে যেতে লাগল। কঠিন ব্যাপার। হাজার ঝামেলা।

এবার নেভা-গলায় বললে গৌরাঙ্গ টানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'বুঝলি বাসু—'

'কি?'

'ভেবে দেখলাম—' গৌরাঙ্গ হতাশ ভাবে ঠোঁট গাল কুঁচকে মাথা নেড়ে বললে, 'এ ভাই গভীর গড্ডা। বালতি ডুবিয়েছিস কী একেবারে শালা রশি সমেত ডুবে যাবে। তার চেয়ে ছেড়ে দে—।'

কি ছেড়ে দেবে, মীনুদিকে? বাসু মুখ ফিরিয়ে বন্ধুর দিকে চাইল। চেয়ে থাকল একটুক্ষণ। ভাবল, ছেড়ে দেবার কথা মুখে বলা সোজা। এ ক'দিনে তা বেশ বুঝতে পেরেছে ও।

উঠে পড়ল দুই বন্ধু। কথাবার্তা আর হচ্ছিল না প্রায়। কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট ছেড়ে চাঁদনি, ছোট রাস্তা গলি ঘুঁজি দিয়ে শেষে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। মলঙ্গা লেনের ভেতরে ঢুকে পড়ে গলি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গৌরাঙ্গ। বললে 'একটা কাজ করবি?

বাসু তাকাল।

'একটা চিঠি ঝেড়ে দে কাল তোর মীনুদিকে।'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ। ফাইন হবে মাইরি। লেখ্ না তোর যা মন চায়। ও-ও লিখবে পাল্টা। মতিগতি বুঝে নে।' গৌরাঙ্গ আবার হাঁটতে শুরু করলে বাসুর গলা জড়িয়ে। খানিকটা এসে হঠাৎ তার উৎসাহ যেন দ্বিগুণ হল। চকচকে চোখে বললে আবার, 'দেখা হোক না-হোক চিঠি লেখালেখি থাকলে দেখবি কষ্টটষ্ট হবে না।' একটু থেমে গায়ে গা হেলিয়ে, বাসুর গলায় জড়ান হাতটা ঘন করে টেনে একগাল হাসি ফুটিয়ে গৌরাঙ্গ বললে আবার, 'লভ্ লেটারগুলো আমায় দেখাস মাইরি। চেপে যাস নি যেন। আমি তোর বুজুম ফ্রেণ্ড্। কাকপক্ষীও জানবে না আমার কাছ থেকে।'

পরের দিনই চিঠি লিখলে বাসু। এক্সারসাইজবুকের দুটি পাতা ভরে। বলার কথা সামান্য। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার লেখা। মীনাক্ষীকে না দেখতে পেয়ে বাসুর যে কী ভীষণ খারাপ লাগছে সেই কথা। শেষে লিখলে: তোমার বাবার মতন তুমিও কি আমাকে অভিয়ে

দিলে মীনুদি? আমি কি করেছি তোমাদের? চিঠি দিয়ে নিশ্চয় করে জানাবে কবে যাব ও-বাড়ি।

চিঠি পাঠিয়ে মনে মনে সময় হিসেব করতে লাগল বাসু। কতক্ষণে হাতে পৌঁছবে মীনুদির। বাসুর হাতের লেখা চেনেনা মীনুদি। আচমকা চিঠি পেয়ে ভীষণ অবাক হবে। কে লিখেছে, কার চিঠি ভাবতেই পারবে না। তারপর চিঠি পড়ে ঠিক বুঝবে, বাসু কী ভীষণ রাগ দুঃখ আর কষ্ট নিয়ে এই চিঠি লিখেছে। মীনুদিরও নিশ্চয় মন খারাপ হয়ে যাবে। চিঠি লিখতে বসবে তাড়াতাড়ি।

জবাবের আশায় একটা দিন ফেলে রাখল বাসু।

সন্ধ্যে বেলায় সিভিক গার্ডের ধরাচুড়ো পড়ে ডিউটি ফাঁকি দিয়ে গৌরাঙ্গকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল বাসু। পথে বেরিয়ে দেখে ব্ল্যাকআউটের আবছা-আলো-আভাস, রাস্তার এখানে ওখানে জটলা। একটু কেমন ছমছমে ভাব।

ট্রামে চড়তে ব্যাপারটা জানা গেল। জোর গলাবাজি চলেছে। কথা বলছে প্রায় সবাই, শ্রোতা অল্পই।

গৌরাঙ্গ খাটো গলায় বললে, 'এই শুনছিস তো। জাপান ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছে।'

বাসুর কাছে এ খবরে কোনো চমক ছিল না। তার মনের মানচিত্রে জাপান জাঞ্জিবর প্রায় একই। তবু নানাভাবে শুনে জাপান যে কাছাকাছি একটা দেশ তা মোটামুটি বুঝতে পারত। কিন্তু সেই জাপানের লড়াইয়ে নামার সঙ্গে তার বা এদের যে কি আসে যায় বুঝতেই পারছিল না বাসু। ও ভাবছিল যুদ্ধ তো চলছেই কবে থেকে। আর এক দল নামল লড়াইয়ে। নামুক।

একজন বলছিল, 'আরে বাবা জাপান যে তাক্ করছিল, এ তো জানা কথাই। তোজো আসার পর থেকেই আমেরিকা কেমন চাল বদলাচ্ছিল দেখছিলেন না। এ একেবারে জাপ্ ট্যাকটিস্।'

'যাই হোক এটা কিন্তু ট্রেচারী হল।' আর একজন কে যেন বললে।

'যুদ্ধে আবার ট্রেচারী কি মশাই? আনফেয়ার বলে কিছু নেই। যেমন তেমন করে হয় মারো না হয় মরো।'

'কি বললে মশাই রেডিয়োয়?' আর এক গলা কৌতূহলে ফেটে পড়ছিল।

'সাদা সরল—বেশ ইজি কথা—যা বলে—' পরিহাসের সুরে টিপ্পনী কেটে এক ভদ্রলোক অবিকল রেডিয়ো সংবাদ ঘোষকের সুর ভাষা নকল করে জবাব দিল, 'বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান আজ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে, জাপানী বিমান বহর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ—'

কথার মধ্যেই রসিক আর এক ছোকরা ফোড়ন কেটে উঠল, 'হাওয়াইকে হাওয়া করে দিয়েছে।'

এক কোণে হাসির একটা স্রোত বয়ে গেল ছোকরার কথায়। 'ঠিক হয়েছে। বেটারা এবার বুঝুক। গোদের ওপর বিষফোড়া। নাও এবার সামলাও। য়ুরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া—একেবারে তিনদিক থেকে বেঁধে মার।'

'অ্যাটাক্‌টা তাহলে একসঙ্গে ওয়াহু আর পার্ল হারবারের ওপর হয়েছে।' বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন অনেকটা আপন মনেই।

'আজ্ঞে, ম্যানিলার ওপরও।' পাশের ভদ্রলোক যোগ করলেন।

ট্রামটা কলেজ স্ট্রীট জংশনে এসে গেল। নামল কয়েকজন। চড়ল কিছু লোক।

গৌরাঙ্গ বললে নীচু গলায়, 'বাজার বেশ গরম রে আজ বাসু।'

বাসু মাথা নাড়ল।

চিঠির জবাব আসছিল না। বাসু উন্মুখ হয়ে এ-বেলা ও-বেলা পিয়নের পথ চাইছে হঠাৎ সিভিক গার্ডের ডিউটিতেও কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেল।

সমস্ত কলকাতা শহরটা আচমকা যেন খৈ ফোটার মতন ফুটছে। সকাল, দুপুর, বিকেল—যেখানে যাও, যেখান দিয়ে যাও, রাস্তাঘাট ট্রাম-বাস, রেস্টুরেন্ট—খালি জাপান আর জাপান।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে ঘটনাগুলো যেন লাফ দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছিল। পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বৃটেন আর আমেরিকা। সিঙ্গাপুরের ওপর জাপ বিমানের আক্রমণ। দুটো ক্রুজার জলে ডুবেছে। উত্তর মালয়ে জাপানী সৈন্য নেমে পডল। থাইল্যাণ্ড অ্যাটাক করেছে। সাংহাই শহর গেল।

সরকারীভাবে বলা হল, আসামের এলাকার ওপর একটা জাপানী বিমান এসে পড়েছিল। পালিয়েছে। আসাম এখন যুদ্ধ এলাকা।

এসব ঘটনাব সঙ্গে বাসুব কোনো যোগ নেই, তবু শুনতে হচ্ছে। শুনছে।

কিন্তু মীনুদির হল কি! চিঠির জবাব দেয় না কেন? বাসু অস্থির হয়ে উঠছিল।

গৌরাঙ্গ বলে, আর একটা চিঠি লেখ। প্রথম চিঠিটা হয়ত পায়নি।

বাসুর ভয় হচ্ছিল, চিঠিটা না মোহিতকাকার হাতে পড়ে থাকে। যদি তাই হয়—তবে তো ক্রীক রোয়ে যাবার পথ বেশ ভাল করেই বন্ধ হল।

কি করবে না করবে ঠিক করতে না পেরে চিঠিই দিল বাসু আর একটা।

যুদ্ধ ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে কলকাতা। কলকাতার মানুষও যেন।

সিঙ্গাপুরে রোজ বোমা পড়ছে। রেঙ্গুন থেকে মাত্র চারশো মাইল দূরে আছে জাপানীরা। প্রিন্স অফ ওয়েলস, রিপালস ডুবেছে। বাবা, এ-একেবারে জার্মানী ব্লিৎসক্রীগ। ঠেলা সামলাও এবার।

রেঙ্গুন, রেঙ্গুন আর রেঙ্গুন। গৌরাঙ্গ পর্যন্ত রেঙ্গুন রেঙ্গুন করে লাফাচ্ছে। মীনুদির কথা আর যেন তার কানেই ঢোকে না। দ্বিতীয় চিঠিরও কোনো

জবাব এল না। মনের কষ্টটষ্টগুলো কথা বলে একটু হাল্কা করবে বাসু সে উপায় নেই। গৌরাঙ্গ এখন রেঙ্গুন কলকাতার হিসেব কষছে। জাপানী প্লেনের ঘাঁটি থেকে কলকাতা মাত্র ন'শ মাইল। 'বুঝলি বাসু, ন'দিনও আর লাগবে না। জান বটে মাইরি, লড়ছে শালা ওরাই, জার্মানীকেও ছাড়িয়ে গেল।' গৌরাঙ্গ বলছিল চা খেতে খেতে। কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে।

সে কথার কোনো জবাব দিল না বাসু। ও ভাবছিল মীনুদির কথা। একটা পরামর্শ করবে বলে গৌরাঙ্গকে নিয়ে নিরিবিলি এক চায়ের দোকানে চা খেতে এল। এখানেও সেই জাপান। গুম হয়ে বসেছিল বাসু। মুখ গম্ভীর করে।

রাগটা অন্য ভাবে ফেটে পড়ল। চায়ের কাপটা ঠেলে দিয়ে বাসু তাকাল ঘাড়-হেঁট, বিড়ি-ফোঁকা টিঙটিঙে লোকটার দিকে। তেল চিটচিটে কালো দেড় বিঘতের একটা কাঠের বাক্স সামনে রেখে বসেছিল গুপীবল্লভ।

'এটা কি হয়েছে হে গুপী?' বাসু কড়া চোখে, খেঁকানো গলায় ধমকে উঠল, 'চা না ঘোড়ার পেচ্ছাপ। চিনির নামগন্ধ নেই।'

ঠোঁট থেকে বিড়ি নামিয়ে গুপী একটুক্ষণ মিটমিট করে চাইল।

'চিনি কম হয়েছে বাসুবাবু? ও কেষ্টা, কি চা দিয়েছিস বাসুবাবুকে। বেটাদের নিয়ে আর পারলুম না।' গুপী হতাশার ভঙ্গি করলে, 'দে, চা-টা ঠিক করে দে।'

'চায়ের দাম তো তাল বুঝে চার পয়সা থেকে ছ'পয়সায়, চড়িয়ে দিলে রাতারাতি।' বললে বাসু বিরক্তির সুরে।

'কি যে বলেন বাসুবাবু, সবই তো জানেন—' গুপী হে হে করে হাসিকান্নার ঢঙে বললে, 'একসের চিনি যোগাতে ঘাম ছুটে যাচ্ছে। চিনিই নেই। সব চিনি এবার জাপানীরা লুটেপুটে খাচ্ছে। একাই।'

'তোমার চিনি বুঝি ডিরেক্ট জাভা থেকে আমদানি হচ্ছিল?' গৌরাঙ্গ ওপাশ থেকে টিপ্পনী কাটল।

একটা বোকা বোকা বিগলিত হাসি হাসল গুপী। খস্ করে দাঁতে চাপা বিড়িটা ধরিয়ে নিলে।

'এ ভাবে ছুরি চালালে দোকান তোমাব লোপাট হয়ে যাবে গুপী।' নতুন চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে বাসু বললে নিজের জায়গাটিতে বসে।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাসুবাবু। যা লোক পালাবার হিড়িক লেগেছে পরশু থেকে। ক'দিন পরে আব দোকানে খদ্দেরেব পা পড়বে না। এমনিই তালা ঝুলোতে হবে।'

রাস্তায় নেমে হঠাৎ গৌরাঙ্গ বললে, 'গুপী বেটা কিছু মিথ্যে বলেনি বে বাসু। সত্যিই বহু লোক ভেগে পডছে। রেঙ্গুনের পরই চাঁটগা আর কলকাতা।'

সে-কথার কোন জবাব দিল না বাসু। গলির মোড়ে এসে বললে, 'দুটো সিগারেট কেন গৌরে!'

গৌবাঙ্গব কাছে পয়সা ছিল না। ধারেই পাওয়া গেল। সিগাবেট ধরিয়ে ক'পা এগিয়ে এসে বাসু বললে, 'দু—দু'খানা চিঠি ছাড়লাম মাইরি তোর কথা শুনে।'

'জবাব পাস নি?' গৌরাঙ্গ শুধাল।

'না!' মাথা নাড়ল বাসু।

একটু চুপ চাপ।

'হল কি, বল্ তো?' গৌরাঙ্গ বললে। একটু থেমে, 'তুই যাই বলিস মেয়েটা ভাই খেলুড়ে।' গৌরাঙ্গ বাসুর দিকে চাইল। কী ভেবে বললে, 'জবাব দেবে না ও। তুই নিজেই যা একদিন। এস্পার ওস্পার করে আয়।'

'আমিও ভেবেছি তাই। পরশুদিন দুপুরে যাব। কচ্ছপ বেটা তখন থাকে না।'

পরশু নয়, আরও একটা দিন পিছিয়ে গেল। পল্টুদা ওকে লালবাজারে পাঠিয়েছিল। সারাটা দুপুর সেখানে চরকি পাক খেল বাসু; বিকেল গড়িয়ে গেল শুধু একটা তিন লাইনের সই করা নোটিস নিয়ে আসতে।

লালবাজারও কিছু কমতি নয়। সেখানেও সেই জাপান-জাপান রব। সারাটা দুপুর বাসু কত যে উড়তি-পড়তি কথা শুনল। কেউ বলছিল, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট পার হয়ে গেছে হে। ডেথ্ ফাইট্ দিচ্ছে বেটারা। রেঙ্গুন তো হেভিলি বম্ব্ড্। কলকাতা আর মোটেই সেফ্ নয়।

কি মিত্তির সাহেব, আজ হাওড়া শেয়ালদার অবস্থা কেমন? কত লোক গেল আজ?

পাণ্টা জবাবে মাথার টুপি খুলে ঘাড় মুখ মুছতে মুছতে বললে মিত্তির, মাছি গাদা হয়ে যাচ্ছে ভাই। ট্রিমেণ্ডাস রাশ।

অন্য এক উড়তি মন্তব্য, বেলা দশটার মধ্যে থারটি পকেটমারের কেস। অন্‌লি হাওড়া স্টেশনেই।

এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ, ব্রাদার! পকেটমার, মেয়েচুরি, ছেলে হারানো, কুলী ঠেঙানো,—বসো নিয়ে একবার টেবিলে—ডাঁই হয়ে রয়েছে।

এ-সব কথা শুনতে শুনতে বাসুর মাথা ধরে উঠেছিল। কখন এসেছে, সেই কোন্ বেলা দশটারও আগে—তারপর ঠায় দাঁড়িয়ে। পেটে এক কাপ চা ছাড়া কিছু নেই। খিদেয় পেট মোচড় মারছে। একবার এখানে তো আর একবার ওখানে যাও। কিছু বলবার উপায় নেই, বললে বলে, দাঁড়াও হে ছোকরা—কাজকর্ম ফেলে রেখে তোমার নোটিস খুঁজব নাকি!

বেলা গড়িয়ে দুপুর হল। দুপুরও যায় যায়। বাসু ছটফট করছিল। রাগ হচ্ছিল পল্টুদার ওপর। স্রেফ ভাঁওতা মেরে ওকে ঠেলে ঠুলে পাঠিয়ে

দিল লালবাজারে। ইট্ ইজ নট্ মাই ডিউটি। মনে মনে আক্রোশে আগুন হয়ে বাসু পণ্টুদাকে বলছিল। পনেরো টাকায় এত হয় না।

মীনুদির বাড়ি যাবার শেষ ইচ্ছেটাও নিভে গেল তিনটে বেজে যাবার পর। না, আজ আর হল না। সব বরবাদ হয়ে গেল। হতাশ হয়ে মুষড়ে-পড়া-মনে সাড়ে তিনটের সময় তিন লাইনের টাইপ করা এক নোটিস নিয়ে বাসু লালবাজার থেকে বেরুল।

পরের দিন সকাল যেন আর কাটছিল না। শীতের বেলা, দেখতে দেখতে অন্যদিন দশটা এগারোটা বেজে যায়। আজ আর বেলা এগুচ্ছে না। গৌরাঙ্গকে নিয়ে বার-দুয়েক এ-দোকান সে-দোকানে চা খেল বাসু। পাড়ায় ঘুরল। লালবাজারের খবরাখবর দিল, যা সব শুনেছে তার বৃত্তান্ত। বললে, 'কাছা-কোঁচা খুলে সব নাকি ছুটছে। একদিন হাওড়া আর শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে দেখে আসতে হবে। কালই যাব। যাবি তুই?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল গৌরাঙ্গ।

একসময়ে বাসু বললে আবার, 'আজ ক্রীক রোয়ে যাচ্ছি দুপুরে, বুঝলি।'

'যা। হেস্তনেস্ত করে আয় একটা।

'হ্যাঁ, এ মাইরি ভাল লাগছে না।'

'কার লাগে। তোর লাভারটার হার্ট নেই।' গৌরাঙ্গ সখেদে বলল।

শীতের বেলাও বাড়ল। স্নান সেরে—খাওয়া দাওয়া করে সেজেগুজে বাসু বেরিয়ে পড়ল। সবে একটা বেজেছে। রাস্তায় এসে পান খেল বাসু। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এগিয়ে চলল।

রাস্তায় যেতে যেতে বাসু ভাবছিল, ইস্, কতদিন পরে আজ আবার মীনুদিকে দেখতে পাওয়া যাবে। হয়ত মীনুদি রাগ করেই চিঠি দেয় নি। বাসুর তেজ দেখছিল। এমন কিছু তো বলে নি সে—সে-দিন, রাগের মাথায়

যা বলেছে তার জন্যে হঠাৎ একেবারেই যাওয়া বন্ধ করা হয়ত ঠিক হয় নি। আর হ্যাঁ, ভয় পাবারই বা কি আছে? মোহিতকাকার চোখে না পড়ে—দুপুর দুপুর সে যে-কোনদিনই আসতে পারত।

যাক্‌গে, আজ বাসুকে দেখে মীনুদির রাগ নিশ্চয় পড়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে পড়ল বাসু। পার্কের মধ্যে দিয়েই হেঁটে চলল। শীতের রোদে ভিজে সাবু গাছগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কাক ডাকছে, উড়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর ক'টা চিল। একটা প্লেন গুর গুর করে উড়ে গেল অনেক উঁচু দিয়ে। বেশ লাগছিল বাসুর।

পার্ক পেরিয়ে ক্রীক রোয়ে পা দিতেই বুকটা হঠাৎ এক চাপা উত্তেজনায় ধক্ ধক্ করে উঠল। সামনে তাকাল বাসু। একটা রিক্‌শা যাচ্ছে। মাথায় গাঁটরি এক ধোপাও। আর কোন লোক নেই। নিরিবিলি ফাঁকা রাস্তা। নিঃঝুম। পিচের রাস্তাটার সবটাই প্রায় ছায়া ভরা।

অযথাই একবার তাকাল বাসু। সামনে তাকিয়ে এগিয়ে চলল। ক'পা এগুতেই মীনুদিদের বাড়িটা চোখে পড়ল। দোতলার একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। মোহিতকাকার ঘর। জানলা বন্ধ।

মনে মনে ভীষণ খুশী হয়ে উঠেছে ও। বাঁচা গেছে, কচ্ছপটা বাড়ি নেই। স্বস্তির হাঁফ ফেলে এগিয়ে চলল হাল্কা শরীরে। আস্তে করে শিস দিল একবার।

আরও একটু কাছে আসতেই গেট। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাসু দেখল, সদর বন্ধ, বৈঠকখানা ঘরের জানলাও।

গেট খুলে সদরে এসে দাঁড়াল। এ-বাড়িতে সদর-চৌকাঠের ডান দিকে কলিংবেলের টিপ্ বোতাম। প্রথমে আস্তে করে বোতামটা টিপে হাত নামিয়ে নিল বাসু।

একটু অপেক্ষা করে আবার। শীতের দুপুরে লেপ মুড়ি দিয়ে খুব ঘুম দিচ্ছে মীনুদি। একটু হাসল বাসু মনে মনে।

তিন বারের বার বেলটা টিপতে-না-টিপতেই ভেতর থেকে ছিটকিনি খোলার শব্দ। সদরের দিকে মুখ করে প্রায় পা বাড়িয়ে দাঁড়াল বাসু।

দরজা খুলেই মুখ বাড়াল হিন্দুস্থানী চাকরটা। শিউসরণ।

হাসি হাসি মুখ, দরজার অন্য পাটটা খুলে পা বাড়াতে যাচ্ছে বাসু, শিউসরণ বললে, 'কোহি নেই হ্যায়।'

'দিদিমণি?'

'না।' মাথা নাড়ল শিউসরণ।

'কাঁহা গিয়া?'

'আপনা গাঁও। কাল সব চলা গিয়া। মোকাম বিলকুল খালি।'

চলে গেছে! ঘরবাড়ি খালি করে সটান দেশে। হঠাৎ? কেন?··· এক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে বাসু যেন কী বোঝবার চেষ্টা করছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। মীনুদিরাও বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। বাসুর মনের কোন একটা সতেজ মোটা শিরা যেন পট্ করে ছিঁড়ে গেল। গুলিয়ে যাচ্ছিল সব। চোখের সামনে ফুলপাতা খোদাই সদরের ভারি কপাট দু'টো আবছা হয়ে গেছে। শিউসরণের মুখটাও দেখতে পাচ্ছে না বাসু। ভেতরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মীনুদি যেন হেঁটে চলে গেল পিছন ফিরে। বুকের বাতাস গলায় এসে থেমেছে। নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে বাসু!

শিউসরণ কপাটটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে কপাটটা ধরে ফেলল বাসু।

'কবে আসবে ওরা?' রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলে বাসু।

'কিয়া মালুম!'

হাত সরিয়ে নিল বাসু। আস্তে আস্তে সদর বন্ধ করে দিল শিউসরণ। ছিটকিনি তোলার শব্দ শুনল বাসু।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা পা করে এগিয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। অবশ হাতে গেট খুলে বাইরে এল। রাস্তায়। দাঁড়াল। তাকাল বাড়িটার দিকে, নীচে ওপরে। জানলা দরজা সব বন্ধ। যেন এ-বাড়িতে কোন কালেই লোক থাকত না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাসুর মনে হল - ক্রীক রোয়ের বাড়ি আর রাস্তা সব যেন হুস্ করে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে কোন্ অন্ধকারে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, অবশ পায়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল বাসু মুখ নীচু করে। পিচের রাস্তাটা যেন আরও ছায়া জমে জমে কালো হয়ে গেছে। কোথাও একটু শব্দ নেই।

মীনুদিরা চলে গেল! একবারটি জানাল না তাকে! কালও যদি আসতে পারত বাসু, দেখা হত। পন্টুদার ওপর রাগে ক্ষোভে, সর্বাংগ হিংস্র হয়ে উঠছিল বাসুর। শালা, শুয়ারের বাচ্চা। আমি মারব শালাকে। সিভিক গার্ড ছেড়ে দেব। লবাবি ফলাবার লোক পায়নি। তুমি হারামি মদ মারবে, ছুঁড়ি নিয়ে ঘরে থাকবে—আর আমি টং টং করে ঘুরে বেড়াব তোমার কাজে।

একটা কুকুর পায়ের কাছে এসে পড়েছিল। হঠাৎ যেন পন্টুদাকেই কাছে পেয়েছে বাসু, অদ্ভুত হিংস্র হয়ে প্রাণপণে এক লাথি চালালো বাসু। কুকুরটার পেটে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে কুকুরটা ছিটকে গিয়ে পড়ল রাস্তার আর এক পাশে। পড়েই একটা পাক খেয়ে উঠে দাঁড়াল। এক-ছুটে তফাতে সরে গেল খানিক। তারপর কর্কশ টানা একঘেয়ে চিৎকার। নিস্তব্ধ পাড়াটা কুকুরের আর্তনাদে ভরে গেল।

গ্রাহ্যও করল না বাসু। হাঁটতে লাগল। আর হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, এই রাস্তাটা বড্ড ঠাণ্ডা, একদমই অচেনা—যেন কখনো সে এ-পথে

আসেনি। এমনি বিশ্রী আর ঠাণ্ডা আর অচেনা, দম বন্ধ বন্ধ লেগেছিল আর একদিন পথ হাঁটতে, যে-দিন তার বাবাকে পুড়িয়ে নিমতলার শ্মশান থেকে ফিরছিল বাসু। তেমনি ফাঁকা, সব—সমস্ত ফাঁকা, রাস্তাঘাট বাড়ি কিছুই নেই, শুধু একটা হু হু বাতাস।

টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়ল দু ফোঁটা। সব ঝাপসা। গলার কাছে অসহ্য এক আবেগ কান্নায় ভিজে ভার হয়ে পুঁটলির মত পাকিয়ে রয়েছে।

চোখটা শার্টের হাতায় মুছতে গিয়ে ক্রীক রোর মোড়ে দাঁড়িয়ে, শীতের এই মাঝ-দুপুরে কেঁদে ফেলল বাসু।

পনেরো

নতুন বছরের শুরুতেই সুচারু অফিসে আসছিল না। পর পর ক'দিনই এল না।

অফিসে এসে নিজের জায়গায় বসতে বসতে সুধা রোজই তাকাত। একরাশ মাথা, টেবিল চেয়ার, ফাইলের স্তূপ, আলমারির আড়াল দিয়ে দেখা যেত, দূরে সুচারুর চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। আসেনি সুচারু।

মনে মনে কেমন এক উদ্বেগ অনুভব করতে শুরু করেছিল সুধা। হঠাৎ কি হল সুচারুর—জানুয়ারীর গোড়াতেই অফিস কামাই শুরু করলে। অসুখে-বিসুখে পড়ল নাকি!

সুধার ইচ্ছে হত খোঁজটা নেয়। এমন কিছু কঠিন নয় কাজটা।

সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে নিশ্চয় কোন চিঠি পাঠিয়েছে সুচারু। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই ব্যাপারটা জানা যায়। হ্যাঁ, তা যায়। কিন্তু সুধা ভেবে দেখল, এই সামান্য প্রশ্নটাও তার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

সুধার পাশের টেবিলেই বসে অমলাদি। বন্ধু। এক সঙ্গেই কাজে ঢুকেছে; অমলাই সুধাকে খোঁজ খবর দিয়ে এ-অফিসে টেনে এনেছিল, হৃদ্যতা যথেষ্টই—তবু তার কাছেও সুধা মুখ ফুটে কোনদিনও সুচারুর বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। লজ্জা করে।

অথচ অমলার স্বভাব ওপর ওপর খুবই হাল্কা। ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেই সব সময়। সুচারু-সুধার ভাবসাব নিয়ে কত রকম ঠাট্টাই যে করে। আপত্তি, অভিমান, রাগ-বিরাগ করেও সুধা হার মেনেছে। অমলার ঠোঁট বন্ধ হয় নি; হবেও না। সুধা জানে, এই পরিহাস রঙ্গ-রসিকতার বাইরে অমলাদির মনে কোন মন্দ কিছু নেই। সুচারু কেন অফিসে আসছে না—এই নিয়ে দু'চার বার কৌতূহল কী আগ্রহ জানালে বাস্তবিকই তেমন কিছু মনে করবে না অমলাদি, তবু কই সুধা তো কথাটা বলতে

পারে না। অমলা নিজেই একবার করে কথাটা পাড়ে। আজ আবার পাড়ল।

'সত্যি, কি ব্যাপার বলত, সুধা! ভদ্রলোকের হল কি?

'কে জানে!' সুধা চোখ নিচু করে জবাব দিল, কাজ করতে করতে।

'কে জানে বললে তো চলে না, এবার একবার জানবার চেষ্টা কর।' অমলা আড় চোখে চেয়ে মুখখানা গম্ভীর করে বললে।

'আমার দায় কি।' সুধা আঙ্গুল দিয়ে খাতার পাতা উল্টে গেল। মনোযোগটা আরও নিবিড় করবার চেষ্টা করলে।

'তোর দায় নয় কার দায়, তোরই বন্ধু সুচারুবাবু। আমার বন্ধু হলে দেখতিস কবে বাড়ি বয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতুম।' অমলা চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে গল্প জমানোর মতন বেশ ঢিলে ঢালা হয়ে বসল। মুখটা সামান্য এগিয়ে দিলে সুধার টেবিলের ওপর।

হাতের পেন্সিল নামিয়ে রাখল সুধা। এরপর কাজ করার চেষ্টা করা বৃথা। বললে ঠোঁট টিপে হেসে, 'তোমার বন্ধুই বা নয় কেন, ভাবসাব আছে, কথাবার্তা বলো।'

'তেমন বন্ধু এ-অফিসে প্রায় সকলেই আমার। তোরও।' অমলা এবার মুচকি হাসল, 'শুধু তাতেই কি বন্ধুত্ব হয়, আরও একটু বেশি চাই। এই ধর যেমন একসঙ্গে অফিস থেকে বেরুনো, বাড়িটাড়ি পৌছে দেওয়া, একটু বেড়ান, চা-টা খাওয়া, অফিসে একদিন দেখতে না পেলে মন খারাপ, মুখ ভার হওয়া—এমনি সব আর কি!'

'আবার ওই সব বাজে কথা শুরু করলে তুমি!' সুধা ভুরু কুঁচকে বললে।

আমলা হাসল। 'তুই এখনো গেঁয়ো থেকে গেলি, সুধা। এ-বয়সে অমন একটু মেলামেশা করলে তোর আমার মতন মেয়েরা কোথায় আহ্লাদে, গর্বে চলনে-বলনে খই-ফোটা হয়ে ফুটবে—তা নয় তোর কেবল ঢাকি ঢাকি, আড়াল আড়াল ভাব।'

'আহ্লাদটা কিসের ?' সুধা গায়ের আঁচলটা একটু ঘন করে জড়িয়ে নিল। বেশ শীত করছে ওর। সোয়েটারটা ছেঁড়া বলে ব্লাউজের তলায় পরে আসে। সে-সোয়েটারের হাতা নেই, বুক পিঠের খানিকটা আলগা বুননিতে ফাঁক হয়ে রয়েছে। শীত যায় না।

অমলা চা আনতে দিয়েছিল। বেয়ারা চা নিয়ে আসতে ভাগাভাগি করে চা নিল দু'জনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে অমলা বললে 'আহ্লাদটা কিসের তা বুঝতে পারিস না ?'

'না।' সুধা হাসিমুখে মাথা নাড়ে।

'আমাদের তো বিয়ে থা ঘরসংসার হবে না।' অমলা মুখখানা ভাবুক ভাবুক চেহারা করে বলছিল, 'সংসার টংসারের কথা না হয় বাদই দে— সে সব তো পরে, আগে বিয়ে, নতুন মানুষের সঙ্গে মন জানাজানি ভালবাসাবাসি আমোদ-আহ্লাদ, মান-অভিমান—কত কিসের সুখ; কপালে ত সে-সব জুটবে না ভাই, তাই বরের অভাবে একটা ব্যাচেলার ছেলের সঙ্গে খানিক বেড়িয়ে চেড়িয়ে মেলামেশা করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান।'

হতাশ হতাশ গলায় নিশ্বাস চেপে, দুঃখ-দুঃখ ভাব করে যদিও পরিহাস করছিল অমলা এবং কথার শেষে একটা লম্বা মতন নিশ্বাস ফেলে গাল কুঁচকে হাসল, তবু—সুধা বুঝতে পারল, অমলাদি আসল নিশ্বাসটাও চেপে রাখতে পারে নি, কথার ফাঁকে তা বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

সুধা চট্‌ করে কোন জবাব দিতে পারল না। দু'জনেই চুপ।

একটু পরে সুধা বললে, 'সত্যি করে একটা কথা বলব, অমলাদি !'

অমলা চোখ তুলে চাইল।

'তুমি একটা বিয়ে-থা করে ফেল এবার।' সুধা হাসি মুখ করে বললে।

'বিয়েটা আমার হাতের মুঠোয় কি না।'

'বাড়ির লোককেই না হয় বলো।'

'দুধ দেওয়া গরুকে কেউ সময়ে বিলিয়ে দেয় না।' অমলার মুখ হঠাৎ কঠিন এবং কালো হয়ে উঠেছিল, 'তোর চেয়ে সংসারকে আমি বেশি চিনেছি, সুধা। এখানে শুধু স্বার্থ আর স্বার্থ। বাপ মা ভাই বোন বন্ধু স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা নড়ে না। তুমি কতখানি আমার কাজে আসছ তার ওপর ভালবাসা টালবাসা।'

অমলার গলায় প্রচুর ক্ষোভ আর তিক্ততা।

সুধা এ-বারও খানিকটা চুপ করে থাকল। তারপর কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে হাল্কা সুরে বললে, 'তোমার সেই রজনীবাবুর কি হল অমলাদি?'

'কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে।'

'সে কি, ভদ্রলোক না ওকালতি করছিলেন?' সুধা প্রশ্ন করলে।

'বাপের পয়সায় ল' পাশ করে ইদানীং ছোট আদালতে যাওয়া আসা শুরু করেছিল। সিগারেট চায়ের পয়সা-টয়সা হয়ত হত আদালতে গিয়ে। তার বেশি কিছু না। বাপের হোটেলেই যখন মাপা অন্ন রয়েছে তখন বাড়ির লোকের সঙ্গে মধুপুরে চলে যাওয়াই ভাল, বোমা খেয়ে মরে লাভ কি! প্রাণ বাঁচলে তবে না ওকালতি।' অমলা ঠোঁট দিয়ে একটা উপেক্ষার শব্দ করলে।

'মধুপুরে কি বাড়ি আছে নাকি ওঁদের?'

'কে জানে! না থাকে, ভাড়া নেবে। এই যে দলে দলে লোক পালাচ্ছে—সবারই কি বাইরে বাড়ি আর গোলাভরা ধান আছে। টাকা পয়সা থাকলেই হল। বাকি ব্যবস্থা হতে কতক্ষণ।' একটু থামল অমলা। বললে তারপর, 'যাবার আগে একদিন হুট্ করে দেখা করতে এল। মুখ ফ্যাকাশে, মাথার চুল রুক্ষ। বললাম, খুব ভয় পেয়েছ দেখছি। জবাবে বললে, রিয়্যালি অমলা ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছি। মৃত্যু ভয় যে এমন সাঙ্ঘাতিক জানতুম না। কলকাতা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই।'

'ভীষণ ভীতু তো।' সুধা বললে।

'বলতে! আবার বলে কি, জানিস? বলে, বিয়ে থা করলাম না—ম্যারেড্ লাইফ এন্‌জয় করলাম না, জীবনের বারো আনা সুখ বাকি রেখে মরে যেতে হবে ভাবলেই আমার কান্না পায়। অমলা রজনীর স্বর নকল করে বলল। তারপর হাসল। 'জবাবে আমি কি বললুম জানিস, সুধা? বললাম, তা এবার মধুপুরে গিয়ে একটা বিয়ে করে ফেল টপ্ করে। সামনেই তো বিয়ের মাস রয়েছে।'

'তাই বোধ হয় করবে।' সুধা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল।

'তা আর বলতে। ওর মুখ চোখ দেখে আমি বুঝেছি।'

'আশ্চর্য।' সুধার মুখটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে গেল।

'কিসের আশ্চর্য—?' অমলা শুধোল, 'মরবার আগে ম্যারেড লাইফ এন্‌জয় করতে চাওয়া?'

সুধা তাড়াতাড়ি যেন কথার জাল ছাড়িয়ে চলে আসবার চেষ্টা করে বললে, 'না—না, সে-কথা নয়; বলছি—এই সব কথাবার্তা। ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কি করে এ-সব কথাবার্তা বলেন, তাঁর একটু লজ্জাও তো করা উচিত।'

'না, কথাবার্তা সহজ ভাবেই হওয়া ভাল। লজ্জাটজ্জার এতে কি আছে। খোলাখুলি বললে তবু বোঝা যায় মনের ভাব, রেখে ঢেকে হুঁ-হাঁ করলুম—আর ডুবে ডুবে জল খেলুম, এ-আমার দুচোখের বিষ। যেমন তুই।' অমলা কথা শেষ করে হেসে ফেলল।

'যাঃ—।' সুধা মুখ ঘুরিয়ে নিলে, 'ঘুরে ফিরে সেই আমায় নিয়ে।'

গল্পটা একটু বেশিক্ষণই হয়ে গেছে। অমলা আর কিছু না বলে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সুধাও পেন্সিল তুলে নিয়ে কাজে মন দিল।

চেষ্টা করেও কাজে মন দিতে পারল না সুধা। নানা কথা তার বার বার মনে আসছে যাচ্ছে। সুধা কখনো ভাবছিল, সুচারু যে

আসছে না—তবে কি সেও কলকাতা ছেড়ে বোমার ভয়ে পালিয়ে গেল! পালানোর মতন ছেলে তো ও নয়। কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে কে যে কেমন, বোঝা মুশকিল। পয়সা আছে বলে ওদের পাড়ার উকিল-বাড়ির সবাই যেমন পালায়, দেশে বাড়িঘর আছে বলে মোহিতকাকা —তেমনি আবার অভাব অনটনের সংসার সাতকুলে-কেউ-না-থাকা পারুল বৌদিরাও কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে ফেলে, বাড়িঅলা ভাড়ার তাগাদার বদলে বাড়ি জিম্মা দিয়েই কৃতার্থ হয়ে পালায়। বোঝা সত্যিই মুশকিল।

কখনো বা সুধা ভাবছিল অন্য আর এক কথা। অমলাদি যে বললে, সহজ ভাবে খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। সত্যি কি সেটা ভাল! আমি মেয়ে, ও একজন পুরুষ। কথা বলাবলিতে এমনিই একটু বাধো বাধো লাগে। তাও না হয় সাধারণ কথা দু'শটা বলা যায়। তা বলে এসব বিয়ে-থা—ভালবাসা-টালবাসার কথা। ছি, ছি। এ যেন অনেকটা নিজের আলগা গা দেখানোর মতন। সত্যিই এ-সবে সুধার লজ্জা আছে, ভয়ও। সে যে-সংসারে মানুষ, যে আবহাওয়ার মধ্যে, তাতে অজানা অচেনা অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করার কথাই আগে কেউ ভাবতে পারত না। ওদের পরিবারের যে আদবকায়দা, শালীনতা-জ্ঞান, লজ্জা-সংস্কার-সহবতের শিক্ষা, জ্ঞানে অজ্ঞানে সুধারা তার অনেক কিছুই নিয়েছে। অনেক আবার নিতে পারে নি, বা নিয়েছিল, কলকাতায় এসে একে একে খসে গেছে। অনেক জিনিস আবার বাবা পছন্দ করতেন না বলে মাকে আলগা-হাত হতে হয়েছে। তবু এ-কথা সত্যি, সমবয়সী অনাত্মীয় পুরুষ সম্পর্কে আজকালকার এই কলকাতা শহরের মেয়েদের মতন অত খোলামেলা মন হতে তারা পারে নি। আজও পারে না।

ভাবতে বসলে সুধা নিজেই অবাক হয়ে দেখে, প্রয়োজনে আর তাগিদে তার নিজের জ্ঞানেই তাদের পরিবারের কত না-না, ভ্রূকুটি, ছি ছি

আস্তে আস্তে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রকান্তর মেয়ে চাকরি করতে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে, একা একা ভিড়ে রাস্তাঘাট হাঁটছে, অফিসে যাচ্ছে, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে, কাজ করছে, তাও তো আজ সহ্য হয়ে গেছে।

সুধাও দেখছে, একটু একটু করে তার নিজেরই কত সংকোচ, আড়ষ্টতা, ভয় এবং ভীরুতা ভেঙে গেল। সুচারু আজ তার পাশে যত সহজ, দু-মাস আগেও কি এতটা ছিল! না। কখনোই না।

এ-সবই সত্যি, তবু অমলাদি যা বললে, ততখানি খোলাখুলি, মন-মুখ বে-আবরু করে মেশা—এ সম্ভব নয়। অন্তত সুধার পক্ষে। এখনো এই সব জিনিসকে সুধা বেহায়াগিরি আর নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। পারবেও না হয়ত কোনদিন।

গায়ে ঠেলা লাগতেই চমকে উঠল সুধা।

'কিরে তুই যে একেবারে ধ্যানে বসেছিস! কি ভাবছিস এত? অমলা অবাক হয়ে বলছিল।

'কিছু না। অমনি—।' সুধা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখে চোখে একটু জল দিতে বেরিয়ে গেল। মাথাটা কেমন টিপ টিপ করছিল তার।

সুধা কল্পনাই করতে পারে নি অফিসে আজই যার কথায় কথা উঠে সারাটা দুপুর বিকেলই পাঁচকথা ভাবতে হল, সেই লোকই সন্ধ্যের দিকে আচমকা তার বাড়িতে এসে হাজির হবে।

তখন সুধা অফিস থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে চা খেয়েছে। ওদের ঘরে মাটিতে পাতা বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা উপন্যাসের পাতা ওলটাচ্ছিল, অরতি পাশে হাঁটু মুড়ে গায়ে কাঁথা চাপা দিয়ে গুন গুন করে পড়ছিল। মা রান্নাঘরে। ঘরের জানলা বন্ধ। দরজাটাও আধ-ভেজানো।

আরতির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সুচারু এসে হাজির। প্রথমে আরতিই বাইরে বেরুল, রত্নময়ীও রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। গলার স্বরটা চিনতে পেরে সুধাও অবাক হয়ে বাইরে এল।

সুচারুই। ঢাকা বারান্দার চোরা এক চিলতে আলোয় ওর মুখটা পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছিল না।

'উঃ, এ যে দেখছি বেশ শীত কলকাতায়!' গায়ের কোটটা বুকের কাছে আরও ঘন করে জড়াবার চেষ্টা করে সুচারু বলছিল, তারপর,—আপনারা কেমন আছেন, মাসিমা?'

'শীতে বাইরে কেন, ঘরে তো আগে চলো।' রত্নময়ী নিজেই এগিয়ে গিয়ে বাসুর ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিলেন। দিয়েই একবার জানলাটার দিকে তাকালেন। বন্ধই আছে।

ঘরে ঢুকে সুচারু বললে, 'আমার রীতিমত সন্দেহ হচ্ছিল। আপনাদের নীচের তলায় পা দিয়ে দেখি একেবারে ভোঁ ভোঁ—অন্ধকার। ভাবলুম বাড়ি সুদ্ধু সবাই বুঝি কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছেন।' সুচারু হাসল। আরতির মাথাটা আলগা হাতে একবার নেড়ে দিল আদর করে।

'নীচের তলায় পারুলরা বাঁধা ছাঁদা শেষ করেছে। শুনছি গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারলে কালই যাবে।' রত্নময়ী বললেন, 'বাতিটাতি ওরা আজকাল জ্বালেই না একরকম ভয়ে।'

'আপনারাও কি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন নাকি?'

'আমরা!' রত্নময়ী শেষ-অক্ষরে কেমন এক করুণ উপহাসের সুর টেনে একটু থামলেন, 'আমাদের আর যাবার জায়গা কই!'

সুচারু কি ভেবে রত্নময়ীর দিকে চোখ তুলে হাত নেড়ে বললে, 'জায়গা থাকলেও এখন কাউকে যেতে আমি বলি না, মাসিমা। এ অনেক ভাল।'

সুচারুর কথায় রত্নময়ী অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলেন।

'কলকাতা ছেড়ে পালাবার হিড়িকে যে কাণ্ডটা হচ্ছে, আপনি চোখে না দেখলে তা ভাবতেই পারবেন না।' সুচারু বলছিল, 'মানুষ যেন আর মানুষ নেই, ভেড়ার পাল হয়ে গেছে। একটা নড়ল তো সব নড়ো, একজন রাস্তা ধরল ত সব পিছু পিছু চল।'

সুচারু দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রত্নময়ী ওকে বসতে বলে বললেন, 'ভয়ের, জিনিসে মানুষ ভয় পাবে না, তুমি বল কি!'

'ভয়টা সত্যিই যে কিসের আমি অবশ্য নিজে তা এখনো বুঝতে পারি নি। কলকাতায় থাকলে যদি বোমার ভয়—কলকাতা ছেড়ে যেতে গেলে ভিড়ে হাত পা জখম হবার ভয়, ট্রেনে কাটা পড়ার ভয়—; ভয় কোথায় নয়!' সুচারু চেয়ার টেনে বসল।

'কি জানি। শুনছি সকলের মুখে—ছেলেমেয়েরা বলাবলি করছে, তার থেকেই যা আন্দাজ করছি।' রত্নময়ী মাথার কাপড়টা ঠিক করে নিলেন, 'বেশ শীত, একটু চা খাও।'

রত্নময়ী চলে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুচারুর কথায়। আরতিকে বলছিল সুচারু, 'চা-টা ভাই তোমারই কিন্তু এতক্ষণে তৈরি করে ফেলা উচিত ছিল। যা সুন্দর জিনিস এনেছি তোমার জন্যে, এ আর কলকাতায় পেতে হচ্ছে না।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে সুচারু হাসছিল আরতির দিকে তাকিয়ে।

আরতি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মতন দাঁড়িয়ে, বড় বড় চোখ করে সুচারুকে দেখছিল।

পকেট থেকে কাগজ মোড়া কী যেন বের করে সুচারু হাত বাড়িয়ে দিল আরতির দিকে।

নিতে গিয়েও নিল না আরতি। মাঝ-পথ থেকে হাত গুটিয়ে সুধার দিকে চাইল।

আড়চোখে সুধাকে দেখে নিয়ে সুচারু হেসে বললে, 'নির্ভয়ে নিয়ে নাও। কেউ তোমায় কিচ্ছু বলবে না।' সুচারু থেমে থেমে মাথা নেড়ে নেড়ে এমন ভাবে বললে কথাগুলো যে রত্নময়ীও না হেসে পারলেন না। সুধা ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপল।

হাত বাড়িয়ে নিল আরতি। কাগজ খুলে দেখে চুড়ি। কাঁচের আর গালার। খুব সুন্দর ঝিকমিক করছে। খুশিতে আরতির মুখের চেহারা বদলে গেল।

'প'রে দেখ তো একবার, আমার তো আন্দাজ, হয়ত গলাতেই ঝুলোতে হবে শেষ পর্যন্ত।' সুচারু বললে সুধার দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে।

'এসব আবার কেন?' রত্নময়ী আরতির চুড়ি পরা দেখতে দেখতে বললেন।

'নিয়ে এলুম। বেনারসের জিনিস।'

'তুমি কাশী গিয়েছিলে! কবে?' রত্নময়ী অবাক চোখে তাকালেন।

'বড়দিনের ছুটির আগেই বেরিয়ে পড়েছিলুম—আজ ফিরেছি।'

'না কি? কই শুনিনি তো,' সুধার দিকে তাকালেন রত্নময়ী, 'সুধা কিছু বলে নি।'

কথাটা এমন কিছু নয়, এতেই সুধার কেমন এক অস্বস্তি বোধ হ'ল। মা যেন কি! এমন সব কথা বলে যার মাথা-মুণ্ডু নেই। কে অফিসে আসছে, না-আসছে সে কথা এসে তাকে বলতে হবে। এটা যেন তার কর্তব্য। নিজেকে সামলাতে হঠাৎ আরতির হাতখানা টেনে নিয়ে চুড়িগুলো দেখতে লাগল সুধা। চোখ আর তুলল না।

'উনি জানতেন না। আমি যে যাব, আমি নিজেও জানতাম না। হঠাৎ চলে গিয়েছিলাম।' বললে সুচারু।

আর কোন কথা না বলে রত্নময়ী চলে গেলেন। পিছু পিছু আরতিও।

সুধার দিকে এইবার সরাসরি ভাল করে চাইল সুচারু। 'তারপর, কি খবর বলুন ?'

'আমাদের আবার খবর কি, সবই তেমনি।' সুধা এই প্রথম কথা বললে। তক্তপোশের কাছে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গায়ে সেই পুরোনো আলোয়ান। রত্নময়ীর অর্থহীন কথার জের এখনো সুধাকে গম্ভীর করে রেখেছে।

'ছাত্রী পড়াতে যান নি আজ ? আসতে আসতে আমার মনে হচ্ছিল, এ-সময় দেখা পাওয়া যাবে না হয়ত।'

'ছাত্রীরা নেই। কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে।' জবাব দিল সুধা।

'তাই নাকি ? তবে ত টিউশনিটা হাত ছাড়া হল।' একটু চুপ করে থাকল সুচারু। বললে আবার, 'আপনাদের পাড়া বোধ হয় ফাঁকাই হয়ে গেল এই হিড়িকে !'

'না; তবে অনেকেই গেছে, যাব যাব করছে অনেকে।' সুধা তক্তপোশের ধার ঘেঁষে বসল।

'আপনারাও কি সত্যি সত্যি যাবার কথা ভাবছেন না কি ? আপনার মা দেখলাম খুবই উদ্বিগ্ন।' সুচারু গালের তলায় হাত রেখে টেবিলে কনুই ভর করে তাকাল।

আস্তে করে মাথা নাড়ল সুধা। বললে, 'হ্যাঁ, অবস্থা দেখে শুনে মা খুবই ঘাবড়ে গেছে।'

'আর মেয়ে—?' সুচারু মুখের একটা হাস্যকর ভঙ্গি করলে।

'মেয়েও বা না হবে কেন।' পাল্টা জবাবে সুধা গম্ভীর মুখেই বললে।

মনে পড়ল মার সঙ্গে এই যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তার কথা কাটাকাটি। হ্যাঁ, মা চাইছিলেন, তারাও দেশে চলে যাক। যা হোক যেমন করে হোক মাথা গুঁজে থাকতে পারা যাবে। সুধা বলেছিল, 'থাকাটাই সব নয়, খাওয়া—পেট ভরবে কিসে ?'

একটুক্ষণ চুপচাপ। সুচারু বললে তারপর, 'আপনি বোধ হয় কলকাতা শহরের রাস্তা ঘাট স্টেশনগুলো দেখেন নি। দেখলে আঁতকে উঠতেন।'

'সামান্য কিছু কিছু চোখে পড়ে, অফিসেও রোজ শুনি। এই নিয়েই আছে সকলে।' সুধা গায়ের আলোয়ানটা ভাল করে জড়িয়ে নিল, 'লোকে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, একটু বাড়াবাড়ি রকমের ভয়।' সুচারুর গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন পরিহাস ছিল। ঠোঁট কুঁচকে হাসল ও, 'আগে মফস্বলের লোক কলকাতা শহর দেখতে এসে জীবন সার্থক করত, এখন কলকাতার লোক মফস্বলে পালিয়ে গিয়ে জীবনটা সার্থক করছে।'

সুচারুর কথাবার্তা সুধা ঠিক বুঝতে পারছিল না। এটুকু শুধু ধরতে পারছিল, কলকাতা ছেড়ে লোক পালানোর ব্যাপারটা সুচারু খুশীমনে নিতে পারছে না।

সুচারুর দিকে এক পলক চেয়ে সুধা বললে, 'কলকাতা শহরের অবস্থা দিন দিন যেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে—লোকে আর কোন ভরসায় থাকবে বলুন।'

'এত গুজব ছড়ালে শহরের অবস্থা ভালই বা থাকে কি করে!' সুচারু যেন তর্ক করতে নামল, 'এখানে এই অবস্থা আর বাইরে— আমি তো বাইরে ঘুরে এলাম, এঁরা সব সেখানে যাচ্ছেন আর এমন বাকবাক্যি ছড়াচ্ছেন যে মনে হবে কলকাতা শহরের ওপর বোমা পড়তে দু-এক রাত যা দেরি।'

সুধা সুচারুর রাগের কারণ বুঝতে পারছিল না। হেসে বললে, 'আপনার এত রাগ কেন এদের ওপর? মানুষের দোষটাই বা কি, সিঙ্গাপুর প্রায় যায় যায়, রেঙ্গুনের ওপরও বোমা পড়ছে। পুলিশ কমিশনার শহরের লোককে বলছে, এবার সাইরেন বাজলে সত্যি সত্যি সাবধান হয়ো।'

'হ্যাঁ, তাইত দেখছি। গভর্নমেণ্ট অফিস টফিস, দরকারী কাগজপত্র সরানোর হুকুম হয়েছে—।' সুচারু ঠোঁট কামড়ে হাসল একটু, 'ও খবরটা বুঝি শোনেন নি।'

'কি ?'

'শুক্লপক্ষের রাত্তিরে ধবধবে চাঁদের আলোয় জাপানীরা বোমা ফেলবার জন্যে রেডি হয়ে ছিল। এ-পক্ষটা বোধ হয় মিস হয়ে গেল, আগামী পূর্ণিমাতে আর রক্ষে নেই।'

'কিছু কিছু কানে এসেছে।' হাসল সুধা।

'আর ওই টালা ট্যাংক, হাওড়া শিয়ালদা স্টেশনের খবর ?'

'না।'

'তবে আর কি শুনলেন। জাপানীরা প্রথমে টালার ট্যাংক ফাটাবে, হাওড়া শেয়ালদার স্টেশনগুলো গুঁড়ো করে দেবে. তারপর চারপাশ থেকে বেঁধে মারবে।'

সুধা সুচারুর কথা বলার ধরন দেখে ঈষৎ শব্দ করে হাসল এবার, 'চিড়িয়াখানার বাঘ ভল্লুক ছেড়ে দেবে—এও তো শুনেছি।'

'নাকি ? তবে তো আরও চমৎকার।' সুচারু হো হো করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে এবার গম্ভীর হয়ে সুচারু বললে, 'আমার রাগ দুঃখ যাই বলুন, কিসে হয়েছে জানেন, এই সব দেখে। হাজার হাজার লোককে ভয়ে ভাবনায় দুশ্চিন্তায় আধমরা করে এরা ঠেলে দিচ্ছে মফস্বলে। হাওড়া শিয়ালদা, মায় হাওড়াময়দান, পাতিপুকুর যেখানে যান লোকে জিনিসে, মালে ময়লায়, বমিতে থুতুতে একাকার। মাছি-গাদা হয়ে ট্রেনে লোক চলেছে, ট্রেনে চড়তে না পারলে রাতের পর রাত স্টেশনে পড়ে আছে। কলকাতার ট্যাক্সিবালা, ঘোড়ারগাড়িবালা, ঠেলাবালারা এখন সব এক একজন লাট বেলাট। স্টেশনের কুলী পর্যন্ত। বেকায়দায় পেয়ে গলা টিপে রোজগার করে নিচ্ছে।'

'আপনি নিজে কলকাতায় ছিলেন না, এ-সব দেখলেন কি করে?' সুধা হাসিমুখেই প্রশ্ন করলে।

কথাটার কোন জবাব দিল না সুচারু। প্রশ্নটা যে নিতান্তই অবান্তর সুচারু তা জানত; সুধাও না-জানত এমন নয়। বড়দিনের ছুটির আগে পর্যন্ত অফিস করেছে সুচারু, লোক পালানোর হিড়িক তারও আগে থেকে শুরু হয়েছে। সুচারু তখনও অফিসে; এই নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছে কত।

সুধার দিকে নয়, দরজার দিকে চেয়ে—বাইরের অন্ধকারে কী যেন দেখছিল সুচারু। একেবারেই অন্যমনস্ক।

সুধা অনুমান করতে পারছিল কি না কে জানে—তবে বাস্তবিকই সুচারুর মন আতংক-বিহ্বল শহর কলকাতার মানুষজন, পথঘাট, গাড়ি ঘোড়ার বিচ্ছিন্ন বিচিত্র কতক ছবির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছিল।

সুচারু যেন দেখতে পাচ্ছিল, বাক্স বিছানা হাতাখুন্তি তোলা উনুন ঝেঁটা শিলনোড়া—মানুষে-মালে বোঝাই হয়ে ট্যাক্সি, লরি, ছ্যাকরা গাড়ি, ঠেলা চলেছে রাস্তা দিয়ে, পর পর সারি সারি। ভয়ে ভাবনায় ফ্যাকাশে উদভ্রান্ত মুখ সব। বাচ্চাগুলো নির্বোধের মতন তাকাচ্ছে আর কাঁদছে, মেয়েরা লজ্জাশরম চুলোয় দিয়ে মাছি-গাদা ট্রেনের কামরায় উঠছে, বাসবসন ছিঁড়ে ছিঁড়ুক, কার গায়ে টললো, কার কোলে বসল কে খেয়াল করছে। এর বউ হারায় ত ওর বোন। বাচ্চাগুলোর সর্দিগর্মি, বমি। বুড়িটুড়ি দমবন্ধ হয়ে মরো মরো অবস্থা। পুরুষগুলো ছুটছে, ঘুষ দিচ্ছে, ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে, দেনা করছে, ট্যাক্সিবালার হাতে পায়ে ধরছে, মাথা খুঁড়ছে কুলীর পায়ে। আগে যা পাঁচ এখন তা কমপক্ষেও পঁচিশ।

সুধার এই আলোচনাটা আর ভাল লাগছিল না। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কথা পাড়ল, 'হঠাৎ বেনারস গেলেন যে! বেড়াতে?'

'বেড়াতে ঠিক নয়। এক দায়ে পড়ে গেলাম। তাছাড়া একটু খোঁজ খবরও নেবার ছিল।' সুচারু বলছিল, 'আমার এক বন্ধুর ফ্যামিলিকে

পৌঁছে দিয়ে এলাম। বন্ধুটি বড় ভীতু, নার্ভাস। বুড়ো বাপ মা, নিজের স্ত্রী, বোন—আবার খুড়তুতো এক দিদি, তার বাচ্চাকাচ্চা—তার ওপর লটবহর। বেচারা ভেবে কূল পাচ্ছিল না এই ভিড়ে যাবে কি করে সকলকে সামলে নিয়ে। আমায় ধরে বসল। কি করব, গেলাম।'

'ইভ্যাকুয়েশান করছে?' সুধার মন কোথায় যেন এক মুহূর্ত থেমে গিয়েছিল। অন্যমনস্ক স্বরে প্রশ্ন করল ও। বোন! কথাটা কানে লেগে থাকল।

'হ্যাঁ, ওর দাদা হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসারী করে, বেনারসেই থাকে বাড়ি নিয়ে। সেখানেই গেল সব।'

আরতি এল। চায়ের কাপ হাতে। পিছনেই রত্নময়ী। হাতে ছোট্ট রেকাবি। কী যেন ভেজে এনেছেন।

সুচারু রেকাবিটাই আগে হাত বাড়িয়ে নিল, বললে, 'বেশ খিদে পেয়েছিল, মাসিমা। আমি একলাই এটা সাবাড় করছি কিন্তু, কাউকে ভাগটাগ দিতে পারব না।' বলে আরতির দিকে দুষ্টুমি করে একবার তাকাল।

ভীষণ লজ্জা পেল আরতি। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললে, 'আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন অমন করে। ভাগটাগ আমার চাই না।' ঠোঁট উল্টে 'তুচ্ছ করি' গোছের একটা ভঙ্গি করলে আরতি।

রত্নময়ী হাসলেন। সুধাও হেসে ফেলল। 'আচ্ছা সুচারু—' বললেন রত্নময়ী হঠাৎ, 'তুমি কাশীটাশী বেড়িয়ে এলে, বিশ্বনাথের একটু ফুল বেলপাতা আনলে না!' এত স্নিগ্ধ ও শান্ত স্বর রত্নময়ীর যে সুচারু দু-চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল।

'আনা—' সুচারু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'আনা আমার উচিত ছিল, মাসিমা। শুধু আপনার জন্যেই। কিন্তু ভগবান টগবানে ভক্তিটা আমাদের এত কম যে ও ব্যাপারটা মনেই ছিল না। আপনাকে আমি আনিয়ে দেবো।'

রত্নময়ীর মন তখন যেন অন্য কোথাও ছিল। সুচারুর দিকে তাকিয়েও কেমন অন্যমনস্ক ছিলেন। গাঢ় গলায় বললেন, 'ভগবানের ওপর বিশ্বাস না রেখে উপায় কি আমাদের!'

সুচারুর ইচ্ছে হল বলে, উপায় নেই বলেই ভগবানে বিশ্বাস? থাকলে বোধ হয় রাখতেন না। কিন্তু কিছুই বললে না সুচারু। রত্নময়ীর সমস্ত মুখে যে অসহায়তা ফুটে উঠেছিল—সুচারু সেই অসহায়তাকে যেন স্পর্শ করতে পারল।

ক'মুহূর্তের নীরবতা। তার পরেই স্বাভাবিকতা ফিরে এল। রত্নময়ী সুধার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুই খাবি নাকি চা? আছে একটু।'

সুধা মাথা নাড়ল। না খাবে না।

সুচারু তাড়াতাড়ি বললে, 'না কেন, যা শীত—মাঝে মাঝেই কাঁপছেন, খেয়ে নিন। চা সর্বব্যাধি বিনাশক।'

রত্নময়ী হাসলেন। বললেন হঠাৎ, 'আচ্ছা সুচারু একটা কথা বলি। সুধা নিশ্চয় তোমার চেয়ে বয়সে ছোট। ওকে তুমি আপনি বলো কেন? আমাদের মতন সে-কেলে লোকদের এ-সব বড় কানে লাগে।'

'এ-কেলে মেয়েরা কিন্তু ওটাই পছন্দ করে, মাসিমা।' সুচারু আড় চোখে সুধাকে এক নজর দেখে নিয়ে হাসছিল।

'যাই বলো বাপু—এ শুনতেও বড খারাপ লাগে।'

সুধা বোবা এবং বোকার মতন অন্য দিকে মুখ করে বসেছিল। ভেবে পাচ্ছিল না, মা এই ছেলেটির কাছে এত অসঙ্কোচ কেন হচ্ছে, কিসের জন্যে এত ভালই বা লেগেছে সুচারুকে।

মাকে এই ঘর থেকে, এই আলোচনা থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যেই সুধা তাড়াতাড়ি বললে, 'দেবে তো দাও চা, এরপর জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।'

রত্নময়ী চলে গেলেন। আরতিও। সুধা চুপ। সুচারু একটা সিগারেট ধরাল। কেউ কোন কথা বলছিল না। আরতি চা নিয়ে এল সুধার।

চলে যাচ্ছিল। সুচারু ইশারায় জিজ্ঞেস করলে, কি মাসিমা আসছেন নাকি এদিকে? মাথা নেড়ে, সাহস দিয়ে আরতি বললে, 'খান সিগারেট—মা এখন আসছে না।' বলে চলে গেল।

'অফিসের খবর কি?' সুচারু কথা বললে।

'ভালই।' সুধা চায়ের কাপে চোখ রেখে মৃদু স্বরে জবাব দিল।

'আমার কোন খোঁজ খবর হচ্ছে না?'

'কেন, আপনি চিঠি দেন নি?' সুধা এবার তাকাল।

'না।' সুচারু মাথা নাড়ল।

একটু চুপ। সুধা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলে। মাথার কাঁটা দিয়ে সিঁথির কাছটা একটু চুলকে নিল।

'বছরের গোড়াতেই হুট্ করে কামাই—' সুধা সহজ স্বরে হাসি মুখে বলছিল, 'আমরা ভাবলুম আপনি বুঝি চাকরি ছেড়ে দিয়েই পালালেন।'

'তাই নাকি!' সুচারু নিঃশব্দে হাসল। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তারপর বললে, 'তা কিছু মিছে ভাবেন নি; সত্যিই আমি পালাব।'

'কোথায় কাশীতে? সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হয়ে যাবেন?' সুধা ঠাট্টা করে হাসছিল, ঠোঁট টিপে টিপে, সুন্দর মুখে।

'আজ্ঞে না।' সুচারু একটু সামনে ঝুঁকে সুধার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললে, 'এখন অবশ্য ঠাট্টাই করছেন কিন্তু এই বছরের মাঝামাঝি যখন আপনাদের অফিস আর এই কলকাতা শহরকে কলা দেখিয়ে পালাব—তখন দেখবেন।'

'দেখবোখন, কিন্তু যাবেন কোথায়?'

'যুদ্ধে।' সুচারু একটু সময় নিয়ে ছোট্ট শব্দটা উচ্চারণ করলে।

সুধার কানের পর্দায় শব্দটা যেন চমকে উঠে হারিয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকাল সুধা। নিষ্পলক চোখে। সুচারুর মুখের কোথাও ভীষণ

একটা গাম্ভীর্য নেই আবার পরিহাসও না। বরং কথাটা যে ও লঘু ভাবে বলে নি তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবু সুধা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'সত্যি ?'

সুচারু মাথা নাড়ল। বললে, 'খুব সম্ভব জুন-জুলাই মাস নাগাত যেতে পারব। যার জন্যে চেষ্টা করছি—সেটা হয়ত হয়ে যাবে।'

সুচারুর গলার স্বরে কথায় ওর চেষ্টা আর সঙ্কল্প এবার এত পরিষ্কার এবং দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠেছিল যে সুধাও কথাটা বিশ্বাস না করে পারলে না।

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সুধা। ঠোঁটের হাসি হাসি ভাবটা, মুখের সরল খুশীব রেখাগুলো মুছে গেল। বিস্ময় এবং শংকার ঈষৎ ছায়া নামল চোখে।

সুচারু সুধার দিকেই তাকিয়েছিল। বেশ বুঝতে পারছিল সুধা, নিজেকে যেন সে আয়ত্তে আনছে, সহজ হবার চেষ্টা করছে। আর সুচারুর দৃষ্টি থেকে খুব ভীতভাবে কিছু লুকিয়ে ফেলার চেষ্টাও।

'হঠাৎ যুদ্ধে ?' বেশ একটু সময় নিয়ে গলা যতটা সম্ভব সহজ করে প্রশ্ন করল সুধা।

'হঠাৎ আব কি, ইচ্ছে হয়েছে।'

সুধা আর কিছু বললে না। আবছা-অন্ধকার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। সুচারু সিগারেটের শেষটুকু নিভিয়ে ফেলে দিল।

সমস্তই যখন চুপ, কেউ কথা বলছে না, কোন শব্দ নেই, দরজা দিয়ে শীতের কনকনানি আরও চাপ হয়ে ঢুকছে—তখন হঠাৎ শোনা গেল—সিঁড়ি বয়ে অস্থির, দ্রুত এক পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। সুধা দরজার দিকে তাকাল। বাসু ফিরছে। তবে তো বেশ রাত হয়ে গেছে, কথায় কথায় কেউ ঠাওর করে নি।

বাসুই। ঘরে ঢুকে কোনদিকে না চেয়ে বাসু তক্তপোশের দিকে এাগয়ে যাচ্ছিল।

আর সুধা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে, অস্ফুট একটা চিৎকার করল।

আঁতকে ওঠার মতনই দৃশ্যটা। অনেকটা বেহুঁশের মতন বাসু এগিয়ে এসে তক্তপোশের ওপর বসে পড়ল। নিশ্বাস নিচ্ছিল জোরে জোরে। কপালের এক কোণে অনেকটা ফুলে গেছে, রক্তের দাগ, মোটা করে তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, আয়োডিনে কাল হয়ে গেছে খানিকটা। গালের পাশে কোথাও কোথাও ফোলা, আঁচড়ানো দাগ, আয়োডিন বুলনো। সোয়েটারের কোথাও ধুলো ময়লা, শার্টের হাতা ছিঁড়ে ঝুলছে, প্যাণ্ট জুতো মোজা কোনোটার চেহারাই স্বাভাবিক নয়।

সুধা ভাইয়ের গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভয়ে উদ্বেগে কেঁদেই উঠেছিল প্রায়, 'কি হয়েছে তোর— ? মাথা ফাটালি কি করে— ? পড়ে গিয়েছিস—না মারপিট করে এলি ? মা—ওমা—শীঘ্রি এস— !'

সুধার ডাকে রত্নময়ী ছুটে এলেন, আরতি এসে দাঁড়াল। সুচারু বিমূঢ়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কখন।

ছেলের চেহারার দিকে তাকিয়ে রত্নময়ীর সারা গা কেঁপে উঠল। সাদা হয়ে গেল মুখ। একটা কথাও তার ঠোঁটে আসছিল না।

আরতি পাথরের মতন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাসুর মুখের হাতের ক্ষতগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সুধা তীক্ষ্ণ গলায় বললে, 'চুপ করে রয়েছিস যে—, কি হয়েছে, কোথায় মাথা ফাটাফাটি করে এলি বলতে পারছিস না ?'

ঝটকা মেরে সুধার হাত নিজের গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বাসু দাঁত চেপে অস্ফুট একটা গাল দিল কাকে যেন।

একটু সামলে নিয়ে রত্নময়ী এবার ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'কি হয়েছে জবাব দিতে পারছ না ?' তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর তাঁর।

'কিচ্ছু না।' বাসু শার্টের ছেঁড়া অংশটা পড় পড় করে ছিঁড়ে ফেলল।

'কিচ্ছু না তো, মাথা ফাটিয়ে হাত পা ভেঙে বাড়ি এলে কেন! হতভাগা, আপদ কোথাকার—। সমস্ত জীবনটা আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল।'

সোয়েটারটা গা থেকে খুলে ফেলল বাসু।

'নিশ্চয়ই কোথাও মারপিট করতে গিয়ে মার খেয়েছে।' সুধা বললে।

'আরে যাও যাও—' বাসু হঠাৎ আহত অভিমানে জ্বলে উঠল। 'আমায় মেরে আস্ত থাকবে এমন কোন বেটা বউবাজারে জন্ম নেয় নি এখনো! বাসু ভট্চায মার খেয়ে কুকুরের মতন কেঁউ কেঁউ করতে করতে বাড়ি ফেরে না। ছেড়ে দিই নি—, পণ্টু কাপ্তেনের কব্জি ভেঙে নাক ফাটিয়ে দিয়ে এসেছি। তিন দিন এখন বিছানায় পড়ে থাকুক শালা!'

রত্নময়ী ভীষণ অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন। সুধাও। সুচারুর সামনে এই অসভ্য ছেলেটা কখন কি বলে ফেলে কে জানে!

সুধা কঠিন চোখে তাকিয়ে একটা ধমক দিল, তিক্ত স্বরে বললে, 'ওই পণ্টুই তো তোমার গুরু ছিল, ওর পা ধোওয়া জল খেতে না রোজ। সবাই তোমরা সমান।'

সুধার কথার কোন জবাব দিল না বাসু। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিচ্ছিল সেই যন্ত্রণা, আর বিড় বিড় করে পণ্টুর কীর্তি কলাপের ব্যাখ্যান করছিল।

কথা বলার মতন একটু ফাঁক পেতেই সুচারু বললে, 'আমি এবার যাই।'

সুধা তাকাল। রত্নময়ীও। বাসু এতক্ষণে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলে সুচারুকে। ঘরে ঢোকবার সময় মনে হয়েছিল কে যেন বসে রয়েছে—অতটা লক্ষ্য করে নি। এখন দেখল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিল, এই লোকটাই সেই—দিদিদের অফিসে চাকরি করে, এ-বাড়িতে আগে একবার এসেছিল। সুচারুবাবু। আরতির কাছে শুনেছে সব বাসু, আরতি বলছিল

সুচারুদা। এখন, এই মাথা গায়ের চোট খাওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে করতেও বাসু ভাবছিল, খুব যাওয়া আসা শুরু করেছে এ মক্কেল। দিদির ফ্রেণ্ড। বন্ধু।

সুচারু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সুধা পিছু পিছু বাইরে এল।

সিঁড়ির মুখে এসে সুচারু বললে, 'আপনাকে আর আসতে হবে না, আমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারব।'

সুধা দাঁড়াল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। মুখ দেখা যায় না। সুধা কেমন এক সঙ্কোচ এবং আড়ষ্টতা বোধ করছিল। সুচারুর চোখের সামনে যে-কাণ্ড ঘটে গেল এর লজ্জায় যেন মিশিয়ে যেতে চাইছিল সে।

অন্যের পারিবারিক দৃষ্টি-কটু দৃশ্যে উপস্থিত থাকার জন্যে সুচারুরও কম অস্বস্তি ছিল না। বুঝতে পারছিল সুচারু, সুধার এই মুখ বুজে পিছু পিছু এসে দাঁড়ানোর মধ্যে এক ধরনের লজ্জা আর অস্বস্তি রয়েছে। বিষয়টাকে হাল্কা করার চেষ্টা করলে সুচারু।

'আপনার ভাই ?'

সুধা জবাব দিল না। দিতে পারল না।

'ভাইয়ের আপনার যথেষ্ট বিক্রম আছে—।' সুচারু হেসে বললে, 'আজকাল আমরা পুরুষ মানুষের বিত্ত আর বিদ্যে ছাড়া আর কিছুকে নজর করি না। কিন্তু বিক্রমটাই বা কম কী!' সুচারু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে, 'আমি কিছু মনে করি নি, এ-সমস্ত দেখবার শোনবার অভ্যেস আমার আছে। চলি। কাল দেখা হবে অফিসে।'

সুচারু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সুধা কিছুক্ষণ একতলার কালো উঠোনটার দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এই নিরিবিলিতে নিজেকে এখন কেমন যেন লাগছিল সুধার। খাঁচায় পোরা হাঁফধরা পাখির মতন তার মনটাও অবসন্ন, বিষণ্ণ, তিতি বিরক্ত হয়ে গেছে।

ষোলো

শীত শেষ হয়েছে। পাঁজির হিসেবে সময়টা বসন্তকাল। কলকাতার আকাশে আর-এক রঙ ধরেছে। সূর্য আরও উজ্জ্বল, রোদ আরও উষ্ণ, পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশের কিনারা ঘেঁষে দু-একখণ্ড লঘু মেঘ, রোদের সোনালী পাড় দিয়ে মোড়া। রাস্তার কোন কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ফুটেছে, কোন গাছে বা নতুন পাতা ধরেছে। আচমকা একটি দু'টি শিমুলও চোখে পড়ে। আর বাহারী পার্কের কোণায় কোণায় এখনো কিছু মরসুমী ফুল; আর থোকা থোকা গাঁদা। দক্ষিণের হাওয়াও মাঝে মাঝে বয়ে যাচ্ছিল আজকাল সন্ধ্যায়।

এমন দুর্দিনেও শহর কলকাতায় ভীরুর মত একটু বা বসন্ত নেমেছিল। এই বসন্তকে চোখ চেয়ে দেখবে এমন মানুষ শহরে ছিল না। কোথায় ফুল ফুটছে, হাওয়া বইছে, আকাশ রোদ নতুন করে জাগছে তা দেখার অবসর আর কারুর নেই। সে মনই আর না।

এখানে মানুষ আজ আতংক নিয়ে বেঁচে আছে। মৃত্যুকে সামনে রেখে যেন। কলকাতাকে কারুরই আর ভাল লাগে না, কেউ আর এই শহরটাকে বিশ্বাস করে না। এক সময় এই হট্টগোলে শহরটাই ছিল সুখের, স্বস্তির। অনুরাগ আর আকর্ষণের। এখন শুধু ভয়, অনিশ্চয়তা। আতংক আর অস্বস্তি।

শহর এখন খাঁ খাঁ করছে। পাড়া সব নিরিবিলি। বাড়ি ঘর প্রায় ফাঁকা, দরজা জানলা বন্ধ। অফিসের বেলায় রাস্তাঘাটে একটু বা ভিড়, দু'দশজনের মুখ চোখে পড়ে একসঙ্গে। আবার সেই বিকেলে অফিস ভাঙার সময়। নয়ত এক রকম ভোঁ-ভোঁ। দিনের বেলায় যতটুকু বা প্রাণের সাড়া, সূর্য অস্ত গেল তো তাও নয়। রাত আটটা বাজতে না বাজতেই পথ খালি—লোক হাঁটে না রাস্তায়, দোকানপাট বন্ধ হয়ে

আসে। টিমটিমে আলোয় পিচ-রাস্তার চওড়া কালো চেহারাটা অদ্ভুত দেখায়, অন্ধকারের গায়ে গা মিলিয়ে ছায়াগুলো পথ জুড়ে শুয়ে থাকে, কেমন যেন থমথমে ভয় ভয় আশপাশ, মাঝে মাঝে মিটমিটে চোখ একটা ট্রাম কি বাস চলে যায়। শব্দটা অনেকক্ষণ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। করুণ কান্নার মতন এক গোঙানি তুলে একটা ঠেলাও আস্তে আস্তে পথ দিয়ে এগিয়ে যায়। গা যেন আরও ছমছম করে ওঠে।

বড় রাস্তায় যা-ও বা মানুষের, গাড়ি ঘোড়ার খানিক শব্দ, একটু চাঞ্চল্য, অলিগলিতে তাও না। গ্যাসপোস্টগুলো আধখানা কালো ঘোমটা আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে, আঁকা বাঁকা ভাবে। গলির গা ভরে অন্ধকার, আশেপাশের নিঃঝুম বাড়ির দেওয়ালে চুঁইয়ে সেই নিস্তব্ধতা জমাট হয়ে যাচ্ছে। তারই মাঝে কুণ্ডলী পাকানো কুকুরগুলো গ্যাসের আবছা আলোর তলায় শুয়ে মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে। এক আধজন মানুষ যদি বা যায়; পায়ে পায়ে খস্ করে দেশলাই জ্বালে, নতুবা টর্চ, খুক্ খুক্ কাশে, গলা খাকারি দেয়—যেন কবরখানার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ভয়ে ভয়ে।

এমন জমজমাট, আলো ভিড়ে একাকার, চঞ্চল জীবন্ত শহরটার এই হাল হয়ে গেল ক'মাসের মধ্যেই! হ্যাঁ, হল। নেহাত যাদের পেটের অন্ন কুড়োতে না পড়ে থাকলেই নয়, নানা দায়-দায়িত্ব দিয়ে যারা বাঁধা, তারাই শুধু অফিস আদালত কলকারখানায় যাচ্ছে আসছে, দোকান পাট খুলছে, ট্রাম বাস চালাচ্ছে—কোনরকমে এই বিরাট নগরীর হৃদস্পন্দনটা বাঁচিয়ে রেখেছে। আর আছে কিছু কিছু মানুষ যাদের কাছে কলকাতার সীমানার বাইরেও কোথাও এতটুকু আশ্বাস নেই। এখানে যদি-বা তাদের মাথার ওপর শকুনির ডানার মতন ছায়া ফেলে অপেক্ষা করছে মৃত্যু; ওখানে অনাহার, আশ্রয়হীনতা। দুই মৃত্যুর

মাঝখানে অসহায়ের মতন ভাগ্য আর ভগবানের দিকে চোখ তুলে পড়ে রয়েছে এরা।

আরও খবর আছে কলকাতার। রোজই খবর তৈরি হচ্ছে। স্কুল কলেজ বন্ধ হতে শুরু করেছে! পর্বত প্রমাণ বালির বস্তা জমেছে এখানে। দলে দলে লোক নিচ্ছে এ-আর-পি'তে। ব্যাফল ওয়াল তোলা হচ্ছে রাস্তাঘাটে। মাঠে ঘাটে স্লিট ট্রেঞ্চ কাটছে।

যুদ্ধ আরও এগিয়ে এসেছে। এবারে একেবারে সদরে কড়া নাড়ছে। নয়াদিল্লীর ইস্তাহার দেখ নি কাগজে? বে-অফ-বেঙ্গলে গতিবিধি বেড়েছে জাপানের। তার মানে এসে পড়ল এবার ওরা। আর ওদের ঠেকায় কে! সিঙ্গাপুর গেছে। সবই যাবে একে একে! জাপানকে আর রুখতে হচ্ছে না—সে সাধ্য ওসব বৃটিশ ফোর্স-টোর্সের নেই। লড়বে কি, খেতে, পরতে, নেকটাই ঠিক করতে জামাইদের সময় চলে যায়।

রাস্তাঘাটে, অফিস-আদালতে, বাড়িতে, চায়ের দোকানে, যেখানে দু'মাথা এক হল সেখানেই এক কথা! কানু বিনে গীত নেই যেন; যুদ্ধ ছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই।

বেশির ভাগ লোকই একরকম নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে, এ-যুদ্ধে ইংরেজরা হারবে। হারতে বাধ্য। তাদের শক্তি নেই জাপানকে ঠেকাবে। সিঙ্গাপুর যাবার পর আর এক তিল আস্থাও কেউ রাখতে পারছে না। রাখবেই বা কি করে? হাউস অব কমন্সে চার্চিল ত বলেই ফেলেছে, ইস্ট এশিয়ায় ওরা দুর্বল ছিল। তার মানে এখনও আছে। এটলী সাহেব সাফাই গাইছে, 'উই ক্যান্ নট্ বি স্ট্রং এভরী হোয়ার!' কোথায় যে তোমরা স্ট্রং তা তো বুঝি না বাপু।

খবরের কাগজে এই নিয়ে রোজ লেখালিখি। নর্থ আফ্রিকায় জোর লড়াই লড়তে হচ্ছে, রাশিয়ায় সাহায্য পাঠাতে হচ্ছে—এ-সব সাফাই গাওয়ার এখন কি অর্থ হয়। কোন রেসপন্সেবল্ গভর্নমেণ্টের মুখে এই

সমস্ত কথা সাজে না। বার্মায় তোমরা কেন তৈরি থাক নি, কার দোষ সেটা?

আসলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখানেও পলিসি মতন কাজ করছে। কেউ সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত সহজ করে বুঝে নিয়ে মন্তব্য করে; ইস্ট থেকে ওরা রিট্রিটের পলিসি নিয়েছে, তাই হটে যাচ্ছে, আমেরিকাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে দিয়ে। দেখছেন না—আমেরিকা এখন কোন্ পজিশনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন এ-যুদ্ধ তাদেরই।

অন্য দল যেন এ-সবের মধ্যে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম প্রত্যক্ষ করে ফেলেছে। তারা বলছে, এই হচ্ছে ইতিহাস। একবার উঠবে তারপর পড়বে। চড় চড় করে খুব উঠেছিলে এইবার পতনের সময়। বৃটিশ রাজত্ব থেকে সূর্য অস্ত যায় না বলে খুব গর্ব করছ এতকাল, এবার দেখ সূর্যের মুখ দেখার মতন এক হাত জায়গা থাকে কি না!

প্রবীণরা এত গবেষণার মধ্যে যেতে চান না। সোজা সহজ চোখে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন কলির শেষ এসে গেছে। ওলট পালট একটা হবেই। এ-সবই তার প্রথম লক্ষণ। মড়ক মহামারী যুদ্ধ ভূমিকম্প এ-সব এখন নিত্যকার ঘটনা হবে।

সুচারুদের অফিসেও সেদিন এই নিয়ে তুমুল-তর্ক বেধে উঠেছিল। ললিতবাবুর জাপান প্রীতি খুব। জাপানের ম্যাপটা যেন তাঁর বাড়ির নক্শা। শুধু ম্যাপ নয় মানুষগুলো পর্যন্ত তাঁর চেনাজানা। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, ফ্যাশান করে নেচে গেয়ে দিন কাটায় না জাপানীরা। আলস্য ক্লান্তির সময় তাদের নেই। ফেন সুদ্ধু ভাত আর শাকপাতা সিম সেদ্ধ খেয়ে কী লড়াইটাই লড়ছে। একেই বলে ন্যাশনাল স্পিরিট। আরে, আমরা ত এতকাল শুধু ঠুনকো জাপানী মালই দেখেছি বাজারে। ভাবতাম ওরাও বুঝি অমনি ঠুনকো। এবারে বুঝছি আসলে ওরা কেমন বস্তু। য়ুরোপের

লোকেরা আমাদের মানুষ বলে গণ্যই করে নি এতকাল, এবার ঠেলার চোটে বুঝছে এশিয়াও কমতি নয়।

এশিয়া প্রসঙ্গ এসে পড়ায় আরও পাঁচটা কথা বলে ফেললেন ললিতবাবু। শেষে বলছিলেন, সমস্ত এশিয়া জাপানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝলে, বিনোদ। অনেক আশা নিয়ে। ওদের হার-জিতের ওপর এশিয়ার ফিউচার নির্ভর করছে।

ললিতবাবুর টেবিলের চারপাশ ঘিরে একে একে অনেক মাথাই জড় হয়েছিল। নানান আখ্যান ব্যাখ্যান মন্তব্য চলছিল। সুচারুও এসে দাঁড়িয়েছিল এক সময়। চুপ করে শুনছিল ললিতবাবুর কথাবার্তা।··· ললিতবাবুর এই জাপান-প্রীতি তার সহ্য হয় না। শুধু ললিতবাবু নয়, বেশির ভাগ লোকেরই কেমন যেন একটা দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে জাপানের ওপর।

সুচারুর অবশ্য এতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কিন্তু তবু কে জানে কেন সুচারু এই মূর্খতা সহ্য করতে পারে না।

'তবে তো এশিয়ার ফিউচার খুব ডার্ক দেখছি ললিতদা।' ললিতবাবুর শেষ কথাটা টেনে নিয়ে সুচারু যদিও উপেক্ষাভরে হাসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু কথা বলতে শুরু করে একটা বিদ্রূপ এবং তার্কিক আক্রমণের সুর তার গলায় ফুটে উঠল।

'ডার্ক, ডার্ক কেন—?' ললিতবাবু সুচারুর মুখের দিকে চাইলেন, 'অমন একটা পাওয়ারফুল, সভ্য, মডার্ন নেশান—এশিয়াকে যদি লীড্ করে এশিয়ার আর ভাবনা কি! পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হোল্ ইস্টের চেহারা বদলে যাবে।'

'তা যাবে—' সুচারু ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল, 'যেমন মাঞ্চুরিয়া কোরিয়া চীনের যাচ্ছে। যেমন সভ্য দেশ তেমনি তার সভ্যতা বিস্তার তো!'

সুচারুর খোঁচা হজম করার পাত্র নন ললিতবাবু। তিনিও খোঁচা দিতে জানেন। খোঁচাখুঁচির মধ্যে দিয়ে তর্কটা বেশ জমে উঠল।

সুচারু বলছিল, 'জাপান আবার সভ্য হল কবে থেকে! বর্বর দেশ—; গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে ও-দেশে শুধু বর্বরতার চাষ হয়েছে। টানাকা মেমোরাণ্ডামের খোঁজখবর রাখেন কিছু? রাখেন না। সেটাই হচ্ছে আসল জাপানের রূপ। সমস্ত এশিয়াকে আস্তে আস্তে গিলতে চায়। বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন তারপর।'

ললিতবাবু পাল্টা জবাব দেন, 'তোমার ইংরেজই বা কি এমন সভ্য হে সুচারু? এমন কী মহামানবের দল? দেশটাকে তো আমাদের শুষে শুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে। আমি বলব ওরা পশু, পশুর চেয়ে অধম—বর্বরশ্রেষ্ঠ। এই স্লেভারী থেকে আমাদের মুক্তি চাই। উই মাস্ট্।'

'জাপান কি আপনাদের মুক্তি দেবে?' সুচারু বিদ্রূপ করে।

'নিশ্চয় দেবে। ওরা এশিয়া ফর এশিয়ানস্, এই কজ্ নিয়ে দাঁড়িয়েছে।' ললিতবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন।

আবার সেই নির্বোধের মতন কথা। দেখেও দেখবে না, জেনেও জানবে না। মাঞ্চুরিয়াকে কোন্ স্বাধীনতা দিয়েছে জাপান! চীনের ওপর তার এ শকুনি দৃষ্টি কেন? কিসের জন্যে লড়ছে? স্বাধীনতা দিতে—? টু লিবারেট চায়না? সুচারু ধৈর্য্য হারায়। গলার স্বর চড়ে ওঠে। কথায় যত ঝাঁঝ তত খোঁচা।

'মোস্ট্ ট্রেচারাস নেশান আপনার ওই জাপান। অস্বীকার করতে পারেন। আমেরিকায় বসে যখন কথা চলছে একটা সেটেলমেণ্টের জন্যে—কথা নেই বার্তা নেই, ওয়ার পর্যন্ত ডিক্লেয়ার করল না—পার্ল হারবার বোম্ব করে বসল? আর কোন নেশান্ এটা পারত?'

'যুদ্ধে আবার ট্রেচারী কি!' ললিতবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ তোমার মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ নয়। অতই যদি বলছ তবে তোমার মহাপ্রভুরাই বা কি করলেন? কোন্ নীতিসম্মত হে এটা—?'

'কি ?'

'কি, এর বেলা কি ! কেন, এই বৃটিশ। তোর লড়াই তুই লড়গে যা। ঘরে ঘরে বোঝাপড়া কর। ইণ্ডিয়ার কন্‌সেণ্ট্ না নিয়ে কোন অধিকারে তারা ইণ্ডিয়ার হয়ে ওয়ার ডিক্লেয়ার করে ?'

সুচারু মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল। তারপরই বললে, 'কাজটা অন্যায়, অনুচিত হয়েছে। কিন্তু তাও নীতিগত ভাবে কনস্টিটিউশনের দিক থেকে নয়। আগেও একদিন আপনাকে সে-কথা বলেছি। কিন্তু ললিতদা, একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন—এই কাগজ কলমের যুদ্ধ ঘোষণায় কিছু আসে যায় না ! বৃটিশ আপনাকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে লড়তে ঠেলে দিচ্ছে না। আপনি যুদ্ধ করতে রাজী নন বলে আপনার মাথায় তারা বোমা ফেলছে না।'

টেবিল চাপড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ললিতবাবু বললেন, 'পারতেই বা কতটুকু সময় লাগবে ওদের ? ইচ্ছে করলেই পারে,—বাধা দিচ্ছে কে ?'

শেষ পর্যন্ত সুচারু হেসে বলে, 'সব কিছু ছেড়েও যদি দেন ললিতদা, তবু একটা বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জার্মান কিংবা জাপান দিচ্ছে না। দেবে না। অন্তত গান্ধী জহরলালেরও কথা তাই।'

ললিতবাবু কিসের একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন—তার আগেই থেমে গেলেন। সুপারিনটেনডেণ্ট কখন সকলের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন। চারপাশ দেখতে দেখতে গম্ভীর মুখে বললেন, 'টিফিন আওয়ার্স ওভার হয়ে যাবার পরও একঘণ্টা কেটে গেল, আপনাদের তর্ক থামল না। বড় গোলমাল। বাজার করে ফেলেছেন সেকশানটা। নাউ প্লিজ টু ইওর ওউন সীটস। প্লিজ '

সমস্ত কলরব শান্ত হয়ে গিয়েছিল পলকেই। সুপারিনটেনডেণ্টকে দেখেই কেউ কেউ রণে ভঙ্গ দিচ্ছিল। ধমকের পর আস্তে আস্তে সকলেই সরে যেতে লাগল।

পিছু-ফেরা সুপারিনটেনডেণ্টকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে অনাদি চক্রবর্তী এই তর্কের উপসংহার টানল, 'বৃথা তর্ক। আমাদের কাছে ইংরেজ যা জাপানও তাই। আজ এর পদসেবা করছি, কাল ওদের করব। অল্ আর ইকুয়াল টু আস। তবু একটা চেঞ্জ হবে। মন্দ কি।'

সুচারু যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ফেরাল। জবাব তাঁর ঠোঁটের গোড়ায় আসছিল একটা। কিন্তু কি ভেবে কিছুই বলল না। এই হীন নির্বোধ লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতেও আর তার ইচ্ছে করছিল না। অসম্ভব একটা ঘৃণা হচ্ছিল। উপেক্ষা আর অবজ্ঞার হাসি ঠোঁটে করে সোজা নিজের সীটে গিয়ে বসল সুচারু।

ললিতবাবু নীচু গলায় পাশের টেবিলের অনাদি চক্রবর্তীকে বলছিলেন, 'দেখলে তো। বলেছিলাম না—! গান্ধী জহরলালের কথা শুনোতে এসেছে আমায়। আরে খোলাখুলি ভাবে কি ওরা এক্সিসদের ঢাক পেটাবে। আফটার অল দিস ইজ পলিটিকস্! সেদিনের ছোকরা তর্ক করতে এসেছে। হুঁ স্লেভ, স্লেভ্ একটা। স্লেভ্ মেন্টালিটি একদম গেড়ে বসে আছে ছোকরার মগজে। ও পুলিস কিংবা সি আই ডি ডিপার্টমেণ্টে চাকরি নেয় না কেন। উন্নতি করতে পারবে।' পরম ঘৃণায় নাক মুখ কুঁচকে চোখ দু'টো ফিরিয়ে নেন ললিতবাবু।

সীটে ফিরে এসে বসলেও কাজে আর মন লাগাতে পারল না সুচারু। অস্বস্তি হচ্ছিল কেমন একটা। বিশ্রী লাগছিল। এ-সব তর্ক শেষ হবার নয়, সুচারু তা জানে। তবু ললিতদাকে আজ কোণঠাসা না করেই রণে ভঙ্গ দিতে হল, এতেই যেন সুচারুর ক্ষোভ হচ্ছিল। ভদ্রলোক বড় আজে-বাজে কথা বলেন, অর্থহীন সব কথা। জাপান জিতলে ভারত স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। কী অদ্ভুত আশা। এই আশা ললিতবাবুর একার নয়, অনেকেরই। আসলে এরা যারা এমন অবিশ্বাস্য

ধারণা নিয়ে বসে রয়েছে তারা নিজেদের অক্ষমতাটুকুকে এই করে ভুলতে চাইছে। আমরা বৃটিশদের তাড়াতে পারলাম না, তোমরা পারছ অতএব পারবে। তখন ভাই দয়া করে উদার জনের মতন আমারটা আমায় দিয়ে দিয়ো। যদি না-ই দাও—তবু ভাল, তোমরাই নাও, ও বেটারা যাক্। অনাদি চক্রবর্তীর সেই কথা, তবু তো একটা চেঞ্জ হবে। স্থচারু মনে মনে হাসে , এ যেন হাওয়া বদল। কলকাতা ছেড়ে দার্জিলিঙ।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাকী সময়টুকু কেটে গেল। ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই ডাকল স্থধা। করিডোরের এক পাশে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল স্থচারু।

পথে নেমে স্থচারুর নির্বাক, গম্ভীর মুখটা দেখতে দেখতে হেঁটে চলল স্থধা! তার ঠোঁটের কোণে আলগা হাসি ছোঁয়ান। খানিক হেঁটে এসে বললে ও, 'অমলাদি কি বলছিল জানেন ?'

স্থচারু তাকাল। কথা বলল না।

'অমলাদি বলছিল আপনাকে একটা উপাধি দেওয়া উচিত ; তর্কশিরোমণি কিংবা তর্কদিগ্‌গজ—এমনি কিছু একটা।' স্থধা সারাটা মুখ উজ্জ্বল করে হেসে উঠল। একটু থেমে বলল আবার, 'সত্যি ভীষণ তর্ক করতে পারেন আপনি! কি লাভ হয় এই চেঁচামেচি করে।'

স্থধার সরল সহজ পরিহাস যথেষ্ট লঘু মনে নিতে পারছিল না স্থচারু। কোন জবাব দিল না সঙ্গে সঙ্গেই। সিগারেট ধরাল পথ চলতে চলতে। শেষে বললে, 'এসব আমার সহ্য হয় না।' একটু চুপ করে থেকে আবার, 'ললিতদাকে দেখেছি কখনো একটু ভেবে চিন্তে কথা বলবেন না। সস্তা বাজে গরম গরম কথা বলে বাজী মাত করার চেষ্টা।'

স্থধা ঘাড় বেঁকিয়ে আবার একবার স্থচারুর মুখ লক্ষ্য করে নিল। 'আপনার মাথায় এখনো ওসব কথা ঘুরছে!'

সুধা আরও হাল্কা স্বরে বলবার চেষ্টা করলে, 'আচ্ছা মানুষ আপনি। কিসের কী তর্ক তা নিয়ে সারাদিন মাথা গরম। আর আপনারই অত রাগ কেন জাপানের ওপর, তারা আপনার শত্রুও নয় বন্ধুও নয়।' সুধা কথা শেষ করে সুচারুর দিকে আবার মুখ তুলে তাকায়। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় হাসল একটু। বললে, 'অবশ্য আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন তখন জাপান শত্রুপক্ষই হবে !'

'তখন শুধু নয়, এখনও।' ছোট্ট করে জবাব দিল সুচারু।

সুধা চুপ করে গেলেও সুচারু যেন হঠাৎ তার মনের কথাগুলো বলবার সুযোগ পেয়ে গেল। ললিতবাবুর সঙ্গে তর্ক করার সময় সবটা বলা হয়নি এমন কথা। সেই অসম্পূর্ণতা এখন সুধার কাছে সম্পূর্ণ করার আগ্রহে সুচারু মুখর হয়ে উঠল।

অল্প ক'দিন আগেই চিয়াং কাইশেক এসে গেছে। মাদাম চিয়াং কাইশেকও। কাগজে প্রত্যহ এদের বক্তৃতা বিবৃতি ছাপা হয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে সুচারু।

প্রসঙ্গটা শুরু করে সুচারু বলছিল, আবেগ এবং উত্তেজনার সঙ্গে: কী অমানুষ নিষ্ঠুর এই জাতটা তা ভাবাই যায় না। কাগজ টাগজগুলো তো ভাল করে চোখ চেয়ে পড়বে না তোমরা—আছ আরাম করে, খাচ্ছ-দাচ্ছ অফিস করছ ঘুমোচ্ছ আর গায়ে আঁচ না লাগতেই ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটছ। আর বসে বসে জাপানের ভেরী বাজাচ্ছ।

সুচারুর এই রাগ সুধা মজা করে উপভোগ করছিল। সুধাকে যেন ললিতবাবু ভেবে নিয়েছে ও।

'কী রকম বিশ্বাসঘাতক জাত ওরা তা জান না তুমি?' সুচারু দপদপে চোখে তাকিয়ে শুধোল। সুধাকে কিছুদিন থেকে 'তুমি'ই বলছে সুচারু। রত্নময়ীর সেদিনের কথার পর, অন্য একদিন কী নিয়ে যেন কথাটা আবার ওঠায়।

'না।' সুধা হাসি চেপে মাথা নাড়ল।

'তা জানবে কেন!' সুচারু বললে 'থারটি-টুয়ে চীনের সঙ্গে জাপনের একটা এগ্রিমেণ্ট সইয়ের ব্যবস্থা হয়েছে সাংহাইয়ে। সইটা শুধু হতে বাকি—হবে হবে এমন সময় চাপেয়ি বলে একটা শহরের ওপর মাঝরাতে হাজার হাজার ঘুমন্ত লোকের ওপর জাপানীরা বোমা ফেলে গেল এতটুকু দ্বিধা না করে।' সুচারু একটু থেমে সুধাকে যেন অবস্থাটা কল্পনা করে নেবার অবসর দিল। 'ভাব একবার কী রকম মাস্ ম্যাসাকার হতে পারে এ-অবস্থায়। ওরা এমনি। যুদ্ধ শান্তি কোন কিছুর আইন নীতি মানে না।'

সুধা মুখে কিছু বললে না? সুচারুর মুখের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকল। বলতে বলতে সুচারু ঘৃণায় রাগে কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে। কেমন এক জ্বালায় চোখ দু'টো স্ফুলিঙ্গের মতন জ্বলছে ওর।

'তারপর নানকিং।' সুচারু বললে, 'নানকিংয়ে যা করেছে তার তুলনা নেই। খুন জখম লুঠতরাজ তো আছেই, হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে খেতে না দিয়ে চাবুক মেরে স্লেভ করে খাটিয়েছে। মেয়েদের ওপর পশুর মতন অত্যাচার করেছে—বয়েস-টয়েস মানে নি। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি করেছে জান, তাদের শরীর থেকে বোতল ভরে ভরে রক্ত শুষে নিয়েছে নিজেদের সৈন্যদের গায়ে রক্ত দেবার জন্যে।'

সুচারুর গলার স্বর বিকৃত হয়ে উঠেছিল।

সুধা শিউরে উঠল। অস্পষ্ট বীভৎস একটা ছবি তার চোখের সামনে ফুটেও ফুটল না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে মনটাকে ভীষণ অন্যমনস্ক করে দিল।

কথা বলতে বলতে গণেশচন্দ্র এভিন্যু পেরিয়ে ওয়েলিংটন পার্কের উল্টো দিকে এসে দাঁড়িয়েছিল দু'জনে।

একটা ট্রাম যাচ্ছিল ঘণ্টির শব্দ তুলে। সুধার অন্যমনস্কতা ভাঙল সেই শব্দে। ফুটপাথে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা—সুধার মনে হল। এবার

হয় বউবাজারের মোড়ের দিকে এগুতে হয়, না হয় ধর্মতলার দিকে আর একটু হেঁটে গিয়ে মোড়ের চায়ের দোকানে বসতে হয়। সুচারুর সঙ্গে একটু দরকার আছে সুধার। ছুটির পর তাই অপেক্ষা করছিল। নয়ত সুচারুর জন্যে ছুটির পর ঠিক এভাবে অপেক্ষা সে আগে কখনো করেনি।

সুধা ভাবছিল কি করবে। কি করা যায়! এতক্ষণ পর্যন্ত তার কথাটা বলবার কোন সুযোগই সে পায় নি। যদি বাড়ির পথেই এগোয়, সুচারুকে অন্তত এই অফিস ছুটির পর বাড়িতে ডাকতে হয়—চা জলখাবার খেয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু এ-ভাবে সুচারুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলে মা কি মনে করবেন। হয়ত কিছুই না। হয়ত যা মনে করেছেন আগেই, তাই করবেন। তবু। না, সুধার বড় লজ্জা করে। মাঝে মাঝে সুচারু নিজের থেকে ওর সঙ্গী হয়ে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায়—সে-কথা আলাদা। কখনো বড় রাস্তা, কখনো গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে যায় সুচারু। সুধা বাড়িতে ডাকুক না-ডাকুক তাতে তেমন কিছু আসে যায় না। অন্তত সুধার মনে হয় না খুব একটা অসৌজন্যতা প্রকাশ পেল। সুচারুও—সুধা যতটা দেখেছে—কিছু মনে করে না এতে।

বাড়ি যেতে সঙ্কোচ হলে রেস্টুরেন্টে অবশ্য যাওয়া যায়। কিন্তু তাই বা কেমন। সুধা যদি নিজে ডেকে নিয়ে যায়—চা-খাওয়ার পয়সাটা অবশ্য তারই দেওয়া উচিত। কিন্তু সুধার কাছে যে একটি পয়সাও নেই। থাকে না। যতবার ওরা চায়ের দোকানে ঢোকে সুচারুই দাম মেটায়। সুধা পারে না। পয়সা থাকে না বলেই। খুবই লজ্জা করে ওর। কিন্তু উপায় কি। সে-দিন অবশ্য একরকম জোর করেই পয়সা দিয়েছিল সুধা। কারণ মাইনের টাকাটা হাতে ছিল। দিতে পেরে ভালই লেগেছিল।

কিন্তু আজ? সুধা কি করবে না-করবে ঠিক করতে না পেরে শেষে বললে, 'আপনি কি সোজা বাড়ি ফিরবেন?'

'না।' মাথা নাড়ল সুচারু, 'এখুনি বাড়ি ফিরে কি করব। খানিক পরে যাব।'

'তা হলে- ' সুধা ইতস্তত করছিল।

'চল কিছু খাওয়া যাক ; আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।' সুচারু এদিক ওদিক তাকিযে ওয়েলিংটনের মোড়ের দিকে পা বাড়াল।

'আমি কিন্তু কিছু খাব না।'

'কেন, তোমার অমলাদি বুঝি পেট ভরে খাইযেছে টিফিনে?' সুচারু এতক্ষণ পবে হাসল। মনটা এতক্ষণে যেন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে।

'আমাকে তো আপনাব মতন চেঁচিয়ে খিদে বাড়াতে হয় না ; খিদে পায় নি আমার।' সুধা হাসি মুখে জবাব দিল। মনে মনে অথচ ভাবল, কথাটা মিথ্যে। বলাব কোন দরকাব ছিল না। কোন্ সকাল সাড়ে ন টায় দুটো ভাত নাকে মুখে গুঁজে এসেছে– এখন বোধ হয় সাড়ে পাঁচটা—খিদে পাওয়াটা আশ্চযেব নয়, না-পাওয়াটাই আশ্চর্যের। তবু, মিথ্যে কথাটাই বলতে হল। নিছক লজ্জা ছাড়া আর কি! সুচারুর পয়সায় রোজ রোজ খেতে তার লজ্জাই করে।

'তুমি ডাক্তাব দেখাও।' সুচারু বলল।

'ডাক্তার! কেন?' সুধা অবাক চোখে তাকাল।

'খিদে পায় না, কেউ জোরে কথা বললে মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করে— নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে তোমার।' সুচারু মুখভঙ্গি করল। 'সুস্থ লোকের সময়মতন খিদে পায়, তারা চেঁচামেচি চিৎকার করে। সব সময় মুখ শুকিয়ে খুঁতখুঁত ঘিন ঘিন করে না।'

সুচারু হাসছিল। সুধাও একটু হাসল। ম্লান হাসি। মুখ নামিয়ে হাঁটতে লাগল বোবা হয়ে।

রেস্টুরেণ্টে ঢুকে সুচারু দু'জনার জন্যেই কিছু খাবার আনতে চাইল। সুধা মাথা নাড়ল। না, না, তার জন্যে কিছু নয়। শুধু এক কাপ চা হলেই হবে।

'ভাগ্, সারাদিন অফিস করে খালি পেটে শুধু চা। নির্ঘাত গ্যাস্ট্রিক আলসার হবে তোমার।' সুচারু সুধার আপত্তি কানে তুলছিল না।

'হয় হোক্।' সুধাও জেদ ধরল, 'আমার হবে, আপনার তো নয়।'

'বাঃ, তা বললে কি চলে! তখন নিজেকে আমার দোষী মনে হবে না! তোমায় খালি পেটে চা খাইয়েছি।' সুচারু মাথা ঘাড় নেড়ে, চোখ ভুরু হাস্যকর করে বললে।

'হবার হলে এমনিতেই হবে।' সুধা নিষ্প্রভ একটু হাসি ছড়াল মুখে, 'কিন্তু কিছুই হবে না, সব আমাদের ধাতে সয়ে গেছে।'

সুধার ইঙ্গিত বুঝতে সুচারুর সময় লাগল না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'হঠাৎ আজ তোমার এত গোঁ কেন? বেশ—চায়ের সঙ্গে একটা কেক অন্তত খাও।'

সুধা আর আপত্তি করতে পারল না।

খানিক পরে চা খেতে খেতে সুধা বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।'

সুচারু কাটলেট্ শেষ করে টোস্ট মুখে তুলেছিল। জিজ্ঞাসু চোখে চাইল।

বলতে একটু সময় নিল সুধা। প্লেটের কিনারায় আঙ্গুল বুলিয়ে ধার পরীক্ষা করতে করতে ঘাড় নীচু করেই বলল, 'আমার ভাইকে তো আপনি দেখেছেন। ও কেমন ছেলে তাও হয়ত অনুমান করতে পারেন। একটু থামল সুধা, নোখ দিয়ে প্লেটের একটা দাগ খুঁটলো, 'ওর কোন রকম একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। আর পারা যাচ্ছে না।

সুধা চুপ করল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। সুচারুও কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল।

একটু চুপ চাপ। সুচারু চায়ে চুমুক দিয়ে শেষে বলল, 'সেই সিভিক গার্ড তো ও ছেড়েই দিয়েছে, না?'

'কবেই।' সুধা পিঠ সোজা করে বসল।

'এখন কিছুই করে না বোধ হয়?'

'কি আর করবে। খাচ্ছে দাচ্ছে পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে কতকগুলো বদ ছেলের সঙ্গে। কাউকে মানে না, কোন কথা কানে তোলে না।' সুধা মুখ তুলে চাইল, 'স্বভাব দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' আবার একটু থামল। ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে কপাল ছুঁলো। চোখ মুখ যেন একটু আড়াল করল। বললে মৃদু, বিষণ্ণ গলায়, 'কি বলব, নিজের ভাই, বলতেও লজ্জা করে। কিন্তু কাকেই বা বলব। মাকে রোজ বলি। তাঁকে বলা না-বলা সমান। কীই বা তিনি করতে পারেন। এমনিতেই ছেলের ওপর একটু টান বেশি, তার ওপর এই নিঃস্ব অবস্থা; ছেলের দুশ্চিন্তায় ঘুমোতেও পারেন না রাতটুকু ভাল করে। বেশি বললে অভিমান করেন, অসন্তুষ্ট হন। আড়ালে কাঁদেন।'

সুধার প্রত্যেকটি কথায় গভীর এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কেবিনের মধ্যে আবছা অন্ধকার। মাথার পাশ থেকে ম্লান একটু আলো এসেছে। দোকানে বেশি লোক নেই বোধ হয়। কেমন এক গুঞ্জন ভাসছে। বয়গুলোর স্বর শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে, কাপ প্লেট কাঁটা চামচের ঠুক্ ঠাক্।

সুধার মুখের ম্লান, বিষণ্ণ রেখাগুলো খুব স্পষ্ট। চোখের নরম দৃষ্টিতে ছলছলে ভাব ফুটে উঠেছে। সুচারু দেখছে সব। দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

'ভাইয়ের ওপর তোমার যত রাগ বিরাগ থাক্—মার কাছে সে-সব কথা তোল কেন! সুচারু বলল, সুধার ব্যক্তিগত ক্ষোভে খুব সহজ ভাবে একটু অংশ নিয়ে, 'এটা তোমার উচিত নয়। তিনি কি করবেন! কিছু করার ক্ষমতা নেই বলেই তো সামান্য কথাও বেশি করে লাগে, অভিমান হয়।

'বুঝি; সবই বুঝি। কিন্তু আমিই বা একলা কত করব, বলুন। আমার সাধ্যে যদি কুলোত আরও করতাম।' সুধা ঠোঁটের একটা পাশ কামড়ে চুপ করে গেল।

সুচারু সিগারেট ধরাল। চুপচাপ থাকল একটুক্ষণ। বলল শেষে, 'যাকৃগে, আমায় কি করতে হবে বলো।'

খুব একটা দ্বিধা বা সঙ্কোচ এখন আর হচ্ছিল না সুধার। সুচারুর কাছে এত কথা যখন বলতে পেরেছে তখন আর বাকিটুকু না বলতে পারার কি আছে। অথচ আশ্চর্য, সুধা ভাবে নি এত কথা বলতে পারবে, মনেও হয় নি এত কথা তার বলার আছে—তবু সময়ে কী সহজভাবেই না সব বলতে পারল—মনেই হল না সুচারু তাদের কেউ নয়, কিচ্ছু না এবং এই অনাত্মীয় লোকটির কাছে সংসারেব কথা বলা যায় না।

'ওর একটা চাকরি বাকরি যদি জুটিয়ে দিতে পারেন—!' সুধা আঁচলের পাড় থেকে সুতো তুলতে তুলতে বললে 'শুনলাম আমাদের অফিসের স্টোরস-এ মালপত্র আনা নেওয়ার জন্যে দু তিনজন লোক নেবে। তেমন কোন কোয়ালিফিকেশন নাকি দরকার নেই, সামান্য কিছু লেখা পড়া জানা হলেই চলবে।' সুধা চোখ তুলল। অসহায়তা এবং মিনতিতে খুব করুণ দেখাচ্ছে মুখ। জোর করেই একটু হাসি ফুটিয়ে বললে, 'সুপারিনটেনডেণ্ট আপনাকে খুব স্নেহ করেন, আপনি যদি তাঁকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন, বড্ড উপকার হয়।'

কোন জবাব দিল না সুচারু। সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দিয়ে ছাইদানে ফেলে দিল। ঘাড় হেলিয়ে একটুক্ষণ ওপর দিকে চেয়ে চেয়ে ম্লান আলোর আর সিলিংয়ের অন্ধকার দেখল। মুখ নামিয়ে সুধার দিকে চাইল একটু। কী যেন ভাবছিল। আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে দেশালাইটা টেবিলের ধার পর্যন্ত নিয়ে গেল; আবার কাছে টেনে নিল।

শেষে বললে, 'আচ্ছা, ধর এই কাজের বদলে আমি যদি অন্য কোন কাজ যোগাড় করে দি তোমার ভাইয়ের জন্যে?'

'বেশ তো দিন না।'

'দেবার মালিক কি আমি!' সুচারু হাসল, 'দেখ, চেষ্টা করি; তারপর যা হয়—'

একটু চুপচাপের পর সুধা আবার বললে, 'আমাদের অফিসের চাকরিটা তা হলে—'

'ওটার আশা না করাই ভাল। আগে থেকেই দু-চারজন চেষ্টা করছিল মোটামুটি ঠিকও হয়ে গেছে।' সুচারু আবার সিগারেট ধরাল, 'এখন যদি আমি বলি—'

'না—না—তা হলে থাক।' সুধা তাড়াতাড়ি বাধা দিল।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সুচারু বলল, 'কী রকম ফাঁকা দেখছ। এই ওয়েলিংটনের মোড় রাত দশটা পর্যন্ত জমজমাট থাকত। সন্ধের মুখে তো গাড়ি ঘোড়া ট্রাম বাসের ভিড়ে রাস্তা পেরোনই দায় ছিল। আর এখনকার অবস্থা দেখ, ছ'টা বেজেছে—এর মধ্যেই কেমন ফাঁকা! কলকাতার আর লাইফ নেই।' সুচারু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আক্ষেপ-সূচক শব্দ করল।

মোড়টা পেরিয়ে এসে সুচারু প্রস্তাব করল, 'চলো পার্কটায় একটা চক্কর দিয়ে যাই। তোমায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব।'

আপত্তি করল না সুধা।

পার্কে এসে পাশাপাশি মন্থর পায়ে হাঁটছিল ওরা। অন্ধকার হয়ে আসছে। দক্ষিণের ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। মাথার ওপর দিয়ে পাখি উড়ে গাছের ডালে বসছে, তাদের কিচির মিচির। সামান্য ক'টি লোক এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। আলখাল্লা পরা একটা বুড়ো মাঠে বসে গান গাইছে—রামপ্রসাদী সুর। আকাশে তারা ফুটে উঠেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সুধার মুখের দিকে চেয়ে সুচারু বলল, 'তোমার ভাইয়ের জন্যে সুপারিনটেনডেণ্টকে কিছু বলতে আমি রাজী হলাম না বলে তুমি যেন অন্য কিছু মনে করো না—'

'না, না, মনে করব কেন ?' সুধা মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বললে।

'না, ভাবতে তো পার, আমি এড়িয়ে গেলাম।' সুচারু সরু পথ ছেড়ে ঘাসে নামল, 'এ-খবরটা আমি আগেই জানতাম। তোমার ভাইয়ের কথাও আমার মনে হয়েছিল একবার। কিন্তু—' সুচারু সঙ্কোচ বোধ করে থেমে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল সুধা।

'মাইনে সামান্য হলেও কাজটার অন্য অনেক দায়িত্ব আছে। সুচারু বলছিল, 'চুরি টুরির সুযোগ সুবিধে খুব। কাঁচা পয়সার লোভ সামলানো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। বলা যায় না, ছেলে মানুষ কী করতে কী একটা করে ফেলবে—তখন তুমিও ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে।' সুচারু একটু থেমে বলল আবার, 'এই সব ভেবে আমি আর তোমায় কিছু বলি নি, নয়তো আগেই বলতুম।'

সুধা চুপ। সুচারুর কথাগুলো তার মনের মধ্যে বিশ্রী এক অস্বস্তি এবং লজ্জা ছড়িয়ে দিল। এমন ভাই ওর। দেখেই যার সম্পর্কে খারাপ ধারণা বাইরের লোকও করে নিতে পারে। অধোমুখেই থাকল ও। আবার অন্য এক রকম, অদ্ভুত রকমের সামান্য খুশিও এই অস্বস্তি ও লজ্জার মধ্যে মিশে যাচ্ছিল। সুধার ভাল মন্দ এত খুঁটিয়ে ভাবে সুচারু—এ যেন সুধার জানা ছিল না।

'ভালই করেছেন।' সুধা হঠাৎ মুখ তুলে বললে, ভাইয়ের ওপর অটুট বিরক্তি নিয়ে, 'ওকে বিশ্বাস নেই।' সোনা-চুরির কথাটা আর একটু হলেই ঠোঁটের ডগায় এসে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সামলে নিল। মনে মনে ভাবলে—এই ছেলেই তো সে-দিন মার বাক্স থেকে সুধার ছেলেবেলার কানের মাকড়ি দু'টো চুরি করেছে। হোক্ সামান্য জিনিস—তবু তো চুরিই।

সুচারু সমস্ত জিনিসটা সহজ করার জন্য বললে, 'তুমি ভেব না, কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমি তোমার ভাইকে কোথাও না কোথাও ঠিক লাগিয়ে দিয়ে যাব।'

'কলকাতা ছাড়ার আগে—' সুধার কাছে কেমন যেন শোনাল কথাটা, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' সুধা ঘাড় উঁচিয়ে সুচারুর চোখে চোখ রেখে অবাক হয়ে শুধোল।

'কেন, যেখানে যাব বলেছি। যুদ্ধে। এই তো আর ক'দিন পরেই এপ্রিলের ফিফ্‌থে আমার ইণ্টারভিউ। কথাটা এখন যেন কাউকে বলো না দয়া করে।' সুচারু সহজ গলায় জবাব দিল।

সুধা সুচারুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। ভাল করে কিছু ভাবতে পারছিল না। কথাটা নতুন নয়, এই প্রথম শুনল না—কতবার এই ঠাট্টা কৌতুক করেছে—কিন্তু বলতে কি, সুচারু যে সত্যিই যুদ্ধে যাবে—সুধা যেন তা তেমন করে ভাবে নি, ভাবতে পারে নি। আগাগোড়া ব্যাপারটাকে কথার কথা, খেয়াল বলেই ভেবেছে।

আজ এখন সুধা আর সন্দেহ করতে পারল না। ইণ্টারভিউ পর্যন্ত দিতে যাচ্ছে যখন—তখন অবিশ্বাসের কি আছে।

আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে নিল সুধা। অজান্তেই বুকটা কখন ভারি হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস পড়ল। শব্দটাও কানে গেল সুচারুর।

একটু যেন চমকে উঠে নিজেকে সহজ করবার চেষ্টা করল সুধা। সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। বললে, 'সত্যিই তা হলে যুদ্ধে যাচ্ছেন?'

'মানে! এতদিন কি ভাবছিলে তামাশা করছি?'

'একরকম তা-ই।' সুধার গলা একটু কাঁপল। মুখের বিষণ্ণতা যদি চোখে পড়ে সুচারুর, মুখটা তাই ঘুরিয়ে অন্য দিকে ফেরাল। দূরে চোখ রেখে কী যেন দেখতে দেখতে আস্তে পায়ে এগিয়ে চলল।

তারপর আরও সহজ হবার জন্যে লঘু স্বরে বলবার চেষ্টা করল, 'জাপানই আপনাকে বন্দুক ধরাল শেষ পর্যন্ত।'

'না, তা নয়। কোথায় ঠেলে দেবে কে জানে। হয়ত জাপানীর টিকিও সেখানে দেখার যো নেই।' সুচারু নির্বিকার স্বরে জবাব দিল।

তারপর চুপচাপ। আরও একটু এগিয়ে আসতেই মাত্র কয়েক হাত দূরে কাদের দিকে যেন নজর পড়ল সুচারুর।

'তোমার ভাই বাসু না—?' মাঠে ঘাসের ওপর আধ-শোয়ার ভঙ্গি করে বসা দু'টি ছেলেকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে সুচারু বললে।

সুধা অন্যমনস্কতা এবং অন্য এক চিন্তা থেকে জেগে উঠে চোখ মেলে চাইল যেন। হ্যাঁ বাসুই। গা এলিয়ে বসে সিগারেট কিংবা বিড়ি ফুঁকছে। পাশে গৌরাঙ্গ।

একটুক্ষণ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সুধা বললে, 'চলুন ফিরি; সন্ধে হয়ে গেছে। মা হয়ত ভাবছেন।' কথা শেষ করেই পিছু ফিরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল সুধা। সুচারু কী ভেবে নিঃশব্দে হাসল। সুধাকে অনুসরণ করে ফিরে চলল।

গৌরাঙ্গ কিন্তু দেখতে পেয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে। আঙুল দিয়ে সুধাদের দিকে দেখিয়ে বললে, 'তোর দিদি বাসু।'

বাসু মুখ ফিরিয়ে দেখল। হ্যাঁ, দিদিই। আর সেই লোকটা। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে দিদি। বাসুকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়। বাসু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আপন মনে হাসল।

সতেরো

'ওই ভদ্রলোক কে রে?' গৌরাঙ্গ শুধোল।

সুচারু-সুধার মূর্তি ততক্ষণে মিলিয়ে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে বাসু জবাব দিল, 'সুচারু—বাবু; দিদিদের অফিসে কাজ করে।' 'বাবু' শব্দটা আলাদা করে অস্বাভাবিক একটা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করলে। শুনলেই মনে হয় ঠাট্টা করল। হাঁটু ভাঙা পা আরও একটু দুমড়ে আকাশের দিকে মুখ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল বাসু। তারপর হঠাৎ হিক্কা তোলার মতন হাসির অদ্ভুত এক শব্দ করে বললে, 'দিদির ফ্রেণ্ড ও, তা জানিস?'

'আগেও আমি দু'দিন ভদ্রলোককে তোর দিদির সঙ্গে দেখেছি।' গৌরাঙ্গ মনে করে বলছিল, 'বীরেনদের দোকানের সামনে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল দু'জনে; আর একদিন দেখলাম কোথায় যেন -'

'দেখবি, দেখবি-- কত দেখবি এখন।' বাসু গৌরাঙ্গকে থামিয়ে ঘাড় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছিল, রসিকতা করেই, 'মক্কেল এখন ঘুর ঘুর করছে খুব। বাড়িতেও আসে মাঝে মাঝে।'

বাসুর এই অত্যন্ত হাল্কা স্বর, তাচ্ছিল্য আর ঠাট্টা-রসিকতার ভঙ্গি গৌরাঙ্গর ভাল লাগছিল না। তবু চুপ করেই থাকল; কিছু বলল না।

'সুচারু মানে কি রে, গৌরাঙ্গ?' বাসু আচমকা প্রশ্ন করলে।

গৌরাঙ্গ একটু থতমত খেয়ে গেল প্রথমটায়। বাসুর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর জবাব দিল, 'মানে আর কি—সুন্দর, খুব সুন্দর—দেখতে বেশ ভাল।'

'এক্কেবারে রাজপুত্তুর; না কি রে—এ্যাঁ!' হো হো করে হেসে উঠল বাসু। হাসি থামলে সিগারেটটা টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'সিক্রেট্

কথা তবে বলব একটা তোকে?' বাসু ঘাড় বেঁকা করে গৌরাঙ্গর মুখে তাকাল।

গৌরাঙ্গ যদিও ঠিক বুঝতে পারছিল না, বাসু তাকে কি বলবে তবু মোটামুটি অনুমান করছিল কথাটা নিশ্চয় দিদিকে নিয়ে।

'বল্!' গৌরাঙ্গ আগ্রহ প্রকাশ করলে।

'কথাটা কিন্তু মাইরি আর কাউকে বলবি না; দিব্যি কর।'

গৌরাঙ্গ দিব্যি করল। বললে, 'তোর কথা কাউকে আমি বলি কখনো!'

'না, তা বলিস না।' মাথা নেড়ে সায় দিল বাসু। একটু হেলে বসল। খানিক চুপচাপ। তারপর হঠাৎ বললে, 'দিদিটা ফেঁসেছে।' কথাটা বলল বাসু গাল আর চোখের কাছে কেমন একটু কুঁচকে, একটু হেসে।

গৌরাঙ্গ বোকার মতন চোখ বড়, মুখ হাঁ করে বাসুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

'আমি সব ওয়াচ করছি, বুঝলি।'

গৌরাঙ্গ তবু চুপ। কি বলবে না বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। বেফাঁস কিছু বলে বসলে বাসু ফট্ করে চটে যাবে।

'এখন মাইরি খুব ঢিলে সুতো!' বাসু নিজের থেকেই বলে চলল ইঙ্গিত পূর্ণ হাসি হেসে, ঠোঁট গাল কুঁচকে, ভুরু বেঁকিয়ে, 'দিদিটা ছাড়ছে—ও শালাও গুটোচ্ছে। নতুন নতুন তো। কিন্তু বাব্বা শেষ পর্যন্ত দি কাইট্ উইল্ কাট্; ঘুড়ি শালা সুতো ছিঁড়ে কেটে যাবে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল বাসু।

ব্যাপারটা মোটামুটি আঁচ করে ফেলেছে গৌরাঙ্গ। এবার বললে, 'তুই বড় আণ্ট্সাণ্ট্ বাত বলিস। কিসের কি—তা থেকে এক্কেবারে—!'

'কী আণ্ট্সাণ্ট্ বাত! তুই আমায় শেখাবি এ-সব?' বাসু গৌরাঙ্গকে ধমকেই উঠল একরকম।

'আমি শেখাব তোকে! মাথা খারাপ! আমার বাবাও পারবে না।' গৌরাঙ্গ হাসল।

'তবে যা বলছি একেবারে ঢালাই মশলা—গেঁথে নে শালা। বাসু ভট্চায অত কাঁচা নয়। ওরা প্রেম করছে—ওই দিদি আর সু-চারু।' বাসুর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠছিল। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওর ধবধবে দাঁতের কয়েকটা চোখে পড়ছিল কথা থেমে যাবার পরও।

গৌরাঙ্গ কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'যা, কী বলিস তুই, তোর না দিদি!'

'লে লে, দিদি—! অমন দিদি আমার ঢের ঢের দেখা আছে।' অত্যন্ত বিরক্তিজনক একটা মুখভঙ্গি করল বাসু। 'দিদি বলে তো আর পীর নয় যে, কিছুই বলতে পারব না। ও প্রেম কবতে পারে আর আমি বলতে পারি না।'

বাসুর দিদি বলেই হোক বা বয়সে বড় বলেই হোক সুধাকে বেশ একটু খাতিব করত গৌরাঙ্গ। ওদের পরিবারে গুরুজনদের ওপর শ্রদ্ধা-ট্রদ্ধাগুলো আবার বেশ খুঁটিয়ে মেনে চলা হয়। কাজেই যতই মুখরোচক হোক, এই আলোচনায় কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকছিল। কথাটা একটু পাশ ঘুরিয়ে নেবার জন্যে গৌরাঙ্গ বললে, 'ওই ভদ্রলোক কেমন রে, ভাল না?'

'কে সুচারু!' বাসু আগের মতই বিকৃত ঠাট্টার সুরে উচ্চারণ করলে নামটা, 'বেশ চালু ছোকরা! দেখছিস না কেমন জমিয়ে নিয়েছে।'

একটু থামল বাসু, 'কিন্তু যতহ জমাও বাবা, বললাম না তোকে আগে, শেষ পর্যন্ত ঘুঁড়ি কেটে যাবে। প্রেম শালা এমনি জিনিস।' বাসুর গলা বিরস শোনাল।

'সবই তোর মতন না কি রে?' গৌরাঙ্গ হাসল।

বাসু আকাশের দিকে চোখ তুলে বসে থাকল। সমস্ত মুখটা বিষণ্ণ অথচ রূঢ় দেখাচ্ছিল। গৌরাঙ্গ চুপ করেই ছিল। বিড়ি ধরিয়ে হাওয়ায় ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল আপন মনে।

আচমকা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাসু বললে, 'সবাই মীনুদি; বুঝলি গৌরে—! স-ব্বাই।'

বাসুর ক্ষুব্ধ, হতাশ স্বর কান এড়িয়ে যাবার নয়। গৌরাঙ্গর কাছে তো নয়ই। বন্ধুর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গৌরাঙ্গ বললে, 'এখনো তোর মীনুদিকে মনে পড়ে?'

'পড়ে না, রোজ পড়ে। সব সময়।' বাসু গৌরাঙ্গর একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেলল, 'তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি মাইরি, বিশ্বাস কর—সারা দিনে না কতবার যে মনে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে প্রথমেই মীনুদিকে মনে পড়ে, রাত্রে ঘুমুতে যাচ্ছি তখনও। জানিস শোবার সময় একলা চুপচাপ, চোখ বন্ধ করে, অন্ধকারে মীনুদিকে আমি ভাবি, অনে-ক-ক্ষণ ধরে। রোজ।' আবেগে বাসুর গলা ভরে এসেছিল।

দু'জনেই চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। পার্কে অন্ধকার নেমেছে। গাছের পাতার ফাঁকে পাখিরাও হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে। ট্রাম-চলার শব্দ ভাসছিল। খুব মৃদু জড়িত অদ্ভুত এক গুঞ্জন চারপাশে বাতাসের মতন ছড়িয়ে রয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে দক্ষিণ থেকে।

কোনরকম একটা কথা না বললে গৌরাঙ্গ যেন আর স্বস্তি পাচ্ছিল না। বললে, 'তোর একদম মনের জোর নেই। সে তুই যাই বলিস।' গৌরাঙ্গ একটু থেমে বাসুকে যেন পরখ করে নিল, 'আমি হলে ওর কথা কখখনো ভাবতাম না।'

'ভাবতিস না?'

'না। একবারের জন্যেও নয়।' গৌরাঙ্গ মাথা নাড়ল। 'কি হবে মিছিমিছি ভেবে। নিজেরই শুধু মন খারাপ। ওদিকে দেখগে যা

তোর মীনুদি এতদিনে অন্য ছোঁড়া জুটিয়ে নিয়েছে, থোড়াই তোর কথা ভাবে একবার। তবে?'

বাসু বন্ধুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ অর্থশূন্য ভাবে চেয়ে থাকল। শেষে বললে, 'ঠিক বলেছিস মাইরি। আমি শালাই যত ভেবে মরছি ওই খচ্ড়ি ছুঁড়িটার জন্যে। আর ও মজা লুটছে। বেইমান কাহাকার। যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। তুই জানিস গৌরে, ওর বাপটা আমার বাবার বহুত পাওনা টাকা মেরে দিয়েছে। এখন শালা কচ্ছপ নবাবী ফলায়, বড়লোকি চাল মারে। সেই বাপের মেয়ে তো, মদো মাতাল মাগীবাজের রক্তে জন্ম, ও আর আলাদা কি মাল হবে? বলতে বলতে উত্তেজনায় বাসুর মুখ-চোখের চেহারাই বদলে গেল। যদিও মুখের সে-ভাব দেখা যাচ্ছে না এখন, তবু বাসুর গলার স্বর থেকেই গৌরাঙ্গ সব বুঝতে পারছিল।

'ওর জন্যে ফালতু আমার ফিফ্‌টিন রুপিজের সিভিক গার্ডটাও গেল।' বাসু বললে।

এ-কাহিনী গৌরাঙ্গর শোনা আছে। তবু আবার শুনতে হল। বাসু বললে, পণ্টুদার ওপর কেন সে খচে গিয়েছিল। মীনুদির জন্যেই। সে-দিন লালবাজারে পাঠিয়েছিল পণ্টুদা, তাইতো মীনুদির সঙ্গে দেখা হয় নি। তাতেই যা রাগ বাসুর। সত্যি, ভীষণ রেগে ছিল ও। ক'টা দিন পরেই আবার একদিন যেই না পণ্টুটা হুকুম ফলাল, মেজাজটাও ভাল ছিল না বাসুর, স্রেফ মুখের ওপর না বলে দিল। এই নিয়ে দু-কথা। পণ্টুটা খুব ডাঁট নিচ্ছিল, খিস্তি বে-খিস্তি করে বসল। বাসুও ছাড়ল না। লাফিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, বাসুই প্রথম ঘুঁষি চালিয়েছিল। পণ্টুদার ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াতে লাগল। তারপর মারপিট। বাসু কিছু কম মার খায় নি। মদ-মারা ওই তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের মহিষাসুরের সঙ্গে বাসু কি পারে! পারে নি। বেদম মার খেয়েছে। হয়ত মরেই যেত। কিন্তু রক্ষে সেই সময়

চণ্ডীদা, কমলদা গিয়ে পড়েছিল। আর পণ্টু শালাও পেটে লাথি খেয়ে টলছিল, হাতের কব্জিটাও মচকে গেছে—বোধহয় দম ছিল না আর তাই থেমে গেল।

বাসু পুরনো কাহিনী শেষ করে থামতেই গৌরাঙ্গ বললে, 'পণ্টুদার সঙ্গে আর তোর দেখা হয় নি।'

'হ্যাঁ; কালই শালাকে দেখেছি। চামড়ার একটা রিস্ট ব্যাণ্ড লাগিয়েছে ডান হাতে।'

'কিছু বলল না তোকে?'

'আমাকে কিছু বলার সাহস আছে না কি ওর! পণ্টুর সব খচড়ামি আমি জানি, ফাঁসিয়ে দেব না। কত শালা গাব্‌বুর ব্যাপার আছে! চাউর করে দিলে ও-বেটা বাঁচবে নাকি আর।' বাসু একটু থেমে কী ভেবে আচমকা বললে, 'জানিস তুই, ও হারামি কি মতলবে ছিল?'

গৌরাঙ্গ মাথা নাড়ে; না, জানে না।

'আমায় বাগিয়ে দিদির সঙ্গে একটু জমাবে।' বাসু খানিকট উত্তেজনা, খানিকটা ব্যঙ্গের সঙ্গে বলছিল, 'বেটা আমায় কী তেলানটাই তেলিয়েছে। হাতে পায়ে ধরেছে শালা। দু-দুটো চিঠি পর্যন্ত দিয়েছিল দিদিকে দেবার জন্যে।'

গৌরাঙ্গ চুপ। বাসুর অস্পষ্ট আবছা মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। মনে মনে যেন ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করছিল কথাগুলো।

'সেই চিঠি আমার কাছে আছে।' বাসু নিজের থেকেই বললে। একটু থেমে আপনমনে, 'পণ্টু কাপ্তেন ভেবেছিল আমায় খুব জমিয়ে ফেলেছে। বাসু ভট্‌চায যে কী চিজ্ তা তো জানে না। আমিও শালা গুল মেরে মেরে বেটাকে টন্‌কে রেখেছিলাম। ঝগড়ার দিন ফাঁস করে দিয়েছি। সেই শুনেই তো পণ্টা খচে লাল হয়ে গেল।'

গৌরাঙ্গ কিছুক্ষণ থ' হয়ে বসে থেকে শুধোল, 'তোর দিদি চিঠির কথা জানে?'

'মাথা খারাপ, দিদি জানলে কী আর রক্ষে ছিল নাকি আমার। এমনিতেই তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না, পণ্টার পেরেম্‌পত্তর নিয়ে এসেছি জানলে জুতো মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত।' বাসু চুপ করল।

কিছু পুরনো কথা মনে পড়ছিল গৌরাঙ্গর। সিভিক গার্ডে ঢোকার পর থেকে বাসুর ধরন-ধারন, চাল-বেচাল, ডাঁট আর টাকাটা আধুলিটা হামেশাই রোজগারের একটা অর্থ সে যেন বুঝতে পারছিল। পণ্টু বাসুকে চুরি চামারির ভাগীদার এমনিতে করে নি, এই জন্যেই তবে করেছিল; বাড়তি খাতিরটাও তা হলে এই কারণে। ওদের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য বাসুর আড়ালে এ-রকম একটা ইঙ্গিত দিযে ঠাট্টা রসিকতা করত। গৌরাঙ্গ কোনদিন সে-রসিকতা গ্রাহ্য করে নি। আজ এখন মনে হল গৌরাঙ্গর, যা রটে তার খানিকটা তা হলে সত্যিই হয় বটে।

বাসু কেন অত পণ্টার পিয়ারের লোক হয়ে উঠেছিল, গৌরাঙ্গ আজ তা স্পষ্ট বুঝতে পারল। বলতে কি, বাসু পণ্টুর সঙ্গে অতটা মাথামাথি করে, গৌরাঙ্গ মনে মনে তা পছন্দ করত না কোনদিনই। কখনো সখনো বাসুকে বলেছেও সে-কথা। বাসু তখন তা গ্রাহ্যই করত না। ও সিভিক গার্ড ছেড়ে দেবার পর গৌরাঙ্গ তাই যেন সবচেয়ে বেশি খুশী হয়েছিল। আজ, আর-এক নতুন বৃত্তান্ত শোনার পর গৌরাঙ্গ আরও খুশী। পণ্টাকে আচ্ছা জব্দ করেছে বাসু। ঠিক করেছে। যেমন টেটিয়া ও-শালা তেমনি টেটীর পাল্লায় পড়েছে।

গৌরাঙ্গ তার লুকানো পুঁজি একটি মাত্র সিগারেট বাসুর দিকে এগিয়ে দিল দেশলাই সমেত। খুশী গলায় বললে, 'নে তুই-ই আগে ধরা।'

বাসু সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'কি রে বল্‌ একবার, পণ্টাকে কেমন নিয়েছি একহাত?'

'জোর নিয়েছিস।' গৌরাঙ্গ প্রাণখোলা স্বরে জবাব দিল, 'ও আব তোর দিকে এগুবেনা।'

বাসু আস্তে আস্তে একটু মাথা নাড়ল কথাটার সমর্থনে।

আরও খানিকটা বসে থেকে গৌরাঙ্গ উঠতে উঠতে বললে, 'ওঠ্, ফেরা যাক্,—বেশ সন্ধে হয়ে গেল।'

'উঠে কোথায় যাবি এখন?' বাসু উঠল না। ওঠার ইচ্ছেই যেন ওর নেই।

'ওঠ তো আগে, তারপর কোথাও গলে পড়লেই হবে।' গৌরাঙ্গ বাসুর হাত ধরে টানল, 'মণ্টাদের ওখানে দু'হাত তাসই না হয় খেলা যাবে।'

বাসু উঠল। আচমকা বললে, 'মণ্টার মাসীটা কী কালো মাইরি, এক্কেবারে আলকাতরা মাখানো। কতো বয়েস রে মেয়েটার?'

'কে জানে।' গৌরাঙ্গ হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল, 'বিয়ে তো হয় নি, আইবুড়ো মেয়েদের সবার বয়সই এক।' নিজের কথায় নিজেই হাসল গৌরাঙ্গ।

'যা বলেছিস।' বাসু কথাটা উপভোগ করলে। একটু থেমে বললে, 'চোখ দুটো দেখেছিস ওর—ঠিক মাইরি যেন জলে ভেজা পটলের মতন—ইয়া ডাগর ডাগর ফোলা ফোলা। সবই বড় বড় মেয়েটার।' কথাটা শেষ করে কী ভেবে একটু হাসল বাসু। আবার বললে, 'সে দিন কেমন খেললে আমাদের সঙ্গে। বেশ খেলে রে!'

'বেশ খেলে না হাতি, চোর কোথাকার। ভীষণ চুরি করে।' গৌরাঙ্গ পাত্তা দিতে চাইল না। আগের দিন ওদের কাছে হেরে গেছে বলেই হয়ত।

'চুরি নয় রে চুরি নয়—মেয়েছেলে তো, তাসই ভুলে যায়, গুলিয়ে ফেলে।' বাসু হঠাৎ গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে বলে উঠল, 'একবারই রঙে পাস দিয়েছিল।'

'যা যা, একবার! খুব যে আঠা দিচ্ছিস! অন্তত বার চারেক তো আমি হাতে হাতে ধরেছি। তারপর শালা, চোখে চোখে ইশারায় যে তোকে হাত বলে দিচ্ছিল, তা বুঝি আমি দেখিনি?'

'মাইরি না, বিশ্বাস কর, তোর প্রমিস করছি, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না।' বাসু গৌরাঙ্গর হাত চেপে ধরল। হেসে বললে, যা চোখ—শালা চোখ দেখব না ইশারা বুঝব।

পার্ক ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়ল দু'জনে। গৌরাঙ্গ বললে, 'মণ্টার মাসী আজ যদি খেলে, তোর সঙ্গে পেয়ার হয়ে বসতে দিচ্ছি না।'

কথাটাতে কী পেল বাসু কে জানে—জোরে হেসে উঠল। গৌরাঙ্গর গলা জড়িয়ে গায়ে হেলে পড়ে বললে, 'দিস মাইরি দিস—। দু' হাত খেলায় একটু জোড় বাঁধবো তাও শালা দিবি না!'

গৌরাঙ্গ বাসুকে ঠেলে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজেও হেসে ফেলল, 'তুই একদম জাহান্নমে গেছিস! দিন রাত খালি এক চিন্তা।'

'মাইরি যা বলেছিস। আমি শুধু ওই ভাবি। কিচ্ছু ভাল লাগে না। পাগলা হয়ে যাব কোন্‌দিন।' বাসু হেসে হেসে বলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারল না। অন্য রকম শোনাচ্ছিল ওর গলা।

আঠারো

সুচারু আশা করেছিল ইণ্টারভিউর পাটটা চুকে গেলে এপ্রিলের শেষাশেষি খুব সম্ভব সে কলকাতা ছাড়তে পারবে। দেখা গেল বাছাই কাজটা যদিও কঠিন নয় কিন্তু তার দফা আছে। স্থান কাল পাত্রের পার্থক্য আছে। এক দফায় হল না, আর এক দফা। দ্বিতীয় দফা শেষ হলেও এটা সেটা; শেষে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। এ সব মিটতে মিটতে মে-মাস শেষ হয়ে গেল। জুনের একেবারে গোড়াতেই সুচারুর ওপর কলকাতা ছাড়ার হুকুম হল।

মিশন রোর অফিসে চাকরি ছাড়ার চিঠিটা এবার ধরিয়ে দিল সুচারু।

বন্ধুরা ঘিরে বসল। সত্যিই শেষ পর্যন্ত তুই আমাদের ছেড়ে চললি সুচারু! তা ভালই করলি। রিস্ক্ না নিলে জীবনে কিছু হয় না। আমরা চিরকালই এই তিমিরে পড়ে থাকব ভাই, আর আণ্ডাগাণ্ডা পুষে, মুতের কাঁথার গন্ধ শুঁকে জীবনটা কাটিয়ে দেব।

অনন্ত বললে, তোর যাবার এখনো তিন দিন বাকি। এর মধ্যে তোকে আমরা একটা ফেয়ারওয়েল দিতে পারি।

কমল বললে, তাই লাগা। মাইনেটা আজ পেয়েছি। আজ যদি চাস সুচারুর জন্যে পাঁচ-পাঁচটা টাকাও আমি চাঁদা দিতে পারি। কাল হলে আর পারি না। কিন্তু আমার ইচ্ছে, সুচারুকে নিয়ে আমরা ক'জনে অন্য জায়গায় বসে ফুর্তি করি; এই হাটে নয়। বলে কমল চোখ টিপে একটু হাসল।

শিশির মাথা নাড়ল। তা হয় না। কমলদার পছন্দ মতন জায়গায় সুচারু হয়ত যাবে না।

'যা, যা, যাবে না; দেখছিস লোকটা ওআরে যাচ্ছে, তীর্থ করতে যাচ্ছে না।'

সুচারু হেসে বললে, 'প্রেজুডিসের কথা নয় কমলদা। আমাকে এ সব অপ্যায়নের কোন দরকার নেই তোমাদের।'

'তাই কি হয়!' কমল মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে বললে, 'জান লড়িয়ে দিতে যাচ্ছিস, মরবি কি বাঁচবি কে জানে, যাবার বেলায় দু'টো ভাল মন্দ না খাইয়ে, দু'চার ফোঁটা চোখের জল না ফেলে কি পারি রে!'

'তুমি থাম তো কমলদা!' শিশির বললে, ও সব অন্যের অধিকারে, আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না।' শিশির হাসল। তার ইঙ্গিত বন্ধুদের চোখে চোখে ফিরল।

'তাই নাকি!' কমল ঘাড় বেঁকিয়ে দূরে ওধাদের টেবিলের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলে। বলল, 'কী নিষ্ঠুর তুইরে সুচারু, হৃদয় দলিত করে শেষ পর্যন্ত সত্যিই চললি! বিদ্যাপতি সিনেমার সেই সিনটা মনে আছে তোদের! তেমনি অবস্থা যদি হয়—' বলে কমল মুচকি হেসে গুনগুন করে গাইল, 'যেতে নাহি দিব...তব রথচক্রতলে প্রাণ দিব বলে...'

হাসির একটা দমকা ঢেউ বয়ে গেল বন্ধুদের মজলিসে।

হাসি থামলে সুচারু বললে, 'শোন কমলদা, সত্যি তোমরা আমাকে বিদায়মাল্য দেবার ব্যবস্থা করো না। একে তো আমার অনেক কাজ, নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলা আছে, সময় পাব না; তা ছাড়া আমি চাই না তোমরা আমায় এত সহজে একটা মালা পরিয়েই ভুলে যাও।' কথাটা কত তুচ্ছ। কিন্তু আজ অগোছাল কথাটা বলতে গিয়ে সুচারুর গলার স্বরটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। মুখের হাসিটাও অন্য রকম দেখাচ্ছিল।

কমল-অনন্তরা চুপ করে থাকল। একটুর জন্যে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা আর মনোভার ক'টি বন্ধুকে অন্যমনস্ক নির্বাক করে দিল। শেষে কমলই বললে বিরক্তির ভান করে, 'অনেক তো জ্বালিয়েছিস বাবা আর কেন। যাচ্ছিস যা, কেটে পড়। অনেক শালা ময়লা জমে থাকল, ধুয়ে মুছে মনটাকে সাফ্ করে ফেলতে হবে।'

'পারবে তো ?' সুচারু হাসল।

'আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—পারব; আমরা সব পারি, চার বছরের বিয়ে করা বউ মরে গেল, রাতারাতি সব কিছু ওয়াশ-আউট্ করে টুপ্-সে আর একটাকে বিয়ে করে অর্ধশয্যা দিয়ে দিলুম, আর তুই তো একটা কোথাকার কোন্ বন্ধু, হুঁ—!' কমল খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাগুলো বলে হঠাৎ চুপ করে গেল। পরক্ষণেই মাথা নীচু করে পায়ের জুতোটা টেবিলের তলায় খুঁজতে লাগল।

বন্ধুদের ছেড়ে সুচারু একে একে সকলের সঙ্গেই দেখা করলে। ললিত-বাবু, অনাদিবাবু, মৃগাঙ্কমোহন। কেউ সুচারুর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন, কেউ উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে পিঠ চাপড়ে দিলেন। কেউ প্রশ্ন করলেন, কত পাবে টাবে হে। লাইফ্ রিস্ক যখন নিচ্ছ, নিশ্চয় পকেটে মোটা কিছু আসবে।

সুচারুর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ললিতবাবুকে। এই লোকটা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না সুচারুর কখনো। অথচ ললিতবাবুর কাছে যেতেই সুচারুকে হাত বাড়িয়ে টেনে পাশে বসালেন। তারপর কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকলেন সুচারুর মুখের দিকে। একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল না। দেখতে দেখতে তাঁর ঠোঁট দু'টো থর থর করে কাঁপতে লাগল। কিসের এক আবেগ যেন তাঁর মুখে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠল। সজল হয়ে উঠল দুই চোখ।

সুচারু বিমূঢ়। অস্বস্তি হচ্ছিল তার। নিজের মনটাও কেমন হঠাৎ দুর্বল হয়ে আসছিল। কিন্তু কোন কথা সে বলতে পারছিল না।

শেষে ললিতবাবু ধরা গলায় বললেন, 'তুমি বড় বেশি রিস্ক নিলে সুচারু। তোমার বয়স কম, তুমি বুদ্ধিমান—এমনিতেই অন্য কোথাও চেষ্টা করলে অনেক উন্নতি করতে পারতে। যেখানে যাচ্ছ সেখানে জীবনের দামের বিনিময়ে কতটুকুই বা উন্নতি। ভুল করলে ভাই, ভীষণ ভুল করলে।'

উন্নতির জন্যে আমি ঠিক যাচ্ছি না ললিতদা, এই কলকাতা আর এই অফিস—এর বাইরেও জীবন আছে। পাঁচটা জায়গায় যাব, পাঁচ রকম জিনিস দেখব—খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব—' সুচারু তার কথা সহজভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলে।

ললিতবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'ও-সব মুখের কথা সুচারু। তুমি ছেলেমানুষ তুমি তা বুঝবে না। যুদ্ধটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের জায়গা নয়। আমার বড়দাও ওই ভেবে গিয়েছিলেন ; লাস্ট গ্রেট ওআরে! কারুর বাধা মানেন নি। কিন্তু অভিজ্ঞতার থলি বোঝাই করে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় নি।' ললিতবাবু সুচারুর কাঁধে আস্তে করে হাত রেখে চুপ করে গেলেন।

একটু চুপচাপ। সুচারু অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা এবার উঠি ললিতদা—'

'এসো ভাই।' ললিতবাবু সুচারুর হাত আবেগের সঙ্গে ধরে চাপ দিলেন, 'তোমার সঙ্গে আবার যেন আমাদের দেখা হয়।'

সুচারু কথার জবাব দিল না, ম্লান ভাবে হাসল একটু।

ললিতবাবুর টেবিল থেকে সরে এগিয়ে যেতে যেতে সুচারু হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করছিল। বেশ বুঝতে পারছিল, মনটা তার দমে গেছে একটু। এতদিন যে দৃঢ়তা ছিল, আজ এই অফিসের বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে সেই দৃঢ়তায় কোথায় যেন একটা ফাটল ধরে গেছে। বেদনা বোধ করছিল ও। আর উন্মনা ভাব মনটাকে ভরে তুলছিল। তবে কি সুচারুও ভয় পেয়ে গেল শেষ মুহূর্তে? ভয়! না, না, ভয় কেন।

বেশ একটু অন্যমনস্ক ভাবেই সুচারু ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল সুধাদের টেবিলের সামনে।

মুখ তুলে অমলা একটুক্ষণ সুচারুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। বললে, 'আমরা তো ভাবলুম, শুভযাত্রায় যাবার আগে আমাদের আর মুখদর্শনই করবেন না।, হাজার হোক নারীজাতি তো!'

'না, না, তা কেন—' সুচারু সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে হাসল।

'আপনি নাকি কি যেন হয়েছেন, শুনছিলাম।' অমলা অজ্ঞতার সঙ্গে বললে, হাসি মুখেই।

'হয়েছি! কি হয়েছি জানি না তো। তবে একটা কিংস্ কমিশন পেয়েছি।' সুচারু হাসল।

'কোথায় যাবেন এখন?' অমলাই আবার শুধোল।

'প্রেমনগর। দেরাদুন। ট্রেনিং নিতে হবে কিছুদিন।'

'কবে যাবেন?'

'পরশুর পরের দিন—শুক্রবারেই।'

সামান্য একটু চুপচাপ। অমলা বললে আবার, 'এই কলকাতা, বান্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন—এ-সব ছেড়ে যেতে আপনার একটুও কষ্ট হচ্ছে না?'

'তা একটু আধটু হচ্ছে বৈকি!' সুচারু হাসল।

'তাতেই হবে।' অমলা এবার একরকম মিশ্র হাসি হেসে জবাব দিল, 'ওই একটুই সকলে ভাগাভাগি করে নেবে।'

অমলার হেঁয়ালি সুচারু ঠিক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল অপলকে।

অমলা ততক্ষণে অন্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। টেবিল থেকে দু'টো কাগজ উঠিয়ে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একরকম স্বগতোক্তি করেই বললে, 'চিঠি দু'টো টাইপ সেকশানে দিয়ে আসি।' কথাটা বলে, যাবার একটা ভঙ্গি করল অমলা, সুচারুর মুখের দিকে চেয়ে খুব স্বচ্ছ সুন্দর একটু হাসল, 'আমার শুভেচ্ছা রইল। নিরাপদে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসেন যেন।'

অমলা চলে গেলে ক' মুহূর্ত চুপ করে থাকল সুচারু। সুধা একটু নড়ে চড়ে উঠল।

সুচারু সুধার টেবিলের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে ওর মুখ দেখবার চেষ্টা করে বলল, 'কী ব্যাপার, ঘাড় মুখ গুঁজে খুব যে কাজ করছ!'

সুধা কথাগুলো চুপচাপ শুনে গেল। জবাব দিল না।

সুচারু আবার বলল, 'সন্ধের দিকে তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মাসীমাকে বলো।'

মাথা নাড়ল সুধা। বলব।

সুচারু একটু অপেক্ষা করে বললে, 'নেহাত যদি কোন কারণে আটকে পড়ি তবে কালকে যাব।'

সুধা পুরোপুরি না হলেও এবার খানিকটা মুখ তুলল। ছোট্ট করে জবাব দিল, 'মাকে বলব।'

সুচারু এবং সুধা দু'জনেই বেশ বুঝতে পারলে তাদের একই কথার পুনরাবৃত্তি নিছক যেন সময় কাটানো।

আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে সুচারু সুধাদের টেবিলের পাশ থেকে সরে গেল!

সুধা মুখ তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে সুচারুকে একবার দেখল। বিভূতিবাবুর সঙ্গে কথা বলছে। বেশ সাধারণ ভাবেই। দেখলে মনে হয় না, কাল থেকে এই অফিসে ওই লোকটি আর আসবে না।

সুধা হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে কালকের—শুধু কালকেরই নয়, কাল পরশু এবং সপ্তাহ কী মাস বছরের পরের কথাই ভাবতে লাগল, এই অফিসে যখন সুচারু বলে কোন মানুষ আর থাকবে না। একটা অস্পষ্ট ছবি সুধার চোখের সামনে পাতলা এলোমেলো ধোঁয়ার মতন ছড়িয়ে পড়েও ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল—আর সে-ছবিতে এই গুঞ্জন মুখরিত আধো আলোছায়া ভরা অফিস ঘরের কোথায় যেন একটা অদ্ভুত শূন্যতা খাঁ খাঁ করছিল।

অজ্ঞাতেই সুধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাগজের ওপর হিজিবিজি কাটতে লাগল।

অমলা ফিরে এসে চেয়ার টেনে বসল। বসেই সুধার মুখের দিকে চেয়ে গলা বাড়িয়ে হেসে বললে, 'কি রে, ভাল্লুক কানে কানে কি বলে গেল?'

চট্ করে জবাব দিতে পারল না সুধা। মনটাকে এক মহল থেকে অন্য মহলে আনতে একটু সময় লাগল। তারপর ঠোঁটের গোড়ায় একটু হাসি ফুটিয়ে জবাব দিল, 'ভাল্লুক বললে, যে-বন্ধু বিপদের সময় তার বন্ধুকে ফেলে পালায় তাকে বিশ্বাস করো না কখনো!'

অমলা এবার সামান্য শব্দ করেই হেসে ফেলল। 'বেশ জবাব দিয়েছিস। দেখছিস তো তোর কেমন মুখ ফুটেছে।' অমলা আরও একটু গলা বাড়িয়ে দিল সুধার দিকে, 'সত্যিই এখন তোর বিপদের সময়। আমি কী আর অতো তলিয়ে বুঝেছি। বরং ভাবলুম যাই উঠে, দু'টো কথা বলুক বেচারীরা। তা তোর ভাল্লুকটা এমন বেয়াড়া হবে কে জানত।

'খুব উপকার করেছিলে আমার। যাক্, এখন বল তো এটা কি করি—?' সুধা একটা অফিসের কাগজ এগিয়ে দিয়ে কথাটা চাপা দিতে চাইল।

'চুলোয় দিয়ে আয়।' অমলা সুধার হাত ঠেলে সরিয়ে দিল। 'একটা কথা বল্ তো—!'

'তোমার সব বাজে কথার আমি জবাব দিতে পারি না।'

'তা বই কি, বাজে কথাই বলি আমি।' অমলা একটু উষ্মা প্রকাশের ভঙ্গি করে সুধার দিকে চাইল। পরক্ষণেই বললে, 'আমি হলে কি করতাম জানিস? পথ আগলে দাঁড়াতাম; বলতাম, তোমার যুদ্ধে যাওয়া চলবে না।'

'বেশ তো বললেই পারতে তুমি।' সুধা বিষণ্ণ হাসি হাসল, 'আমি তা বলতে যাব কেন? আমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক, আমার অধিকারই বা কি?'

অমলা সুধার দিকে ঝকঝকে চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর উত্তেজনার সঙ্গে বললে, 'বেশি ন্যাকামি করিস না সুধা। এ-সব দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। ভালবাসিস না তুই ওকে, না ওর নিজেরই কোন টান নেই? তবে? উনি একটি মেয়েকে মজিয়ে নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে চললেন যুদ্ধে! কেন? আগে তাঁর এ-কথা মনে হয়নি। না, এই

মেলামেশাটা উনি ভেবেছিলেন কলসী থেকে জল গড়ানোর মতন। এর দাগ নেই, দাম নেই, ভালমন্দ কিছু নেই। বল্ তুই, এ-সব আজ বাদে কাল ভুলে যেতে পারবি? অমলার গলা ক্ষোভে, উত্তেজনায় কর্কশ হয়ে উঠেছিল।

'অমলাদি, তুমি চুপ কর; এ-সব কথা থাক।'

সুধা বিহ্বলতা চাপতে চেষ্টা করল। পারল না। তার গলার স্বর গাঢ়ো গাঢ়ো লাগছিল। একটু বা ক্ষুব্ধও। মুখ নীচু করে পেন্সিলটা দাঁতের সবটুকু জোর দিয়ে কামড়ে বসে থাকল সুধা। গলার কাছটা ব্যথায় পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল, টনটন করছিল চোখদুটো।

বসে থেকে থেকে সুধা হঠাৎ উঠে করিডোরের দিকে চলে গেল। অমলা সবই দেখল আড়চোখে।

বাড়ি এসে রত্নময়ীকে কথাটা বললে সুধা।

রত্নময়ীর একেবারেই যে কিছু শোনা ছিল না, তা নয়। সুচারু যে দ্ধে যাব যাব করছে—রত্নময়ী তা জানতেন। ভাবতেন, এত জায়গা থাকতে আপদ বিপদের মধ্যে শখ করে কেন যেতে চাইছে ছেলেটা! মানুষ নাকি খুব বড় শোক দুঃখ পেলে সব ফেলেফুলে এ-ভাবে যেখানে সেখানে চলে যায়। আর যায় গোঁয়ারতুমি করে।

সুধার মুখ থেকে কথাটা শুনে রত্নময়ী মেয়ের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন।

সুধা রোজকার মতন অফিস-ফেরত ক্লান্ত শরীরটাকে তক্তপোশের কোল ঘেঁষে লুটিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। মুখটা একপাশে কাত করে হাত ছড়িয়ে আড়াল করে রেখেছিল।

রত্নময়ী মেয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। খালি মনে হল, অফিস থেকে আজ যেন আরও শুকনো মুখে ক্লান্ত হয়ে ও ফিরেছে।

তখন আর কিছু বললেন না রত্নময়ী। সুধার মাইনের টাকাটা হাতবাক্সে রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সুধা গা-ধুয়ে শাড়ি জামা বদলে যখন রান্নাঘরের চৌকাটের কাছটিতে চা জলখাবার খেতে বসল—রত্নময়ী তখন কথাটা তুললেন।

'কবে যাচ্ছেরে সুচারু?

'শুনলাম তো শুক্রবার।' সুধা রুটি চিবোতে চিবোতে বললে।

একটু চুপচাপ। আরতি রত্নময়ীর পাশে বসে চা তৈরি করছিল। হাত থামিয়ে একবার দিদি, একবার মার মুখের দিকে তাকাল। কথাটা সে শোনে নি।

'কোথায় যাবে মা সুচারুদা?' আরতি শুধোল।

'যুদ্ধে।' রত্নময়ী হাতের কাজ করতে করতে জবাব দিলেন।

আরতি যুদ্ধ জিনিসটার ধারণা করবার চেষ্টা করল। এ-বয়সেই শুনে শুনে, কাগজের ছবিটবি দেখেটেখে তারও মোটামুটি একটা ধারণা যেন হয়ে গেছে যুদ্ধ সম্পর্কে। সে-ধারণা সাজ্ঘাতিক কিছুর, ভয় পাবার মতন কোন জিনিসের। আরতি খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে থাকল।

রত্নময়ী সুধাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সুচারুও দেখছি ভীষণ গোঁ-ধরা ছেলে। যাব বলল তো সেই গেলই। কি দরকার ছিল এই আপদ বিপদের মধ্যে যাওয়ার?'

'বা, যাবে না—!' সুধা মুখ নীচু করে ম্লান হাসি ফুটিয়ে বললে, মাকেই শুধু নয় যেন নিজেকেও শোনাচ্ছে, 'পুরুষ মানুষ জীবনে উন্নতি করবে না।'

রত্নময়ী মেয়ের দিকে তাকালেন। 'এতে কি খুব উন্নাত হবে?'

'তাই তো শুনি।'

'কারুর উন্নতিতে দুঃখ করতে নেই ; কিন্তু যেখানে নানা রকম আপদ বিপদ সেখানে কি না গেলে চলত না?' এমন ভাবে প্রশ্নটা করলেন রত্নময়ী যেন ব্যাপারটা সুধার বিবেচনা করবার।

সুধা কোন জবাব দিল না। চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ডুবিয়ে চুপ করে থাকল।

খানিকটা চুপচাপ। চা শেষ করে সুধা উঠেছে—রত্নময়ী বললেন, 'হ্যাঁরে, সুচারু আজ ঠিক আসবে তো।'

'বলেছে সে-রকম; না পারলে কাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।' সুধা বললে এমন ভাবে, যেন শুধু রত্নময়ীর সঙ্গেই সুচারু দেখা করতে আসছে।

'একটা কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এ-রকম দোনোমোনো অবস্থায় কি করব বুঝতে পারছি না।' রত্নময়ী উনুনে আধপোড়া কিছু কয়লা ঢেলে দিয়ে হাত ধুতে ধুতে বললেন। চৌকাটে দাঁড়ান মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন, 'ভাবছিলাম এলে ওকে আজ খেয়ে যেতে বলব। কখনো তো বলি নি।'

কথাটা যে নিজের না-মনে হয়েছে তা নয়। আগেও কয়েকবার ভেবেছে। সুচারু নিজেই কতবার ঠাট্টা করেছে—; সে-দিনও বলছিল, একদিন নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন কর, তোমাদের ছেড়ে চললাম—!

সুচারু হয়ত ঠাট্টাই করেছিল। কিন্তু সুধার যে না-ইচ্ছে ছিল তা নয়!

'আজ হলেই ভাল হত রে—!' রত্নময়ী বলছিলেন, 'মাইনেপত্তর পেয়েছিস্—দু-এক টাকার বাজার টাজার আনিয়ে নিতে পারতাম। কাল সকালেই একে তাকে দিতে থুতে আবার হাত খালি হয়ে যাবে।'

সুধার কেন যেন হাসি পেল। কী রকম অবস্থাতেই না তারা আছে! মাইনে পাবার দিন একটা লোককে তারা নেমতন্ন করে খাওয়াতে পারে, নয়ত নয়।

'বেশ তবে আজই কর; আসে আসবে, না-আসে না-আসবে।' একটু কেমন রুক্ষ গলায় বললে সুধা। রান্নাঘরের চৌকাট ছেড়ে চলে গেল।

রান্নাঘরে উনুনে কয়লার ধোঁয়া উঠছিল। রত্নময়ী বাইরে উঠোনে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। আরতিও।

রত্নময়ী ভাবছিলেন, কি করবেন! কি করা যায়? দু' তিনটে টাকা অযথাই খরচ করে বসবেন! যদি না আসে সুচারু।

সুধা উঠোনেরই একপাশে আলসের একধারে দাঁড়িয়ে ভাঙা বালতির টবে বসানো বেলফুলের গাছটা দেখছিল। গাছের মাটি শুকিয়ে ফেটে গেছে। কী দীন চেহারা। পাতাগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে রোদের তাতে তাতে, জলাভাবে শুকনো শুকনো। ক'দিন ধরে একটু বৃষ্টি নেই।

'এই আরতি, এদিকে আয়।' সুধা ডাকল উষ্ণ কণ্ঠে, 'করিস কি সারাদিন বাড়িতে, খালি নভেল পড়া, আর অড্ডা। ডলি গেছে, এখন হয়েছে চিনু। খাচ্ছি দাচ্ছি আড্ডা মারছি। গাছটায় এক ঘটি জল দেব তাও হাত ওঠে না. অথচ দু'টো ফুল ফুটলে অমনি তুলে চুলে গোঁজা চাই। ওই বেশ-বাস সাজন-গোজন, বিনুনি বাঁধা আর চোখে কাজল নিয়েই থাক। তাতেই দিন কাটবে।'

বকুনি খেয়ে আরতি নীচে ছুটল কলতলা থেকে জল বয়ে আনতে। আর যেতে যেতে মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ কত সাজগোজই করি। পুরনো ছেঁড়া শাড়ি, সস্তা কাপড়ের ব্লাউজ এই তো পরি। তাতেই এত কথা।

রত্নময়ী কতকগুলো খুচরো কাজ সারতে সারতে সব দেখলেন, শুনলেন। তারপর আরতি যখন বেলফুলগাছের গোড়ায় জল দিচ্ছে—শুকনো মাটিতে জল পড়ায় বেশ একটা সোঁদা গন্ধ উঠেছে জায়গাটায়—রত্নময়ী সুধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নরম গলায় বললেন, 'হাঁরে, সুচারু আজ এলে যদি কাল তাকে আসতে বলি।'

'বলো। সময় পেলে, ইচ্ছে হলে আসবে। উনিই জানেন সেটা।'

রত্নময়ী ফ্যাসাদে পড়লেন। আজ যার আসার ঠিক নেই, কাল যার সময় হবে কিনা জানা নেই, তার জন্যে কি ব্যবস্থা করবেন তিনি।

মনে মনে কি ভেবে আরতিকে বললেন, 'সন্ধে হয়ে গেছে, আমি গা ধুয়ে সন্ধে দিতে যাচ্ছি। বাসু এলে ওকে খেতে দিবি। আর বলবি মুখে গুঁজেই না চলে যায়। দরকার আছে।'

রত্নময়ী নীচে নেমে গেলেন। সুধা দালানে তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। আরতি এদিক ওদিক করতে লাগল।

রত্নময়ীর গা-ধুয়ে ওপরে আসতে খুব বেশি দেরি হল না। আবার রাত্রে সব সেরে হেঁশেল বন্ধ করে আর একবার তো গা-ধোয়ার থাকে—কাজেই বেশি জল ঘাঁটতে এ বয়সে আর সাহস হয় না।

রত্নময়ীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাসু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল। দালানে টাঙানো তারের ওপর ভিজে থান ঝুলিয়ে দিতে দিতে রত্নময়ী ছেলেকে বললেন, 'চা খাবার খেয়েই পালিও না। কাজ আছে।'

গায়ের জামাটা টান মেরে খুলে তারের ওপর ছুঁড়ে দিল বাসু। গেঞ্জি খুলতে খুলতে বললে, 'কাজ ফাজ এখন আমি পারব না। আমায় এক্ষুনি বেরুতে হবে। এই আরতি, গামছাটা দে।'

আরতি গামছাটা দিতে না দিতেই বাসু এক রকম লাফাতে লাফাতেই নীচে নেমে গেল। পরক্ষণেই ওর হুড়হুড় করে জল ঢালার শব্দ নীচে ছড়িয়ে পড়ল।

রত্নময়ী দালানের এক কোণে—বেলগাছের পাশে ভাঙা টবে বসানো তুলসী গাছের গোড়ায় প্রদীপ রেখে প্রণাম সারলেন। প্রদীপটা উঠিয়ে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আরতি রান্নাঘর খুলে বাসুর জন্যে ঢেলে-রাখা চা আবার গরম করতে বসল। বাসু স্নান শেষ করে শিস দিতে দিতে ওপরে উঠে আসছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে এইসব দেখতে এবং শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন মনে হল, এই সংসারের ভিড়ের সঙ্গে তার কোন

সম্পর্ক নেই। ওরা যে যার মত চলেছে, সুধা সুধার মত। আলাদা স্রোত।

সুধা ভাবল, ও যদি এদের কেউ না হত, কোন সম্পর্কই না থাকত কারুর সঙ্গে। তা হলে—! তৃতীয় ব্যক্তির চোখ নিয়ে এই সংসারের দিকে তাকালে সুধার বিশ্রীই লাগে। মনে হয় না, এরা মানুষ, সুখ শান্তি কোথাও আছে এখানে।

ভাবতে ভাবতে সুধা এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে রত্নময়ীর ডাকে সাড়া দিল না। কাছে এসে আবার ডাকতে সুধার চমক ভাঙল।

'একটু মাংসই আনতে দি, কি বল্?' রত্নময়ী বলছিলেন।

সুধা প্রথমটা খেয়াল করতে পারল না রত্নময়ী কি বলছেন—কেন বলছেন। পর মুহূর্তেই সব বুঝতে পারল। বললে, 'দাও।'

'সামান্য দই মিষ্টিও আনতে দি?'

'যা দেবার তুমি দাও না, আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন।'

বাসুকে ডাকলেন রত্নময়ী। চায়ের পেয়ালা হাতে বাসু উঠে এল।

'একবার বাজার যা—' রত্নময়ী ছেলেকে বাজারের ফর্দ শোনাতে লাগলেন।

আগাগোড়া ফর্দ শোনার ধৈর্য থাকল না বাসুর। ভীষণ বিরক্ত হয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'এই তোমাদের এক আব্দার। যখন তখন বাজার যা, বাজার যা; ধাপধাড়া গোবিন্দপুর—কোথায় সেই বেলেঘাটা সেখান থেকে অর্ধেক হেঁটে অর্ধেক ঝড়ঝড়ে বাসে কাহিল হয়ে ফিরলুম—আর সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম। আমি পারব না। আমার দরকারী কাজ আছে।'

'পারবি না আবার কি, পারতে হবে।' রত্নময়ী ছেলেকে ধমকে উঠলেন, 'নিজের তোর এত কি কাজ যে বাড়ির দু'টো কুটো নাড়তে বললেই তেরিয়া হয়ে উঠিস?'

'কুটো বৈকি।' বাসু তিক্ত স্বরে বলছিল, 'যতক্ষণ বাড়িতে থাকি

ততক্ষণই তো তোমাদের ফরমাশ। বিনিমাইনের সার্ভেণ্ট পেয়েছ,—খাটিয়ে নিচ্ছ। আর তেমনি চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে তোমাদের সুচারু।' বাসু সুধার দিকে একপলক চেয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'সেই দশটা বাজতে না বাজতে ঠেঙিয়ে বেলেঘাটার চিংড়ি-গুদোমের মতন ঘরটায় গিয়ে ঢোক—তারপর পাঁচটা ছ'টা পর্যন্ত যত শিশি বোতল খড় ভুসির কারবার। এই কাঠফাটা রোদ্দুরে শালারা আমাকে দিয়ে সেদিন পর্যন্ত সেরেফ শিশি বোতল ধুইয়েছে। কেমিকেল ফ্যাক্টারী না হাতী। তাও যদি মাইনে দিত। একমাস আমার হয়ে গেছে—এখনও মাইনে দিচ্ছে না কেন?' বাসু কথাটা শেষ করল সুধার দিকে তাকিয়ে। যেন সুধার কাছে কৈফিয়ত তলব করছে।

'সত্যি!' রত্নময়ী বললেন, 'ওকে মাইনে দিচ্ছে না কেন, সুচারুকে জিজ্ঞেস করিস তো, সুধা।'

ভায়ের কথাগুলো শুনতে শুনতেই সুধার গায়ে জ্বালা ধরেছিল, মার কথায় যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। বললে, 'দরকার থাকে তুমি করো, আমি পারব না! তোমার ছেলের যদি না পোষায় ওখানে, ছেড়ে দিতে পারে, কেউ পায়ে ধরে সেধে ওকে থাকতে বলছে না।'

সুধার এই সাফসুফ মেজাজী জবাবে রত্নময়ী খুশী হতে পারলেন না। বরং বিরক্ত হলেন। বেশ বিরক্তই। রাগ করে বললেন, 'তা মাইনে পত্তর না দিলে ঘরের খেয়ে ও মোষ চরাতে যাবে কেন! এও তো অন্যায়।'

সুধা কোন জবাব না দিয়ে সোজা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

বাসু ঠোঁট উল্টে মাথা ঝাঁকিয়ে দিদির চলে যাওয়া মূর্তিটাকে ব্যঙ্গ করতে চাইল। 'কী মেজাজ করেছে একখানা তোমার মেয়ে।'

'হবে না, খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে দু'বেলা।' রত্নময়ী চাপা অভিমানে মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। 'যাক্‌গে, বাজারটা তুই করে দিয়ে যা। আর আমায় জ্বালাস না তোরা।'

বাসু আর আপত্তি করল না। প্রথমবার আপত্তি করেই মনে মনে হাত কামড়াচ্ছিল। বাজার যাওয়া মানেই দু' চার আনা রোজগার। পকেটে একটাও পয়সা নেই আজ। ক'দিন থেকেই মাইনে পাবে পাবে ভাবছে! গলির মোড়ের পানওয়ালার কাছে টাকা চারেক ধার জমে গেছে। বেটা তাগাদা দিচ্ছে রোজ। ধার আর দিতে চাইছে না। আজকে সারাটা দিন বাসু একটা সিগারেট খেতে পায় নি। চার-পাঁচটা বিড়িতে কাটিয়ে দিয়েছে।

'কই টাকা দাও তাড়াতাড়ি।' বাসু হাত বাড়াল।

টাকা আনতে রত্নময়ী ঘরে গেলেন।

সুধা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে হাতের আড়ালে মুখ চোখ ঢেকে শুয়েছিল।

হাত বাক্স থেকে টাকা বের করতে করতে রত্নময়ী মেয়ের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন।

তাঁর মনে হল, সুধার পিঠ আর কাঁধের কাছটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা লুকোন ঢেউ যেন ক্রমাগত সেখানে দুলে দুলে উঠছে। রত্নময়ী প্রায় নিঃশব্দে ক'টা টাকা মুঠোয় নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

উনিশ

সুচারু এল। সন্ধে প্রায় শেষ করেই। গলির মোড়েই বাসুর সঙ্গে দেখা। বাসু বাজার সেরে ফিরছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসতেই রত্নময়ীর মুখোমুখি। সুচারু হেসে বললে, 'গন্ধে গন্ধে ঠিক হাজির হয়েছি মাসীমা। আজ না এলে খাওয়াটা ফস্‌কে যেত।'

'তোমার যেমন কাণ্ড, ফস্‌কে গেলেই ভাল হত। আসবে না-আসবে একটা কিছু তো ঠিক করে বলতে হয়।'

'কেন, আমি তো বলেছিলাম—'

'কই, সুধা তো তা বললে না; বললে আসতে পার, না-ও পার।'

'তাই নাকি—।' সুচারু হাসল। মাথা নেড়ে হতাশ হয়েছে গোছের একটা ভঙ্গি আর শব্দ করল জিবের, 'আপনার মেয়ের মাথা এত পরিষ্কার কে জানত। একটা 'যদি' ছিল অবশ্য। কাজে কর্মে আটকে পড়ে যদি না পারি তাই।'

সুচারুর বলার ভঙ্গিতে রত্নময়ীও হেসে ফেললেন।

বাসু বাজারটা রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে রেখে আরতিকে কি যেন বলছিল। আরতি মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর সুচারুর সামনে এসে দাঁড়াল।

পকেট থেকে এক ঠোঙা টফি বের করে সুচারু আরতির হাতে দিল। ওর বিনুনিটা আদর করে টেনে দিয়ে হেসে বললে, 'এই মেয়েটার একটা টফি লজেন্স কারখানার দারোয়ানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে, মাসীমা। ওর তা'হলে খুব সুবিধে হবে।'

'ধ্যাৎ—!' আরতি অল্প একটু ভুরু কুঁচকে এমন একটা কটাক্ষ করল যা সুচারুর নজরে পড়ল হঠাৎই। আরতির মুখের বয়সে এ-কটাক্ষ দৃষ্টিকটু। গ্রাহ্য করল না সুচারু।

'ধ্যাৎ কেন—, দারোয়ান বুঝি পছন্দ হল না' সুচারু হাসতে হাসতে বললে, 'চুরির ভাগ বসাতে এমন পটু আর কেউ হয় না।'

রত্নময়ী হেসে বললেন, 'তা মানাবে ভাল।'

আরতি ভ্রুকটি করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

রত্নময়ী বললেন সুচারুকে, 'শেষ পর্যন্ত সেই যুদ্ধেই চললে?'

সুচারু হাসিহাসি মুখে মাথা নাড়ল।

'তোমার ভাই আর পিসির কি ব্যবস্থা করলে?' একটু ভেবে রত্নময়ী শুধোলেন।

'ভাইয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে। উপস্থিত একটা স্কুল-মাস্টারী পাওয়া যাচ্ছে কাশীতে। পিসিমা আর ও সেখানেই থাকবে।'

বাসু ঘর থেকে আর এক দফা চুল আঁচড়ে, মুখ মুছে দালান দিয়ে যেতে যেতে রত্নময়ীদের সামনে এসে দাঁড়াল। আরতির হাতের ঠোঙাটার দিকে এক নজর চেয়ে খপ্ করে ঠোঙাটা কেড়ে নিল। নিয়েই একমুঠো তুলে পকেটে ফেলল। ক'টা মুখে পুরল। হাত বাড়িয়ে আবার ফেরত দিল আরতিকে। আরতি বোকার মতন দাঁড়িয়ে।

দাঁতের গোড়ায় লজেন্স ভাঙতে ভাঙতে বাসু রত্নময়ীকে বললে, 'কথাটা ওঁকে বলেছ, মা?'

সুচারু আরতির হাস্যকর অবস্থাটা হাসিমুখে দেখছিল। বাসুর কথায় রত্নময়ীর দিকে তাকাল। আর আচমকা বাসুর এই কথায় রত্নময়ী লজ্জিত হয়ে পড়লেন। ছেলের এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যে মনে মনে চটলেনও। ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও তো এখন।'

বাসু তবু দাঁড়িয়ে থাকল!

'কি মাসীমা?' সুচারু জানতে চাইল।

'তেমন কিছু নয়; ও পরে শুনোখন।'

'ওরা আমার মাইনে দিচ্ছে না।' বাসু কোন কিছু গ্রাহ্য না করে বলল। স্পষ্ট অভিযোগ তার গলায়।

রত্নময়ীর অপ্রস্তুতের একশেষ। সুচারুর দিকে তাকিয়ে থাকতে পর্যন্ত পারলেন না।

সুচারু বললে, 'মধুব সঙ্গে কালই দেখা হবে। এক পাড়াতেই থাকি আমরা। আমি সকালেই ওর বাড়ি যাব দেখা করতে, তখন বলব।' একটু থেমে রত্নময়ীর দিকে তাকিয়ে আবার বললে, 'মধুর কোন দোষ নেই, দোষ আমার। আমায় ক'দিন আগেও জিজ্ঞেস করছিল, কত মাইনে দেওয়া যায়। আমি বলেছিলাম, সে তোমার যা ইচ্ছে। ও আসলে আমার মুখ থেকে শুনতে চায়।'

'না না—তোমায় কিছু বলতে হবে না,' রত্নময়ী অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে তাড়াতাড়ি বললেন, 'তুমি কেন বলবে! ওদের যা ইচ্ছে, বুঝেসুঝে দেবে।'

'তুমি এখন কি কাজ কর?' সুচারু বাসুকে প্রশ্ন করল!

'কি আবার করব, কুলির কাজ। অ্যাসিডের, না হয় ফিনাইলের বোতল প্যাক করি, গাড়িতে উঠোই।' বাসুর গলায় তাচ্ছিল্য আর ক্ষোভ। 'আমায় যদি ছোটলোকের কাজ করতে হয়, বেশিদিন ও-সব পোষাবে না আমার।'

'ভালই তো, ভদ্রলোকের মতন একটা কাজ জোগাড় করে ছোটলোকের কাজটা ছেড়ে দিও, ভাই।' সুচারুর কথা আর বলার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে ও। একটু থেমে আবার বললে, 'সব কাজই আস্তে আস্তে রয়ে সয়ে শিখতে হয়। তুমি যা জান না, পারবে না—তেমন কাজ তোমায় দিতে তারা ভরসা পাবে কেন!'

'তা বলে আমি সারাদিন শুধু খড় দিয়ে দিয়ে বোতল সাজিয়ে রাখব?' বাসুও চটেছে।

'এর চেয়ে কঠিন কিছু কাজ দিতে ওরা সাহস করছে না।'

'কতই না আছে সব কাজ করেনেবালা!' বাসু ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল, 'আর ক'দিন দেখব! যদি কুলিগিরি থেকে না সরায়—ছেড়ে দেব। ও-সব আমার পোষাবে না মশাই। সাফ্ কথা।'

কথা শেষ করে, সুচারুকে যেন কড়া এবং স্পষ্ট জবাব শুনিয়ে দিয়েছে এমন একটা ভঙ্গি করে মেজাজের মাথায় বাসু চলে গেল। সিঁড়িতে তার সেই দ্রুত, অনেকটা লাফিয়ে নামার শব্দটা শোনা গেল। তারপর মিলিয়ে গেল।

রত্নময়ী লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারছিলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে।

সুচারুর না বোঝার কিছু ছিল না। ব্যাপারটাকে সহজ, স্বাভাবিক করার জন্যে হেসে বললে, 'কই আরতি, চা কই? চা-টা দাও এক কাপ্।'

'না বলা পর্যন্ত ওদের দিয়ে কি কোন কাজ হবে, সুচারু। ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে আছে। যা চায়ের জল বসিয়ে—বাজারটা নিয়ে বোস। যাচ্ছি আমি।'

আরতি চলে গেলে রত্নময়ী অপ্রতিভ গলায় বললেন, 'ছেলেটা বড় বাঁদর, সুচারু; কোন জ্ঞান-গম্যি নেই। ওর জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। সুধা তো আমার ওপর নিত্যি রাগ করে ওর জন্যে। আমি কি করি বল!'

'আপনিও যেমন, মাসীমা—'সুচারু সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করার চেষ্টা করল, হালকা গলায় বললে, 'হয়েছে কি তাতে! ও-রকম অনেক ছেলেই হয়; সাদাসিধে ভাব, যা মুখে এল বললে, ফুরিয়ে গেল। আমার ভালই লাগে। একটু বয়স হোক, নিজে থেকেই শুধরে যাবে।'

'আর শুধরেছে—' রত্নময়ী ছোট্ট করে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। 'তা এসে পর্যন্ত তো দাঁড়িয়ে রয়েছ। ঘরে গিয়ে বস। হাত মুখ ধোবে নাকি?'

'না, এখন কিছু নয়। পাতে বসবার আগে হাতটা একবার ধুয়ে নিলেই চলবে।' সুচারু হাসল।

'দেখছ তো এখন সবে যাচ্ছি রান্নাঘরে, যেমন কাণ্ড তোমাদের, খেতে বসতে রাত হবে।'

'হোক্ না, আমার আর কি! একা মানুষ। যাব তো শ্যামবাজার। রিক্শা আছে, পা আছে।'

'ঘরে গিয়ে বস তুমি। সুধাকে ডেকে দি।'

'কোথায় গেছে ও? দেখতে পাচ্ছি না।'

'যাবে কোথায়, ঘরে। শুয়ে রয়েছে।' রত্নময়ী যেতে যেতে বললেন।

সুচারু বাসুর ঘরে এল। হাতলভাঙা চেয়ারটা জানলার কাছে টেনে নিয়ে বসল।

সুধা আসছে না দেখে সুচারু সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ ঘরের ছাদ দেওয়াল, ছেঁড়া ক্যালেণ্ডার দেখল। জানলার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটাল। অনেকবার এই ঘরে এসে বসেছে সুচারু। নতুন করে কিছু দেখার নেই। তবু এই ঘরটায় এসে বসলে সুচারুর কেমন অদ্ভুত লাগে। সুধাদের সংসারের বিশৃঙ্খলতা আর দীনতা এই ঘরে বসেই যেন সবটুকু জানা যায়, মানুষগুলোকে জানার দরকার হয় না।

সুচারু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। সুধা আসছে না। এখনো কি শুয়ে রয়েছে। এই শোয়ার অর্থ কিছু কিছু তার না বোঝার নয়। সুচারুও কাল সারারাত ঘুমোয় নি। ঘুমোতে পারে নি। ভেবেছে, সুধার কথাই ভেবেছে।

এখন আর এ-সব কথা সুচারু ভাবতে চায় না। পা বাড়িয়ে দিয়ে কে পিছু টানল তার চোখের জলের মাপ কষার কোন মানে হয় না। তাতে কোন লাভ নেই, বরং লোকশান। দুর্বলতা আরও বাড়ানো ছাড়া কিছু নয়, আরও মন খারাপ করা, নিজেকে টুকরো টুকরো করে ভাঙা।

সুচারু আজকে এই সামান্য অন্যমনস্কতাটুকুও সহ্য করতে রাজি নয়। হাতের পত্রিকাটার পাতা ওলটাতে লাগল সুচারু। ইংরিজী মাসিক। মাঝে মাঝে হাতে আসে। আজ চৌরঙ্গী দিয়ে আসবার সময় দেখতে পেয়ে কিনেছে। মলাট ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কিছু দেখার ফুরসত হয় নি।

পত্রিকাটা যুদ্ধের খবরাখবরেই ভর্তি। আকিয়াব আর চট্টগ্রামে জাপানীদের বোমা ফেলা থেকে গ্যাস-যুদ্ধ চালানোর জন্যে চার্চিলের শাসানি, স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম চালুর খবর থেকে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বীরত্ব।

যুদ্ধের গতিটা বদলাতে শুরু করেছে কিছুদিন থেকে : সুচারু ভাবছিল 'হোম অ্যাণ্ড অ্যব্রডের' পাতা উল্টোতে উল্টোতে। জার্মানীর অবস্থাও আর ততটা ভাল নয়, লিবিয়ায় রোমেল এবার মুশকিলে পড়েছে।

চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে সুচারু থমকে গেল। ক্রীপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার ওপর এক প্রবন্ধ। খানিকটা পড়ল সুচারু। বেশ লিখেছে। লোকটা বোধ হয় আমেরিকান। ক্রীপসের এক রেডিয়ো বক্তৃতায় নিজের দৌত্যের সাফাই গাওয়ায় বেজার হয়ে একহাত নিয়ে নিয়েছে ভদ্রলোক।

সুচারু পাতা উল্টে গেল। এ-দেশের অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ এক চিঠি। "হরিজনের" পাতা থেকে গান্ধীর কথা তুলে তুলে সাংঘাতিক এক আশংকার আভাস দেওয়া হয়েছে। ডার্ক প্রসপেক্ট। বৃটিশ আর বিদেশী সৈন্যেরা চলে গেলে কি অবস্থা হবে এ-দেশের তার ঘনঘোর রূপ বর্ণনা। মিস্টার গান্ধী এই সাংঘাতিক ভবিষ্যৎটা কল্পনা করতে পারছেন না। নেহরু যা পারছেন। রাজাগোপালাচারীও। ঘোলা জল আরও ঘোলা করে তুলছেন গান্ধী তাঁর কথাবার্তায়।

প্রবন্ধটা আগাগোড়া পড়ল না সুচারু। পড়ার কিছু নেই। সুচারুরও মনে হয়, খুব খারাপ দিন আসছে। ক্রীপস্ ফিরে যাবার পর এখানের

আকাশ খুব তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসছে। কিছু একটা হবেই। আবহাওয়া তেমনি। ভীষণ থমথমে।

স্থধা এল, হাতে চায়ের কাপ। খানিকটা ছায়া পড়ল পায়ের ওপর। হাতের কাগজটা মুড়ে স্থচারু তাকাল।

'কি ব্যাপার, ঘুমোচ্ছিলে নাকি ?' স্থচারু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল ; স্থধার মুখ চোখ ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকল।

মাথা নাড়ল স্থধা। না, ঘুমোয় নি। মাথাটা বড্ড ধরেছিল, শুয়েছিল তাই। স্থধা যেন এখনো মাথা ধরার সেই কষ্ট অনুভব করতে পারছে এমন মুখ করে বললে।

'প্রায়ই দেখি তোমার মাথা ধরে। চোখ খারাপ হয়েছে বোধ হয়। ডাক্তার দেখাও।' স্থচারু চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ সহজ গলায় হাসি হাসি মুখে বললে।

স্থধা জবাব দিল না। দেবার মতন কিছু খুঁজে পেল না। টেবিলটার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

স্থচারু বললে, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো না। ছুটো গল্প করা যাক।'

স্থধা বসল না, স্থচারুর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললে, 'মা একা রান্না নিয়ে বসেছে—আমি একটু সামলে দিই গে যাই—।'

'বাঃ ! আর আমি একলা এখানে বোবা হয়ে বসে থাকব ?'

'কেন, বেশ তো পড়ছিলেন এতক্ষণ।'

'পড়িনি, পাতা ওল্টাচ্ছিলাম।'

একটু চুপ করে থেকে স্থধা বললে, 'তবে আরও খানিকক্ষণ পাতা ওল্টান, আমি আসছি।'

স্থধা চলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে না পাওয়া গেলেও স্থচারু বুঝতে পারল স্থধা রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

চা আস্তে আস্তে শেষ করল স্থচারু। সিগারেট ধরাল আর একটা। জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল।

সুচারু স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, সুধা আজ তাকে এড়িয়ে আড়ালে দূরে দূরে থাকতে চাইছে। কারণটা না বোঝার নয়। সুচারু নিজেকেও কি লুকোচ্ছে না! লুকোচ্ছে বই কি। বরং সুধার চেয়ে আরও সতর্ক হয়ে। আর এ-কথা দু'জনেই বুঝতে পারছে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই খুব খাপছাড়া এলোমেলো ঠেকছে। এর একরকম ভান, ওর অন্যরকম। যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত করুণ এক খেলা খেলে চলেছে দু'জনে।

সুচারু একবার ভাবল, সুধাকে যদি সরাসরি সে কয়েকটা কথা আজ, এখন বলে! তাতে অন্তত সুধা কি তাকে বোঝবার চেষ্টা করবে না, ভুল বুঝে থাকলে শুধরে নিতে পারবে না?

সুচারু সুধাকে বুঝিয়ে বলতে পারে, জীবনের পরিধিটা সে একটু বড় করতে চায়। এ তার সাধ স্বপ্ন আশা। কলকাতা শহর আর অফিস আর কেরানীগিরির চৌহদ্দির মধ্যে সে আটকে থাকতে রাজি নয়। তাতে তার মানবজীবনের আবাদ এমন কিছু উৎকৃষ্ট হবে না, এবং সোনাও ফলবে না। সুচারু তার সাধ্যমত-কিছু সুন্দর ফসল ফলাতে চায়। বাইরে বড় এবং বিচিত্র এক জগৎ ছড়ানো আছে। আর সুচারুর মনে অদ্ভুত এক তৃষ্ণা আছে। নিজের চোখে সুচারু দেখতে চায়—। কি দেখতে চায়—সে কথা কি সুধা বুঝতে পারবে? যদি সুচারু বলে, আমি কিছু ছবি আঁকব সুধা—এমন কিছু ছবি আঁকবার চেষ্টা করব—যা এ-দেশে আর কেউ আঁকে নি। যুদ্ধই হবে আমার সাবজেক্ট—এই যুদ্ধ। সুধা হয়ত এ-সব কথা বুঝতে পারবে না। সুচারু নিজেও স্পষ্ট করে বোঝে নি। শুধু এক আবেগ, তীব্র আবেগ আর আকর্ষণ বোধ করছে।

নিজের কথা এই, এর বেশি কিছু নয় সুচারুর। সুধার সম্পর্কেও ভেবে দেখেছে সুচারু, এবং একরকম নিঃসংশয় হয়েছে যে—সুধা তার এই সংসারের পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে। এ-থেকে তার মুক্তি নেই। নিজেকে নিঃশেষ

করে দেওয়া ছাড়া নেবার কিছু নেই সুধার। তার চিতা ধরানো হয়ে গেছে এই অভাব অনটন দাও-দাও সংসারের শ্মশানে। সুধাকে রোজগার করে টাকা আনতে হবে বাড়ি ভাড়া দিতে, চাল কিনতে, উনুন ধরাবার কয়লা যোগাড় করতে, পরনের কাপড় জোটাতে। এবং নিজেকে ভীষণ থেকে ভীষণতর বঞ্চনার কাছে মাথা নুইয়ে আক্রোশে অভিমানে ব্যর্থতায় পুড়ে পুড়ে মরতে হবে। এ-ছাড়া অন্য পথ নেই। লক্ষটা ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্য এখানে এক হয়ে আছে। তবু যদি জোর করে জীবনে নতুন কোন মোড় ঘোরাতে যায় সুধা, তার ফল ভাল হবে না। তার ভাঙা সংসার আরও ভাঙবে, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে যাবে। সুধা অতটা নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন হতে পারবে না। হওয়া উচিত হবে না।

সুচারুর হুঁশ ছিল না; সুধা কখন আবার ঘরে এসেছে জানতে পারেনি। কথায় চমক ভাঙল। সুধার দিকে চেয়ে থাকল অপলকে।

সুচারুর অন্যমনস্ক অথচ অস্বাভাবিক এই দৃষ্টি সুধার কেমন যেন লাগছিল। ভয় ভয় মতন করছিল। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিল।

ঘরের মধ্যে দুটি মানুষ অথচ মনে হয় না কেউ আছে, এত নিস্তব্ধতা। এই স্তব্ধতা দুঃসহ। সুধার সহ্য হচ্ছিল না। অস্বস্তি আরও বাড়ছিল, বুকের কাছটা যেন ঠাস বাতাসে ভরে আসছিল। একটা কথা, যে কোন রকম কথা শুরু হলে যেন বেঁচে যায় ও।

আরও একটু অপেক্ষা করে সুধা আচমকা বললে, 'আপনার জায়গায় কে বসবে?'

সুচারু একটু বোধ হয় চমকে উঠল। কথাটা বুঝতে তার খানিক সময় লাগল। জবাব দিল, 'জানি না। কেউ বসবে নিশ্চয়। আমার অভাবে কি অফিসের কাজ বন্ধ থাকবে!'

সুধা একটু চুপ করে থাকল। মনে মনে যেন ভাবল কে বসতে পারে। বললে, 'তা ঠিক! কে বসবে কে জানে! আমার তো ভয়ই করছে!' কে জানে সে ভদ্রলোক আবার কি রকম হবেন? ভাল লোক না হলেই মরেছি।'

'আমি কি ভাল ছিলাম নাকি?'

সুধা সুচারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হাসল, 'আগে হলে বলতুম না; এখন তো চলেই যাচ্ছেন—বলতে দোষ কি, তা মোটামুটি ভালই ছিলেন।'

'মোটামুটি!' সুচারু যেন ভীষণ হতাশ হয়েছে এমন ভঙ্গি করল! তারপর সুধার দিকে চেয়ে হেসেই বললে, 'তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ। ছুটিছাটা, কামাই, অফিস ফাঁকি মায় মাইনে অ্যাড্‌ভান্স,—এত করলাম, তবু মন পাওয়া গেল না। মোটামুটি ভাল হলাম।'

কথাটা পরিহাস ছাড়া আর কি! তবু সুচারু যেন এই পরিহাসের সঙ্গে কী অন্য একটা অর্থ যোগ করল। অন্তত সে যোগ না করলেও সুধা নিজে যোগ করে নিল। 'মন-পাওয়া' শব্দটা একটা কাঁটার মত গিয়ে বিঁধলো মনে।

মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল সুধাব। বুকের মধ্যে বাতাসটা আবার ঠাস হয়ে চেপে ধরল। কড়ি কাঠের অন্ধকারে একটা ছেঁড়া ফানুস দুলছিল। বাসু কবে যেন টাঙিয়েছিল। আজও আছে। ধুলোয় ময়লায় বিবর্ণ হয়ে। সেদিকে তাকিয়ে সুধা বুক-শূন্য করা নিশ্বাসটা আস্তে আস্তে চেপে রাখল। বুকটা তাতে আরও টনটন করে উঠল বৈ নয়।

সুধার মনে হল, বলে, কি পেলেন আর না-পেলেন তার হিসেব করে আর লাভ কি আপনার!

সুধাকে চুপচাপ অন্যমনস্ক দেখে সুচারুই বললে আবার, 'মাঝে সাঝে দু' একটা চিঠি পত্র লিখো তোমাদের খবরটবর দিয়ে।'

'চিঠি—?' সুধার অন্যমনস্ক স্বর, 'আপনি দেবেন। দিলে নিশ্চয় উত্তর পাবেন।'

আবার চুপচাপ। কিছুতেই কথা আর এগুচ্ছে না। যা-ই শুরু কর, দু'একটা খাপছাড়া জবাব, হ্যাঁ-না-র পর নিজের থেকেই থেমে যাচ্ছে। আশ্চর্য, কেন যে এমন হচ্ছে! অথচ কথা বলার কী ভীষণ ইচ্ছে দু'জনের।

সুচারু একটা সিগারেট শেষ করেছিল সম্ভ। আবার একটা ধরাল। সুধা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

'আপনারা ছুটি পাবেন না?' সুধা কি ভেবে আচমকা বললে।

'না-পাব কেন?'

'কি করবেন ছুটি নিয়ে—? কলকাতায় আসবেন না?'

'ঠিক কি, আসতে পারি।'

'এলে দেখা হবে।' সুধা বিষণ্ণতা কাটিয়ে হাসতে চাইল।

'তা কি বলা যায়!' সুচারু পরিহাস করে বললে, 'আজ আর কালকের মধ্যে অনেক তফাত। হয়ত তখন তোমরা এ-বাড়িতে থাকবে না, ততদিনে তোমার বিয়ে-থাও হয়ে যেতে পারে।'

সুধার মনে হল, সুচারু যেন তাকে আর একটা কাঁটা দিয়ে বিঁধল। ইচ্ছে করেই। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল সুধার। সারাটা বুক কনকন করে উঠল। তবু ফিকে হাসি ঠোঁটে এনে সুধা জবাব দিল, 'অনেক কিছুই হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তার ক'টা আর সত্যি সত্যি মানুষের জীবনে হয়।'

সুচারু বুঝতে পেরেছিল তার পরিহাসটা এখন এই অবস্থায় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মনে মনে অনুতপ্ত হলো সুচারু। আবহাওয়াটা লঘু করার জন্যে বললে, 'কেন হবে না! কে বলতে পারে কাল তুমি ভাল মাইনের একটা চাকরি পাবে না। বাসুও হয়তো কোথাও মন্দের ভাল কিছু জুটিয়ে নেবে। তখন তো তোমাদের বালিগঞ্জে থাকার কথা। হেসে হেসে কথাগুলো বলতে গিয়ে সুচারু নিজেই থেমে গেল। নিজের কানেই কথাগুলো অসার, অর্থহীন, ভেজাল মনে হচ্ছিল।

'নিজের দিয়ে অন্তকে দেখছেন।' সুধা খুব আড়াল করে একটা খোঁচা দিল, 'আমাদের আজ যা কালও তাই। এ-কপাল বদলাবার নয়। বরং কপাল ফিরবে আপনার, ফেরাতেই তো যাচ্ছেন। ফিরে আসবেন যখন তখন অনেক বড় হয়ে যাবেন। আমরা নাগাল পাব না।'

'মন্দ বল নি'। সুচারু সুধার দিকে কৌতুকভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে হাসল, 'তোমারও ধারণা আমি কপাল ফেরাতে যুদ্ধে যাচ্ছি।'

'তা ছাড়া কি, উন্নতির জন্তেই তো যাচ্ছেন।' বলতে বলতে অমলাদির কথা মনে পড়ল সুধার।

'যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কে যে লাটবেলাট হয়েছে জানি না। শুনি ; বলে অনেকেই। যুদ্ধে যাওয়া মানে যেন সোনাব খনি থেকে তাল তাল সোনা কুড়িয়ে আনতে যাওয়া! কী যে সব ধারণা মানুষের—!'

'তবে আপনি যাচ্ছেন কেন—?' সত্যি কথাটা সুচারু অস্বীকার করছে দেখে একটু অসহিষ্ণু হয়ে তর্কের সুরে সুধা প্রশ্ন করলে।

সুচারু চট্ করে জবাব দিতে পারল না।- মনে হল, কিছু যেন ভাবছে। কথা গুছোবার চেষ্টা করছে। খানিকটা চুপচাপ থেকে সুচারু বললে, 'কেন যাচ্ছি বললে তুমি কি বিশ্বাস করতে পারবে, বুঝতে পারবে?' একটু থামল, সুধার চোখে তার হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখ রেখে বলল আবার, 'আমি কিছু নতুন জিনিস দেখতে চাই, সহজে যা দেখা যায় না। কতদিন ধরে ভাবছি, যে-ভীষণ সময়ের মধ্যে আমরা বেঁচে আছি—এর কিছু ছবি আঁকব। কি আঁকব বুঝতে পারছিলামনা, ধরতে পারছিলাম না। এই যুদ্ধ শুরু হল। কেন জানি না আমার মন সেখানে টানছে। মনে হচ্ছে আমি আঁকবার মতন কিছু পাব।

সুধার ঠোঁটে কথা ফুটল না। চোখের তারা নড়ল না। পাতা পড়ল না এক পলকের জন্তেও। ভীষণ অবাক হয়েছিল সুধা। বুঝতেই পারল না ভাল করে সুচারু কি বললে।

সুচারু অপেক্ষা করে বললে, 'বোধ হয় ঠিক ধরতে পারলে না আমার কথাটা। এ-সব আবার বোঝানও মুশকিল। নিজেও খুব পরিষ্কার করে যে বুঝি তাও নয়—কিন্তু মনে মনে কী ভীষণ যে একটা ইচ্ছে—' সুচারু কথা খুঁজে পাচ্ছিল না, তার আকুলতার ভাবটা মুখে ফুটে উঠল, বললে আবার, 'ঠিক যাকে প্যাশান বলে না, তাই। আই ফিল্ এ প্যাশান। যুদ্ধ আমায় দেখতে হবে।'

অবাক যতই হোক্—এই অদ্ভুত কথার কোন অর্থ বুঝতে পারছিল না বলে একটা কৌতূহল অনুভব করছিল সুধা। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই পাগলামি মনে হচ্ছিল। বললে, 'যুদ্ধ তো মারামারি কাটাকাটির জায়গা, সেখানে ছবি আঁকার কি আছে?'

'চোখ দিয়ে দেখতে পারলে—অনেক আছে।' সুচারু জবাব দিল, 'এখানে আমার চোখ খুললো না। এই শহর আর শহুরে মানুষ, কেরানীর দল, কলকারখানার ধোঁয়া-ধুলো অনেক দেখলাম। শখ করে কতবার গ্রামে গিয়েছি। ক্ষেত ক্ষামার, পুকুর, বাঁশঝোপও দেখেছি। এর মধ্যে আমার মন ডোবেনি। নতুন কিছু খুঁজে পেলাম না। ভালই লাগল না আমার।'

'সকলেই তো এই সব নিয়ে কত সুন্দর ছবি আঁকে।' সুধা ভাসা ভাসা একটা ধারণা থেকে বললে।

'তা আঁকে। তারা পারে, আমি পারি না।' বিষণ্ণ কিন্তু বড় সুন্দর এক হাসির ছোঁয়া লাগল সুচারুর মুখে। বললে, 'আসলে কি জান, আমার ধারণা—এই শহর গ্রাম আকাশ চাঁদ ফুল এই সব সাধারণ বিষয়ের বাইরেও অন্য বিষয় আছে, মখমল মোড়া জগৎ ছাড়াও আর এক জগৎ আছে। খুব রুক্ষ, কঠিন, নির্দয় জগৎ। যুদ্ধ তেমনি এক জগৎ; রিয়্যালিটিকে সেখানে খুব স্পষ্ট করে চেনা যায়।'

সুধা অন্যমনস্ক গলায় হঠাৎ বললে, 'এই মারামারি কাটাকাটি, মরা ধরা আপনি ভালবাসেন? এর ছবি আঁকতে চান?'

'না।' সুচারু মাথা নাড়ল, 'মারামারি কাটাকাটি আমি ভালবাসি না। যুদ্ধ আমি চাই না। কিন্তু আমার তোমার চাওয়া না-চাওয়ায় কি যুদ্ধ আটকে থাকছে।' একটু থামল সুচারু। মনে হচ্ছিল ওর মন কোথাও আটকে গেছে, বলল, 'আমি মৃত্যুর ছবি আঁকতে যাচ্ছি না সুধা, জীবনের ছবিই আঁকব। মৃত্যু, নিষ্ঠুরতা—এ-সব নিয়ে শখ করা আমার পোষায় না। কখনো কখনো মৃত্যু মহৎ হয়—কিন্তু সে কখনো কখনোই, তেমন তেমন ক্ষেত্রে—এই দল বেঁধে নিরুপায় হয়ে অসহায়ের মত মরায় সে মহত্ত্ব কিছু নেই।' সুচারু আবার থামল। খানিক চুপ করে থেকে আবার, 'আরও কথা কি জান, ঘরদোর ক্ষেতক্ষামার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দুধের শিশু, বাড়ির মেয়ে-বউ মাঠঘাট ভেঙে তাড়াখাওয়া গরু-ছাগলের মত ঘরবাড়ি ফেলে পালাচ্ছে, মরছে—এই সব মর্মান্তিক বীভৎস দৃশ্যই যদি যুদ্ধের একমাত্র দৃশ্য হত আমার সেখানে যাবার দরকার ছিল না। আমার মনে হয় এ বাদেও আরও কিছু আছে। সেটা যে কি তা আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে আমাদের অসহায় অস্তিত্বের পাশাপাশি আমাদের সত্তাই একমাত্র সহায়। এই চেহারার তলায় আমাদের আর এক রূপ আছে, এই মনের ভেতরে আর এক মন। বোধ হয় সেটাই আমাদের সত্তা। কখনো সখনো সেই মন আমাদের গভীর কথা বলতে পারে—আমরা যা চাই, যা ভালবাসি, যাতে সুখী হই তার কথা। যুদ্ধের বীভৎসতা, রিক্ততা আর নিঃস্বতার মধ্যে কোথাও নিশ্চয় জীবনের সেই ছবি আছে। কদাচিৎ হয়ত তা ফুটে ওঠে। কিন্তু আমার কাছে তার অশেষ মূল্য।' সুচারু নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে কথা শেষ করল। খানিক চুপ করে থেকে আবার বললে, 'একটা কবিতা পড়েছিলাম—এক সৈনিক জঙ্গলের মধ্যে তার শত্রুকে নাগালে পেয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল। মারার পর তার জামার পকেট হাতড়াচ্ছিল—যদি কিছু পকেটে পোরার মত পাওয়া যায় ভেবে। হাতড়ে পাওয়া গেল, ক'টা আধ পোড়া সিগারেট, একটা ছুরি আর চেনে ঝুলানো

লকেট করে বাঁধানো একটা ছবি। ছোট্ট ছেলের ছবি, হাসিখুশী মুখ। ছবিটা এর ছেলের—যে মরল। আর যে মারল সেই সোলজারটা অনেকক্ষণ বাচ্চার ছবিটি দেখে দেখে শেষে কি বললে জান? বললে—***Oh son! my son will share yonr fate and all our sons!***' সুচারু থামল। আর যেন কথা জুগিয়ে উঠতে পারছিল না। মুখটা থমথম করছে—; বিষণ্ণ, গম্ভীর।

সুধা বিমূঢ়ের মত বসে। সুচারুর কথা সে ভাল বুঝল না। খানিকটা তবু কি যেন ধরতে পারল। খুব সম্ভব সুচারুর এই অদ্ভুত .আবেগ আর বেদনার সুর সুধার মনে অস্পষ্ট এক সমবেদনার সঞ্চার করেছিল।

সুধার দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে এবার সুচারু আপনার মনে বললে, 'আমায় একটা মিল খুঁজে বের করতে হবে, এই অমিলের মধ্যে।' একটু থেমে ভাবালু স্বরে বিড়বিড় করল : ***Wnen much blood had clogged their chariot-wheels I would go up and wash them from sweet wells...***।'

বাইরে ঝড়ো হাওয়া উঠেছিল। দালানে ঝাপ্টা বয়ে যাওয়ার শব্দ উঠল। একটা ব্লাউজ না কী যেন দরজার কাছে উড়ে এসে পড়ল। দালানে আরতি কাপড় চোপড় তুলে রাখতে শুরু করেছিল। তার কথা—হুটোপাটি কানে যাচ্ছিল।

সুধা উঠল। জানলার দিকে একবার, আর-একবার বাইরে দালানের দিকে তাকাল। 'বৃষ্টি এল নাকি?'

সুচারুও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। অন্ধকার, অন্য বাড়ির আড়াল দেওয়া কালো যবনিকা। কান পেতেও বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল না সুচারু।

সুধা ততক্ষণে চৌকাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মনে হল, অনেক—অনেকক্ষণ সে এই ঘরে সুচারুর মুখোমুখি বসেছিল। অথচ

অত সময় যেন পলকে ফুরিয়ে গেল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাকেও দেখা যাচ্ছে। সুধা দেখল। মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। সুধার হঠাৎ কেমন যেন লাগল।

বৃষ্টি তখনই এল না। কিন্তু আকাশ কালো হল। মেঘে ভরে উঠছিল। তারা ঢাকা পড়ছিল।

রত্নময়ী তাড়াতাড়ি করলেন। বাসুও ফিরে এসেছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে দশটা বেজে গেল।

হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশ জোড়া মেঘ। বৃষ্টি আসি আসি করছে। সুচারু আর দেরি করতে ভরসা পেল না। রত্নময়ীকে প্রণাম করল, বাসুর কাঁধে হাত রেখে দুটো ভাল কথা বললে, আরাতর মাথা নেড়ে দিল আদর করে - একটু হাসি ঠাট্টা।

'এবার তা হলে চলি, মাসীমা।' সুচারু ঘরের বাইরে পা বাড়াবার জন্যে তৈরী হল।

'এস বাবা।' ম্লান মৃদু স্বরে বিদায় দিলেন রত্নময়ী, 'সময় সুবিধে করে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ো।'

'দেবো।' সুচারু একটু হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল। 'কই চল সুধা, আমায় এগিয়ে সদরটা বন্ধ করে দিয়ে আসবে চল।'

দালান পর্যন্ত রত্নময়ী এলেন। আরতিও। সিঁড়ি দিয়ে সুচারু আগে আগে নেমে চলল। পেছনে সুধা।

বাসু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। আর হাসল মনে মনে। যেন এ-সবই তার জানা জিনিস। তার জীবনেও এমনি হয়েছে। আকাশের অনেক উঁচুতে ঘুড়ি উঠে গেলে এমনি করেই পট্ করে কেটে যায়। যাবেই। কেউ রুখতে পারবে না।

সিঁড়ি নেমে—একতলার টানা বারান্দা। ক'পা গিয়েই বাঁ দিকে ঢাকা গলির মত একটু পথ। শেষে দরজা।

জায়গাটা অন্ধকার। সুচারু আন্দাজে ক'পা এগিয়ে গেল।

সুধা আলোর সুইচটা হাতড়াচ্ছিল। পারুল বৌদিরা চলে যাবার পর থেকে একতলাটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে।

সুইচটা খুঁজে না পেয়ে সুধা বললে, 'আপনার দেশালাইটা জ্বালুন তো, বাতিটা জ্বালি।'

সুচারু দেশালাই জ্বালল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

সুধা একটু অপেক্ষা করে কি বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ মনে হল সুচারু যেন গায়ের কাছে সরে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কাছাকাছি আসা আর এই অন্ধকার সুধার সব কথা আশ্চর্যভাবে শুষে নিল।

সুচারুর দিকে অন্ধকারে একবার মুখ তুলে তাকাবার চেষ্টা করে, সুধা মাথা নীচু করে নিল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু দু'টি মানুষ পরস্পরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছে।

অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। নিশ্বাসের শব্দই শুধু শোনা যায়। আর কিছু না।

কারুর মুখে একটা অস্ফুট শব্দও নেই। তবু মনে হয়, সমস্ত কথা যেন নিঃশব্দ জোয়ারের মত এই মৌনতার আর অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে।

'সুধা!' কখন এক সময় খুব চাপা গলায়, প্রায় নিশ্বাসের স্বরে সুচারু ডাকল।

সুধা চুপ। মনে হচ্ছিল, এখুনি সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে। বুকের মধ্যে একটা বাতাস যেন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, মোচড় দিয়ে, মুঠোয় টিপে টিপে ধরছে। গলার কাছটা আটকে গেছে। কণ্ঠার মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা!

সুচারু অন্ধকারে হাত বাড়াল। সুধার গা ছুঁয়ে গেল সেই অদ্ভুত হাত! সুধা কাঁপল হয়তো একটু। নড়ল না। ওর মনে হচ্ছিল, এক নির্জন, নিস্তব্ধ,

আবছা—অন্য এক জগতে কে যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গাঢ় ঘুমে ভেসে ওঠা স্বপ্নের মতন সব।

'সুধা!' সুচারু কানের পাশে বড় আস্তে, বড় সুন্দর করে ডাকল।

'কি?' সুধার গলা দিয়ে অস্পষ্ট অতি মৃদু একটু শব্দ হল। যেন ঘুমের গলায় শব্দ করলে।

'আমি আবার আসব।' সুচারু থেমে থেমে বললে, খুব আস্তে করে—কিন্তু স্পষ্ট স্বরে, 'ফিরে এসে তোমায় খুঁজব।'

নিজেকে সুধা কখন যে হারিয়ে ফেলেছে! ও জানে না—কি করছে, কেন করছে। সুচারুর সেই হাত নিজের বুকেব কাছে টেনে সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরেছে। মুখে বলার কিছু নেই। যত কথা, যত অভিমান, সমস্ত দুঃখ যেন এই অসহ উষ্ণ, কাঁপা কাপা হাতের স্পর্শে এবং জ্বালায় বলা হয়ে যাচ্ছে।

তবু শেষ পর্যন্ত সুধা কথা না বলে পারল না। 'এই বাড়ি এই ঘর, এখানেই আমায় পাবে। খুঁজতে হবে না তোমায়। যদি বেঁচে থাকি আমি থাকব —। তুমি এসো।'

আর কোন কথা নয়। মুহূর্ত যেন দীর্ঘতর হয়ে উঠল। সুচারুর বুকের মধ্যে সুধার আচ্ছন্ন চেতনার ক'টি অস্পষ্ট মধুস্বাদ-মুহূর্তও শেষ পর্যন্ত শেষ হল।

'এবার যাই।' সুচারু যেন কত দূর থেকে কথা বললে।

'দাঁড়াও। দেশালাইটা জ্বাল। অন্ধকারে যেতে নেই।'

সুচারু দেশালাই জ্বালল। আর সঙ্গে সঙ্গে টুক্ করে হলুদ ম্লান খানিকটা আলো জ্বালিয়ে দিল এই অন্ধকারে।

সুচারু তাকাল। চোখের জলে, বেদনায়, আনন্দে আর তৃপ্তিতে—সুধার মুখ অন্যরকম। একটু পাওয়ার সুখ এবং অনেকখানি হারানোর

কষ্ট আর হতাশা সব মেশামেশি হয়ে সুধার সেই মুখ আর-একরকম দেখাচ্ছে। নতুন। খুব নতুন।

সুধাও যেন সুচারুর চোখে চোখে তাকিয়ে নতুন করে কাউকে দেখল। দেখে একটু বুঝি লজ্জা পেল।

'আলো জ্বেলে ভাল করলে!' সুচারু বিষণ্ণ হাসি হাসল।

'তোমার জন্যেই জ্বাললুম। আলো দিয়ে তুমি যাও।' সুধা জল-ছলছল চেখে তাকিয়ে থাকল।

সুচারু বুঝতে পারছিল, এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে রাত শেষ হয়ে যাবে তবু নড়তে ইচ্ছে করবে না। আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ অস্ফুটভাবে বললে, 'চলি—।' আর বলার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এবং ব্যস্ত-ভাবে সদর খুলে রাস্তায় নেমে গেল। হঠাৎ যেন ছুটে পালিয়ে গেল!

সুধা এগিয়ে এসে সদরে হাত দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকাল বাইরে। গলির রাস্তাটা অন্ধকার, দূরে কালো রঙ-লেপটানো গ্যাস পোস্টের তলায় একটু মিটমিটে আলো। রাস্তার ধুলো বালি কাগজের টুকরো উড়িয়ে দমকা একটা হাওয়া সুধার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কপালের ক'টি এলোমেলো চুল চোখে গালে জড়িয়ে গেল। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না সুধা। বৃষ্টির ক'টা ফোঁটা আছড়ে পড়ল গলির রাস্তায়। মুখ বাড়িয়ে সুধা সেই অন্ধকারে চিৎকার করে কি যেন বললে, বাতাসের আর বৃষ্টির ফোঁটার শব্দে শোনা গেল না।

সদরের খোলা দরজায় হাত দিয়ে সুধা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। দরজা ভেজিয়ে পিট দিয়ে আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে। কেমন যেন ইচ্ছে হচ্ছিল, সুচারু এখুনি আবার ফিরে আসুক। ওই ঝড় বৃষ্টি আর অন্ধকার থেকে।

না, এল না সুচারু। আর আসবে না। এই ছোট ঘর, একটু আলো তার বেশি আর কি আছে এখানে। সুচারু যে আরও বড়

কিছু চায়, অনেক বেশি আলো। বড় ছোট এই ঘর—বড় ছোট। সুধা আস্তে আস্তে ফিরে চলল। সিঁড়ির গোড়ায় এসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল—একটু আলো পায়ের কাছে ছড়িয়ে রয়েছে। আবার ফিরল সুধা। সদরের গলিতে এসে সুইচ্ বন্ধ করলে। অন্ধকার। কী ভীষণ অন্ধকার। একতলার উঠান বৃষ্টির শব্দে ভরে গেছে। চোখ মুখ আঁচলে মুছে আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল সুধা। উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

দোতলার মুখে আসতেই রত্নময়ী। রত্নময়ী সিঁড়ির মাথায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে গামছা কাপড়। কলঘরে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সুধা মুখ তুলেই নামিয়ে নিল। কোন কথা বললে না। পাশ কাটিয়ে চলে গেল ঘরে।

রত্নময়ীও কোন কথা বললেন না। যেন দেখলেন না। আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন।

কুড়ি

একটু থেমেছিল, আবার শুরু হয়েছে। বাইরের দালানে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাতাস আর জলের ঝাপ্টার শব্দ উঠছে। ঘর অন্ধকার। মাথার দিকের জানলাটাও একরকম বন্ধ। পায়ের দিকটা খোলা আছে। খাটে রত্নময়ীর পাশে আরতি। মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে সুধা।

এখন রাত কত কে জানে! একটা বেজে গেছে কখন। দু'টো হয়ত বাজতে চলল। রত্নময়ীর ঘুম আসছে না। আরতির গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন রত্নময়ী। মেয়েটা ঘুমিয়ে কাদা। এতক্ষণ পরে একটু সরে গিয়ে শুয়েছে। বাইরে বৃষ্টি হলেও ঘরে হাওয়া আসছিল না। ঘেমে জল হয়ে যাচ্ছিল আরতি। জামার বোতামগুলো খুলে দিলেন আরতির। গলা বুক মুছিয়ে হাওয়া করলেন একটু। আরতির কোন হুঁশ নেই।

সুধারও বোধ হয় এতক্ষণে ঘুম এসেছে। কিছু আর বুঝতে পারছেন না রত্নময়ী। খানিক আগে পর্যন্ত কান পেতে ছিলেন। সুধার নড়া-চড়া পাশ ফেরা থেকে বুঝতে পারছিলেন—এ-সব ঘুমের ঘোরে নয়, জেগে জেগেই—ঘুমের ভান করে ছটফট করা। সুধা যতবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে—রত্নময়ী শুনতে পেয়েছেন। নিজেই চুপচাপ কাঠ হয়ে ঘুমোবার ভান করেছেন—যেন সুধার এই দীর্ঘনিশ্বাস, বালিশে মুখ-চেপে তার চাপা ফোঁপান কান্নার শব্দ তিনি শুনতে পারছেন সুধা জানতে না পারে। এই ঘর বড় ছোট—মানুষ বড় বেশি। নিজের ভাবনা, নিজের কান্না কাঁদবার মত জায়গা নেই। রত্নময়ীর একবার মনে হয়েছিল আজ তিনি বাসুর ঘরে গিয়ে শুলেই ভাল হত। অবশ্য হুট করে আজ এ-রকম কিছু করলে সুধা সন্দেহ করত। সেটা আরও খারাপ হত। বৃষ্টি না হলে, অন্য দিনের মতন দালানে গিয়ে শুতে পারতেন রত্নময়ী। আজ তাও পারলেন না।

রত্নময়ীর মনে হচ্ছিল, ভগবান যেন ইচ্ছে করেই আজ এই বৃষ্টি নামালেন। মেয়ের দীর্ঘনিশ্বাস আর দুঃখ—তার কান্না আর যন্ত্রণা শোনাবার জন্যে, দেখাবার জন্যে।

কিন্তু রত্নময়ীকে নতুন করে দেখাবার শোনাবার কিছু কি ছিল! তিনি কি কিছুই বোঝেন নি, বুঝতে পারেন নি?

রত্নময়ী শুধু মা নন; মেয়েও। তাঁর চোখ অন্ধ নয়। বুঝতে না পারার কিছু ছিল না। অনেক আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

ব্যাপারটা তাঁর ভাল লাগে নি গোড়ার দিকে। এ-সব তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। বয়স্ক ছেলেমেয়ের নিজেদের মধ্যে এই ভাব-ভালবাসাকে সুনজরে দেখায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং হাল আমলের শহুরে এই সব রীতিনীতি তাঁর খারাপ লাগত। তিনি মনে করতেন, ব্যাপারটা বেহায়াপনা। এবং এ অন্যায়। বিয়ের আগে মেয়েপুরুষে মেলা মেশা—? ঘি এবং আগুনের সম্পর্ক যা—তাতে কাছাকাছি রাখলে ফল মন্দই হয় ভাল নয়। নিজের থেকে একটি মেয়ে তার সঙ্গী যোগাড় করে নেবে, বিয়ের আগেই তার সঙ্গে রীতিমত খাওয়া, বসা, গল্পগুজব আর মান অভিমান করবে—এ ভাবতেই যেমন কেমন লাগে। গা ঘিনঘিন করে ওঠে। কে বলবে, কে জানে এদের বিয়ে হবেই, যদি না হয়—! তখন—? তখন তো আবার অন্য এক ছেলের খোঁজ করতে হবে। তাছাড়া ছেলেমেয়ে নিজেদের বিয়ে-থা'র ব্যাপারে মা বাপকে ডিঙিয়ে এরকম স্বাধীনতা নেবেই বা কেন? এ অনাচার ছাড়া কিছু নয়।

রত্নময়ীর এমন মন, এই রক্ষণশীলমনও কিন্তু আস্তে আস্তে ভেঙে গেল। তিনি জানতেন না, তাঁর অগোচরেই অনেক আগে থেকেই পুরনো ইমারতের মতন তাঁর ধারণা, অভ্যাস, ভালমন্দ জ্ঞান, পছন্দ অপছন্দ—সব, সমস্ত ভাঙছে, ভেঙে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। মেয়ে যখন চাকরি করতে পথে নামলো, তখন কি সেই ইমারত ভাঙে নি খানিকটা, সুধাকে যখন অচেনা

অজানা দশ পুরুষের সামনে বসে কাজ করতে, কথা বলতে, পথ দিয়ে যেতে আসতে দিয়েছেন—তখনও কি সেই পুরনো ধারণার অনেকখানি খসে যায় নি। তারপর সুচারু যেদিন এল, যতবার এল—রত্নময়ী কি বোঝেন নি—আরও কি হতে পারে।

রত্নময়ী সমস্ত বুঝেছিলেন। কিন্তু কই কোনদিন কি আভাসেও তাঁর বিরাগ বিরক্তি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন? না, পারেন নি। সে চেষ্টাও করেন নি। তাঁর নিজেরই কেমন লজ্জা করত! সংকোচ হতো। তাছাড়া যে-মেয়ে তাঁদের খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, যে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে এই সংসারের স্বার্থে—যার কোন প্রয়োজনই তাঁরা মেটাতে পারলেন না—তাকে কি মানুষ এই সব কথা বলতে পারে! সুধা যদি বলত, হ্যাঁ ওকে আমার ভাল লেগেছে ওকেই বিয়ে করব। তোমরা কি আমার বিয়ে দিয়েছ? আমার ঘর সংসার করে দিতে পেরেছ? তবে—? সুধার এই প্রশ্নের জবাবে রত্নময়ী কি-ই বা বলতে পারতেন? কিচ্ছু না। শুধু অক্ষমতার বিরাট লজ্জা আর গ্লানি নিয়ে মুখ বুজে থাকতে হত।

তারচেয়ে—এই ভাল। সমাজের হাওয়া অন্যভাবে বইছে। রত্নময়ীর সাধ্য কি তাকে ঠেকান। তাঁরা কি পছন্দ করতেন না করতেন তার আর দাম কি? গ্রামে থাকতেই চন্দ্রকান্ত আর পাঁচ প্রতিবেশী পরিবারের আচার আচরণের ছাঁচকে নিজের অন্দরমহলে পুরোপুরি প্রবেশ করতে দেন নি। তাঁর গোঁড়ামি ছিল অন্য ধরনের—খাওয়া পরা ছোঁয়াছুঁয়ির বাদবিচারের মধ্যে নয়। রত্নময়ী মেয়েমানুষ। চলতি সংস্কারে তখনও তাঁর কত লেগেছে, কত বেধেছে, সহ্য করতে হয়েছে কত কিছু। কিন্তু রত্নময়ী কি আটকাতে পেরেছিলেন? পারেন নি—চন্দ্রকান্তর উদারতার কাছে নিজের গোঁড়ামি একে একে অনেক নষ্ট করেছেন।

তারপর শহর কলকাতা। এখানে অন্য রকম হাওয়া। তোমার চাওয়া না-চাওয়া পছন্দ অপছন্দর ওপর কিছু নির্ভর করে না। এই শহরের মানুষজন

অন্য রকম, তাদের চালচলন, রীতিনীতির আর-এক ধরন আছে। সেই ধরনটা হাল আমলের। ভাবলে রত্নময়ী নিজেই অবাক হয়ে দেখেন, এক সময় এই হাল আমলের আদব কায়দা তাঁরও খুব পছন্দের জিনিস ছিল না, কিন্তু কী আশ্চর্য আজ ক'বছরের মধ্যে এর সবই প্রায় একে একে তাঁর স্বাভাবিক ভাবেই সহ্য হয়ে গেছে।

সময়ের স্রোতকে রত্নময়ী ঠেকাতে পারবেন না। সুধা-বাসু-আরতিরা সেই-সময়েরই খড়-কুটো। এরা নিজেদের মত ভেসে যাবে, রত্নময়ী চান না-চান, এদের আটকাতে তিনি পারবেন না।

মনে হলো বাইরে বৃষ্টিটা একটু থেমেছে। মাথার দিকের জানলাটা আস্তে করে খুলে দিলেন রত্নময়ী। ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া এল। বৃষ্টি যেন থেমেছে। জলের ঝাপ্টা অন্তত আর আসছে না।

তেষ্টা পাচ্ছিল রত্নময়ীর। ঘরের এই বদ্ধ বাতাস থেকে একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে করছিল।

খাট থেকে আস্তে করে নামলেন রত্নময়ী। হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা টিপলেন। আলো জ্বলল। সুধার দিকেই প্রথমে চাইলেন। পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। ডান হাতখানা মুখের ওপর দিয়ে মাথা ছাড়িয়ে মেঝেতে পড়েছে। মুখ দেখা যাচ্ছিল না। একটুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন রত্নময়ী। মনে হল, সুধা ঘুমিয়েই পড়েছে।

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আলগোছে খেলেন রত্নময়ী। গ্লাস রেখে আরতির দিকে তাকালেন এবার। বেয়াড়া ভাবে শুয়ে রয়েছে মেয়েটা। পেঁজা, কুটিকুটি করে ছেঁড়া একটা শাড়ি পরে শোয় ও। রোজই ঘুমের ঘোরে সে-শাড়ির আরও খানিকটা করে ছেঁড়ে। ঘুমোলে গায়ে কাপড় থাকে না মেয়ের, হাঁটুর ওপর শাড়ি উঠে যায়।

আজ এখন এই-মেয়ের গায়ের দিকে তাকিয়ে রত্নময়ী আবার মনে মনে

চমকে উঠলেন। আর-এক সুধা হয়ে উঠল। আর ক'দিন। তারপর এও তো মুখে না বলুক, মনে মনে বলবে, হ্যাঁ, সুধার যা কথা এরও তো তাই। রত্নময়ী কি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও আরতির এই হয়ে-ওঠাকে থামাতে পারবেন! না, না, না! সে সাধ্য তাঁর নেই। তিনি মানুষ। ভগবানের আঁকা ছকে তাঁব হাতের কারিকুরি চলবে না—।

আরতির পাশে দাঁড়িয়ে কাপড়টা টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন রত্নময়ী। ঘুমের ঘোরে তক্ষুনি আবার পিঠের পাকটা ছটফট্ করে খুলে ফেলল আরতি।

বিরক্ত হলেন রত্নময়ী। কিন্তু আর শাড়ি ঠিক করে দিলেন না। বাতি নিভিয়ে, খুব আস্তে করে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি থামে নি। ঝিরঝির করে পড়ছে। সামনে, পাশে, আকাশে—চতুর্দিক ভরে অন্ধকার। ঘন অন্ধকার।

সুচারুকে মনে পড়ছে। সুচারুকে মনে পড়লেই তাব পাশে সুধা এসে দাঁড়ায়। কিছুতেই সুচারুকে আলাদা করে ভাবতে পারেন না রত্নময়ী।

সুচারুদের কথাই ভাবলেন রত্নময়ী। গোড়ায় যাই হোক, আস্তে আস্তে সুচারুকে সত্যিই খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। ছেলেটি ভাল। চেহারায়, শিক্ষায়, সহবতে, স্বভাবে বড় সুন্দর ছেলে। রত্নময়ীর মনে ধরেছিল। ব্রাহ্মণই, যদিও কুলীন নয়। কিন্তু তাতেও বত্নময়ীর এখন আর আপত্তি ছিল না। একটা আশা তাঁর মনেও দানা বেঁধে উঠছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যদি ওরা মুখ ফুটে কেউ কিছু নাও বলে তবু একদিন তিনি বলবেন। বাসুটা একটু মানুষ হোক, কোন রকমে এ-সংসার টানার মতন অবস্থা হোক্ তার—তখন নিজের থেকেই কথাটা পাড়বেন রত্নময়ী। তার আগে নয়। কারণ তা সম্ভব নয়।

তারপর তিনি শুনলেন—সুচারু যুদ্ধের চাকরি খুঁজছে। এটা তাঁরও পছন্দ ছিল না। আভাসে নিষেধও করেছেন। কিন্তু জোর করা তো যায় না। কোন্ অধিকারেই বা তিনি জোর করতে পারেন। তবু ব্যাপারটাকে খুব

গুরুত্ব তিনি দেন নি। ভেবেছিলেন, সুচারুর এটা খেয়াল। আপনা থেকেই খেয়াল ভাঙবে।

কিন্তু এই আশাও ভাঙল। রত্নময়ী শুনলেন, সত্যি সত্যি ছেলেটা যুদ্ধে যাচ্ছে! খবরটা রত্নময়ীকে রীতিমত নিরাশ করল। তাঁর ভাগ্যই মন্দ। রত্নময়ীর ভাগ্যে সবই তো ভাঙে। তাঁর যত সাধ, যত স্বপ্ন, যত আশা—কোনটাই ফলল না। মনে মনে তিনি যা ভেবেছেন, যা চেয়েছেন—ঠিক তার উল্টোটাই ঘটেছে। ভগবান কপালে যা লিখেছেন—তার বাইরে যাবার সাধ্য কি তাঁর!

রত্নময়ী লোহার সরু থামটা ধরে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। চতুর্দিক ভরে অন্ধকার। ঝিরঝির বৃষ্টি। সমস্ত নিস্তব্ধ। অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল তিনি একা—সম্পূর্ণ একা, এ-সংসারে তাঁর কেউ নেই। কেউ না। নিঃসঙ্গ, অসহায় একলা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আর তাঁর চারপাশে অসীম অন্ধকার। কোথাও একটু আলো নেই। আশা নেই।

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে স্বামীকে এখন বড় বেশি মনে পড়ছিল রত্নময়ীর। যেন ওই মেঘ আর জল আর অন্ধকারের আড়ালে কোথাও তাঁর স্বামী লুকিয়ে রয়েছেন। রত্নময়ীকে দেখছেন, তাঁর মনের এই চুপি চুপি কথা শুনছেন।

রত্নময়ী বলছিলেন, মনে মনে, অভিমানে আর অসহ বেদনায়: আমি সংসার চেয়েছিলুম, সচ্ছলতা চেয়েছিলুম—ছেলেমেয়েদের সুখ সম্পদ চেয়েছিলুম—তাই কি তুমি আমায় রেখে গেলে—দেখতে, এই ভাঙা সংসার—দুঃখ দৈন্য, এদের কষ্ট আর কান্না?

চোখের পাতা ভিজিয়ে জল পড়ছিল রত্নময়ীর দৃষ্টি ঝাপসা করে। গলার কাছে জমাট কান্না ফুলে ফুলে উঠছিল।

ঝাপসা চোখে বাসুর ঘরের বন্ধ দরজার দিকে চাইলেন। চেয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ। ওই ঘরে একজন ছিল। যতদিন ছিল ততদিন

রত্নময়ী কখনো নিজেকে এত একা, অসহায় মনে করেন নি। আজ সে নেই ; যে আছে সে কোনদিন দরজা খুলে মুখ ঝাড়িয়ে রত্নময়ীর এই একান্ত দুঃসহ বেদনা আর ব্যর্থতার কান্না শুনবে না। তার কোন প্রয়োজনই নেই, আগ্রহও না। অথচ স্বামীর মৃত্যুর পরও তো এই সন্তানদের মুখ চেয়ে তিনি সব ভুলতে চেয়েছিলেন। ওরা তা দিল না। চন্দ্রকান্তর ঘরে তাঁর পুত্রের সুখনিদ্রা আজ অসহ্য—অসহ্য লাগছিল রত্নময়ীর। মনে হচ্ছিল, ছেলেটা আর কেউ, অন্য কেউ—চন্দ্রকান্তর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

অনেক—অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে সংযত সুস্থির করলেন রত্নময়ী। চোখের জলের দাগ মুছলেন আঁচলে। তারপর আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন।

অন্ধকারে কিসের শব্দ হচ্ছিল। রত্নময়ী থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলেন।

'কে সুধা—?'

'হ্যাঁ, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল।' জলের গ্লাস রাখার শব্দ শোনা গেল। 'তুমি বাইরে ছিলে—?' সুধা জেনেও না-জানার ভান করলে।

'বড় গরম। ঘুম আসছিল না। বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। তুই ঘুমোস নি ?'

সুধা জবাব দিলনা।

রত্নময়ী একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'ঘরের মধ্যে যা গুমোট, ঘুম আসবে কোথ্থেকে ? বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। খানিক বাইরে দাঁড়া গে যা।'

রত্নময়ী বুঝতে পারলেন—সুধা তাঁর পাশ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

অন্ধকার হাতড়ে নিজের খাটে এসে বসলেন রত্নময়ী। সুধা তা হলে ঘুমোয় নি ! জেগেই ছিল। রত্নময়ী হয়ত ধরা পড়ে গেলেন। সুধাও। যাক—ভালই হল। বাইরে গিয়ে এবার দাঁড়াতে পারবে মেয়েটা। এ-ঘরে মুখ গুঁজে চুপিচুপি কতক্ষণ কাঁদতে পারে মানুষ ! বড় ছোট এই ঘর—বড় বেশি মানুষ। একা, নিজের জন্যে, শুধু নিজের মত একটু জায়গাও নেই।